মওলানা মুশাহিদ আলী

ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার

("ফতহুল করীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন"-এর বাংলা তরজমা)

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
হিজরী সনের শতক উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত

ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার :
মূল : মওলানা মুশাহিদ আলী
অনুবাদ : আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

ই. ফা. প্রকাশনা : ৭৮৫/১
ই. ফা. গ্রন্থাগার : ৩২০'১

প্রকাশনায় :
মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২

প্রথম সংস্করণ :
সেপ্টেম্বর ১৯৮০

দ্বিতীয় সংস্করণ :
যিলহজ্জ ১৪০৪
ভাদ্র ১৩৯১
সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

প্রচ্ছদ : এম. এ. কাইয়ুম

মুদ্রণে : লেখা ঘর প্রেস
২৪, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১

বাঁধাইয়ে : দিশারী বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
২৭, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১

মূল্য : বত্রিশ টাকা

ISLAMER RASHTRIYO O ARTHANAITIK UTTARADHIKAR (Political and Economic Heritage of Islam) Bengali version by A. S. M. Omar Ali of "Fathul Kareem Fee Siyasatin Nabiyyil Ameen" written by Maulana Mushahid Ali in Urdu and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka to celebrate the 15th century Al-Hijrah. September 1984

Price : Tk. 32·00
U. S. Dollar : 3·00

উৎসর্গ

জান্নাতবাসী আব্বা ও আম্মা

এবং

আমার উচ্চ শিক্ষালাভের পথে

যাঁরা

নানাভাবে প্রেরণা যুগিয়েছেন

তাঁদের স্মরণে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

মূলগ্রন্থের দুষ্প্রাপ্য একখানা কপি মওলানা মরহুমের অন্যতম ভক্ত ও অনুরক্ত আমার একালীন সহকর্মী সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় টেকনিক্যাল কলেজের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক জনাব মুহিব্বুর রহমান সাহেবের নিকট থেকে পাই। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল, এর অনুবাদকর্মে তিনি শরীক হবেন। নানাবিধ ব্যস্ততা এবং প্রধানত অসুস্থতার কারণে তিনি সে ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন নি। তবু, বেশ কয়েকটি আরবী উদ্ধৃতির অনুবাদে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন, যার জন্যে আমি তাঁর নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ; আরও কৃতজ্ঞ দুষ্প্রাপ্য মূল কপি সরবরাহের জন্যে। নইলে বর্তমান পুস্তকখানা প্রকাশ লাভের সুযোগ পেতো না। রহমানুর রহীম আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর সুস্থ ও নিরোগ দীর্ঘায়ু, কামনা করি।

প্রকাশকের কথা

সামগ্রিক অর্থে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ ও জীবন বিধান। ব্যক্তিক, ব্যষ্টিক, আত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক তথা জীবনের এমন কোন দিক নেই, যে-সব প্রসঙ্গ ও বিষয়াবলী এবং এতদ্‌সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা ইসলাম তার আওতাবহির্ভূত রেখেছে। অথচ পাশ্চাত্যানুকারী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারায় প্রভাবিত কেউ কেউ কিংবা কোন কোন মহল ইসলামের এই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত চারিত্র্য সম্পর্কে সম্যক অবগত নন। পাশ্চাত্য চিন্তানুকৃতির ফলে তারা 'ইসলাম'কে প্রচলিত অর্থে 'ধর্ম' হিসেবে ধারণা করে নিয়ে কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই এর পরিধি বৃত্তাবদ্ধ বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সুতরাং এ ধারণা যে সঠিক নয়, বরং বাস্তব সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে এর অবস্থান এবং ব্যক্তি ও ব্যষ্টির জীবন-সমস্যার সার্বিক সমাধানে ইসলাম যে সুষ্ঠু দিকনির্দেশনা প্রদান করে এবং সর্বমানবের কল্যাণকামী একটি শোষণহীন ও সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা কায়েমই যে ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য, যুগ-সমস্যার আলোকে এ সত্যের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা অবশ্যিই স্বীকার করতে হয়।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও 'আলিম সিলেটের মাওলানা মুশাহিদ 'আলী লিখিত 'ফতহুল করীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন' শীর্ষক উর্দু গ্রন্থটিকে এ বিষয়ক প্রয়াসের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে গণ্য করা যায়। এই গ্রন্থে ইসলামী রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় না গিয়েও গ্রন্থকার এতদবিষয়ক ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে তুলে ধরে সমকালীন জটিল ও সমস্যাসংকুল বিশ্বের সংকট ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সমাধানে ইসলামী জীবনাদর্শের যাথার্থ্য ও প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদনের প্রয়াস পেয়েছেন। এ ধরনের একটি গ্রন্থের সীমিত পরিসরে বিশদ ও বিস্তারিত প্রক্রিয়ায় সার্বিক আলোচনা ও দিকনির্দেশনা

সম্ভব না হলেও ইসলামের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা গড়ে তোলার পক্ষে এ প্রয়াস যে একটি মূল্যবান অবদান রাখতে পারে, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।

'ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার' শিরোনামে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বাংলা অনুবাদ করে বিশিষ্ট 'আলিম অধ্যাপক এ. এস. এম. ওমর আলী জাতির ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ইসলামী আদর্শবাদের আলোকে একটি মৌলিক সমাজ কাঠামো নির্মাণে এবং সমকালীন জটিল ও যন্ত্রণাকর যুগ-সমস্যা উত্তরণে এ গ্রন্থ যদি বাংলা ভাষা ভাষী পাঠক সমাজকে কিছু মাত্রও অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তাহলেই ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর এ প্রকাশনা উদ্যোগ সফল হবে।

সকল হাম্‌দ্‌ বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ্‌র জন্যে।

পরম করুণাময় ও দয়াল, আল্লাহ্‌র নামে

ভূমিকা

নিখিল জাহানের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌ পাকের যাবতীয় প্রশংসা এবং তদীয় রসূল, আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা), তাঁর বংশধর এবং সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের উপর অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

আল্লাহ্‌ রব্বুল 'আলামীনের করুণাভিখারী সিলেটের বাইয়েমপুর নিবাসী ইবনুল 'আলীম মুহাম্মদ মুশাহিদ 'আলী আরজ করছি, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর অশেষ কৃপা ও মেহেরবানীতে শেখুল ইসলাম হযরত মওলানা হুসায়ন আহমদ মাদানী (রঃ)—আল্লাহ্‌ তাঁকে দীর্ঘ জীবন দান করে আমাকে ও সকল মুসলমানকে উপকৃত করুন—এর পবিত্র রুহানী ফয়েয ও সোহ-বতের মাধ্যমে এই অধমকে বিশ্বনবী (সা)-এর জ্ঞান-সমুদ্রের কণামাত্র দান করলেন সেহেতু শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মুহতারামের নামে বইটির নামকরণ করতে আমার ভাল লেগেছে—বিধায় "আল-ইফাদাত আল-হুসায়নিয়া বা হুসায়নী জ্ঞান-সম্ভার" নামে আমি এর নামকরণ করেছি—দু'অংশে বিভক্ত পুস্তকের প্রথমাংশে রাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় অংশে আধুনিক যুগের বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোচনা করা হয়েছে। মহিমান্বিত ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে দু'আ ও প্রার্থনা, যেন তিনি পুস্তকখানি কবুল করে নেন যেমন তিনি সৎকর্মশীল বান্দাদের থেকে কবুল করেন। অতঃপর প্রথম অংশের নাম 'ফতহুল করীম ফি সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন' নামে নামকরণ করতে মনস্থ করি। নবী করীম (সা)-এর উপর আল্লাহ্‌ পাকের শত-সহস্র দরূদ ও ইবনুল 'আলীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টি লাভই বর্তমান পুস্তক লেখার উদ্দেশ্য। হে আল্লাহ! তুমি তোমার অপার করুণা ও অনুগ্রহে একে কবুল কর এবং তোমার যমীনের বুকেও প্রতিষ্ঠিত কর। একমাত্র তুমিই যা ইচ্ছা তাই করতে পার।

অনুবাদকের আরজ

আলহামদুলিল্লাহ! বাংলাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ও 'আলিম মরহুম মওলানা মুশাহিদ 'আলীর উর্দু ভাষায় লিখিত 'ফতহুল করীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন' নামক বইখানার অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছিল চার বছর আগে। অতঃপর প্রকাশের মাত্র এক বছরের স্বল্পতম সময়ে এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়া থেকে বইটির অসাধারণ জনপ্রিয় হবার প্রমাণ মেলে। বহুদিন থেকেই পাঠকদের তরফ থেকে এর ২য় সংস্করণ প্রকাশের তাগিদ আসছিল। দেরীতে হলেও পাঠকবৃন্দের চাহিদার প্রতি সম্মান দেখাতে পারায় আমরা আনন্দিত। আশা করবো, ১ম সংস্করণের মত ২য় সংস্করণও পাঠকদের ভাল লাগবে।

ইসলাম সাধারণ অর্থে কোন ধর্ম মাত্র নয়, বরং তা পরিপূর্ণ একটি জীবন-ব্যবস্থা ও জীবনদর্শন। জীবন-ব্যবস্থার সামগ্রিক দিক তথা এর রাষ্ট্র-নীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিচার বিভাগীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি এরই আওতাভুক্ত। এটা কোন কাল্পনিক ব্যাপার নয়, নয় কোন মনগড়া ব্যাখ্যা বরং তা একটি ঐতিহাসিক সত্য, আর এ সত্যকেই ঘটনাবহুল তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে এ বই-এ প্রতিষ্ঠিত করেছেন লেখক এবং এ তত্ত্ব ও তথ্য পেশ করেছেন পবিত্র আল-কুরআন, হাদীছ এবং এরই উপর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত খুলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফত ও তাঁদের গৃহীত নীতি ও কর্মসূচী, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে রচিত অতীত মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অর্থনীতি-বিদ, ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী ও আইনবিদগণের লিখিত পুস্তক থেকে। এঁদের মধ্যে ইমাম কাযী আবু ইউসুফ (র), ঐতিহাসিক তাবারী, বালাযুরী ও ইয়াকুবী, সমাজ বিজ্ঞানের জনক ইবনে খলদুন, হাফিজ বায়লা'য়ী, 'আল্লামা শামী প্রমুখ মনীষী রয়েছেন। অবশ্য বর্তমান পুস্তকে ইসলামী রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির ব্যাপকভিত্তিক ও বিস্তারিত আলোচনা নেই আর তা যে সম্ভব ছিলো না, লেখক তা বিভিন্নস্থানে অসংকোচে স্বীকার করেছেন। লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির

ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে তুলে ধরা এবং বর্তমান সমস্যাবহুল দুনিয়ার বিপর্যয় ও সংকট সমাধানে এর প্রয়োজনীয়তা ও যথার্থতা প্রতিপাদন করা। তিনি বিভিন্ন যুক্তিবহুল তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে এ সত্যকেই জোরালোভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন যে, ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতির মৌলিক সঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই আজকের মানবতা সামগ্রিক বিপর্যয় ও সমস্যা-সংকটের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে—পেতে পারে বাঞ্ছিত সুখ-শান্তি ও কল্যাণ। এর তাগিদেই লেখক বারবার পাঠককে যেমন এতদসংক্রান্ত মৌলিক গ্রন্থাদি পাঠের আহ্বান জানিয়েছেন ঠিক তেমনি এসব মৌলিক নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছেন আজীবন। আর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের স্বতঃস্ফূর্ত দাবীতেই তিনি আমৃত্যু সক্রিয় রাজনীতিতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন এবং নিরলস প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। মরহুমের স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করুক এটাই আজকে আমাদের কামনা।

সবশেষে তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করে দুনিয়ার অন্যান্য বিশেষ করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের তুলনা করে ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন।

অনুবাদে মূল লেখকের ভাব-ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রাখতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রেখেছি ভাষার সাবলীলতা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়। এ প্রচেষ্টা কতটুকু সফল হয়েছে সে বিচারের দায়িত্ব পাঠকের।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

সূচী

১.

৫. রাষ্ট্রীয় ভাতা ও মাসোহারা প্রসঙ্গে

৬. খাজনা, ট্যাক্স ইত্যাদি আর্থিক আয়ের উদ্দেশ্য এবং এর বিভিন্ন অধ্যায়

ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার

এক

রাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বিভিন্ন লেখক রাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন প্রকার সংজ্ঞা দিয়েছেন। যদিও মূলে উদ্দেশ্য ও বক্তব্যের দিক দিয়ে তাঁদের মাঝে কোন বিরোধ নেই। সংক্ষিপ্তভাবে তা এই :

"রাষ্ট্রনীতি জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত সেই শাখার নাম যা শাসক-শাসিতের—রাজা ও প্রজার ভেতরে শান্তি ও সৌহার্দমূলক সম্পর্কের সৃষ্টি করে এবং তার মধ্যে আন্তর্জাতিক জাতি-গোষ্ঠীর ভেতর ইনসাফ-ভিত্তিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার নীতিমালার বর্ণনাও বিদ্যমান থাকে।"

কেউ কেউ বলেন : "রাষ্ট্রনীতি এমন এক প্রকার আইন-বিজ্ঞানের নাম যদ্দ্বারা মানব-সমাজের সামগ্রিক জীবন-যিন্দেগীর সংস্কার সাধন করা যায়।"

এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো : "আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে ইনসাফ তথা সুবিচার প্রতিষ্ঠা—যদ্দ্বারা তাদের সামগ্রিক জীবনধারা পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত হতে পারে।" এক কথায় ইনসাফেরই অপর নাম রাষ্ট্রনীতি। অর্থাৎ যে আইন-কানুনের সাহায্যে আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে– সেটাই রাষ্ট্রনীতির নিয়ম ও নীতিমালা। মানুষের সামগ্রিক জীবন এর আওতাধীন আর এর প্রয়োজনীয়তা—মানব-সমাজের সামগ্রিক জীবনের সংস্কার সাধনে।

রাষ্ট্রনীতির নিয়ম ও নীতিমালার জন্য অপরিহার্য শর্তাবলী নিম্নরূপ :

১. উল্লিখিত আইন-কানুনসমূহ জোর-জুলুম থেকে পবিত্র ও মুক্ত হবে।

২. উক্ত আইন-কানুনগুলো অবিচার, অত্যাচার ও শোষণ-জুলুম উৎখাতের জন্য যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হবে।

৩. সমাজ ও রাষ্ট্রে উক্ত আইন-কানুন প্রতিষ্ঠার ফলে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী, অশান্তি উৎপাদনকারী ও জালিম-অত্যাচারীদের গতিবিধি সংকীর্ণ হয়ে পড়বে।

৪. উক্ত কানুন ও নীতিমালা প্রতিষ্ঠার ফলে শান্তিপ্রিয়, সৎ ও নিরীহ মানুষদের জীবনে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসবে।

৫. উল্লিখিত আইন-কানুনের মধ্যে সততা ও নিরাপত্তাবোধের এমন এক সম্মোহনী শক্তি বিদ্যমান থাকবে যা শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে।

৬. উক্ত নীতি ও নিয়মাবলী মানুষের সামগ্রিক জীবন ও যিন্দেগীর পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত ব্যবস্থার জামিন হবে।

৭. তা এমন এক পরিশীলিত ও পরিচ্ছন্ন সংস্কৃতির উপর স্থাপিত হবে যা সকল দেশে ও সব যুগে প্রতিটি ব্যক্তির নিমিত্ত কার্যোপযোগী এবং গ্রহণোপযোগী হবে।

৮. এর বিরোধিতার পরিণতি হবে মানব-সমাজের সাংস্কৃতিক প্রগতি, বস্তুগত আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী, বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যবেক্ষণ ও তার রহস্য উদ্ঘাটনে এবং মানবতার বিনির্মাণে উপকারী হবার পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক রকম ক্ষতিকর। ফলে উক্ত সমাজ বন্য জন্তু ও হিংস্র শ্বাপদের আবাসরূপে পরিগণিত হবে।

প্রত্যাদিষ্ট জীবন-বিধান ব্যতিরেকে ন্যায়ানুগ রাষ্ট্রনীতি অসম্ভব

কোন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যতই পরিপূর্ণ ও উন্নতমানের হোক না কেন তা ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। এরই ভিত্তিতে বলা চলে, তার যে কোন শক্তিই—তা প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্ন, বস্তুগত অথবা নৈতিক ও আত্মিক —সার্বিক দিক দিয়ে কখনোই পরিপূর্ণ নয়। প্রতিটি বিষয়ে ও কর্মে বিশুদ্ধতার সাথে অশুদ্ধতা, পরিপূর্ণতার সাথে অপূর্ণতা, স্মৃতির সাথে বিস্মৃতির আশংকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভুল-ত্রুটি সৃষ্টির নিঃসীম আঁধারের সাথে ভুল-ত্রুটিহীন আলোকোজ্জ্বল শিখার সহাবস্থান কী করে

সম্ভব হতে পারে! বর্ণ-বৈচিত্র্যে ও আকার-আকৃতিতে মানুষের পরস্পর থেকে পরস্পরের পার্থক্য যেমন সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত—ঠিক তেমনি চিন্তা ও মন-মানসিকতার গঠন-বৈচিত্র্যেও একে অপরের মাঝে দুস্তর ব্যবধান বিদ্যমান। বুদ্ধিবৃত্তির সর্বোচ্চে স্থাপিত এই সব দর্শনের পারস্পরিক বিরোধ ও বৈপরিত্যের সঠিক অবস্থা 'যত মুখ তত কথা—যত মন তত মাথা'র ন্যায়। ফলে দার্শনিককে শেষ পর্যন্ত নিজেদের অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতাকে স্বীকৃতি দিতে হয়েছে।

প্রখ্যাত দার্শনিক জারেন্ট বলেন : "পরম সত্য লাভের ব্যাপারে আমাদের নিরাশ হতেই হবে। এটা স্বীকার করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই যে, পরম সত্য লাভ সরাসরি সেই সত্তার নিকট থেকেই একমাত্র সম্ভব যিনি এর চিরন্তন উৎস (অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক) আর এটাই এর শেষ সমাধান।"

অপর একজন খ্যাতনামা দার্শনিক মিঃ লেভিস বলেন : 'মানুষের নিকট নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য কোন জ্ঞান নেই। হ্যাঁ! একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই তা আছে। আর এর দাবীদার অজ্ঞ মানুষ সে জ্ঞান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তেমনিভাবে লাভ করে থাকে যেমনি লাভ করে থাকে ছোটরা বড়দের নিকট থেকে।"

মোদ্দা কথা এই যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি রাজনৈতিক আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। কেননা এক ব্যক্তি যেটাকে সংস্কার মনে করে অন্যে সেটাকেই বিপর্যয় মনে করে। একে যাকে ন্যায় ও সুবিচার মনে করে অন্যে হয়তো সেটাকেই অন্যায় ও জুলুম মনে করে। ইউরোপ যেটাকে বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন ও বৈজ্ঞানিক সাধনা ও গবেষণা মনে করে এশিয়াবাসীদের জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে সেটাই হয়তো মারাত্মক ভীতি ও হুমকির কারণ।

এক কথায় রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক আইন-কানুন তথা নিয়ম ও নীতিমালা প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই। সর্বাগ্রে এই কানুন ও নীতিমালাকেই হযরত মূসা কলীমুল্লাহ্ (আ)-এর যমানায় শরীয়তের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। আর তিনিই সর্বপ্রথম নবী যিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ রাষ্ট্রনীতিবিদ। হযরত মূসা (আ)-কে তাই অধিকাংশ সময়ে

তৎকালীন বাদশাহ্‌দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। পবিত্র কুরআনুল করীমের মনোযোগী ও সতর্ক পাঠকদের নিকট বিষয়টি মোটেই প্রচ্ছন্ন নয়। কুরআনুল করীমের সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে :

"আমরা তওরাত নাযিল করিয়াছিলাম; উহাতে ছিল পথ-নির্দেশ (হেদায়েত) ও আলো; নবীগণ যাহারা আল্লাহ্‌র অনুগত ছিল তাহারা য়াহুদীদিগকে তদনুসারে বিধান দিত, রব্বানীগণ (১) ও পন্ডিতগণও বিধান দিত, কারণ তাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক করা হইয়াছিল এবং তাহারা ছিল উহার সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করিও না, আল্লাহ্‌ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না তাহারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফির)।

"তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহারই পাপমোচন হইবে। আল্লাহ্‌ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না তাহারাই সীমালংঘনকারী (জালিম)।

"মরিয়ম তনয় ঈসাকে তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থকরূপে উহাদের উত্তরসাধক করিয়াছিলাম এবং তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থকরূপে এবং সাবধানকারীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাহাকে ইনজীল দিয়াছিলাম ; উহাতে ছিল পথের নির্দেশ (হেদায়েত) ও আলো।

টীকা : ১ রব্বানী অর্থ ইলাহের সাধক। 'রব' থেকে রব্বানী করা হয়েছে যার বিশেষ অর্থ, আল্লাহ্‌র জ্ঞানে যে জ্ঞানী এবং কর্মে ও তার বাস্তবায়নে যে বিশ্বাসী সেই রব্বানী। আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম 'রব' গুণে গুণান্বিত হওয়ার দিকেও ইংগিত পাওয়া যায়। যে কেউ এই গুণে গুণান্বিত হয় সে স্বভাবত জ্ঞানে সুপন্ডিত ও কর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়।

"ইনজীল অনুসারিগণ যেন আল্লাহ্ উহাতে যাহা নাযিল করিয়াছেন তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না তাহারা সত্যত্যাগী (ফাসিক)।

"তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন তদনুসারে তাহাদের বিচার-নিষ্পত্তি করিও এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ১ ও স্পষ্ট পথ ২ নির্ধারণ করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহা করেন নাই। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর ; আল্লাহ্র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।

"(কিতাব নাযিল করিয়াছি) যাহাতে তুমি আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন তদনুযায়ী বিচার-নিষ্পত্তি কর, তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ না কর এবং তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাহাতে আল্লাহ্ যাহা তোমার প্রতি নাযিল করিয়াছেন উহারা তাহার কিছু হইতে তোমাকে বিচ্যুত না করে। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ যে, তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিতে চাহেন এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী (ফাসিক)।

"তবে কি তাহারা প্রাগ-ইসলামী যুগের বিচার ব্যবস্থা কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?"—(সূরা মায়েদা, ৪৪-৫০ আয়াত)।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে তিনটি শরীয়তের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। হযরত মূসা (আ)-এর শরীয়ত, হযরত ‘ঈসা (আ)-এর শরীয়ত এবং আমাদের

টীকা: ১. দীনের বিধানসমূহ

২. সরল পথ।

শেষ নবী সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়ত। তিনটি শরীয়তেরই সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এটাই যে, প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান মতে ফয়সালা হতে হবে। বিশেষ করে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে—আয়াতগুলোর মর্ম ও তাৎপর্য থেকে এটাই উপলব্ধিতে আসে। অতএব রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে ফয়সালা দিতে গিয়ে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধানের অনুসন্ধান করা শাসকের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। কেননা এটা ব্যতিরেকে জনগণের মাঝে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা বস্তুত অসম্ভব। এ কারণেই যারাই রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধানের অনুসরণ করে না কুরআনুল করীমের ভাষায় তাদেরই কাফির, জালিম এবং ফাসিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যদিও ইব্‌নে আবী হাতেম, ইবনুল মুনযির ও সা'ঈদ বিন মনসুর, হাকিম এবং বায়হাকী প্রমুখ হযরত 'আবদুল্লাহ্‌ বিন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

انه ليس با لكفر الذى يزعمون اليه و انه ليس بكفر
ينقل من الملة بل كفر دون كفر۔ تفسير فتح القدير ص٤٢

অর্থাৎ "এটা তেমন কুফরী নয় যেমনটি তারা মনে করেছে কিংবা এমন কুফরীও নয় যা মিল্লাতে ইসলামী থেকে তাদেরকে সরিয়ে নেবে। বরং এটা প্রকৃত কুফরীর কাছাকাছি ও তা থেকে নিম্ন পর্যায়ের।"

আর যেহেতু আমাদের রসূল করীম হযরত মুহাম্মদ (সা) নবীদের মধ্যে পরিপূর্ণতম নবী ছিলেন সেহেতু তাঁর রাষ্ট্রনীতিও ছিল পূর্ণতম। আর সে কারণেই তাঁর প্রতি শরীয়তের বিধান বাস্তবায়নের আদেশও অত্যন্ত কঠোরভাবেই করা হয়েছিল এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এর পুনরুক্তি করা হয়েছে এভাবে, "তুমি তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান মুতাবিক বিচার নিষ্পন্ন কর।" এরপর এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যেন কেউ তাঁকে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধানের বিরুদ্ধতায় উৎসাহিত করতে না পারে। এরপর আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধানের বিরুদ্ধে ফয়সালা প্রদানকে জাহিলী ফয়সালা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং মু'মিনদেরকে

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُوْنَ

"নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?" বলে সামগ্রিক রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে ও কর্মে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধানকে অনুসরণের উপর উৎসাহিত করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোর কিছু আগেই বলা হয়েছে:

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

"আর যদি বিচার-নিষ্পত্তি কর তবে ন্যায় বিচার করিও।" অতঃপর আমাদের নিকট বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেল قسط বা عدل অর্থাৎ "ন্যায় ও সুবিচার" এর অর্থ কি? ফতহুল কাদীরে বলা হয়েছে:

اى بالعدل الذى امرك الله به وانزل عليك

অর্থাৎ 'আদল' বা ন্যায়বিচার অর্থে আল্লাহ্ তোমাকে যা করতে আদেশ দিয়েছেন এবং যা তোমার উপর নাযিল করেছেন।" উপরিউক্ত আয়াতগুলো দ্বারা কতিপয় সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে:

১. বিচার-নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ন্যায় ও সুবিচার ফরয এবং বিচার-নিষ্পত্তি 'আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন' তারই অপর নাম।

২. বিচার-নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান হযরত মূসা (আ) থেকে যার শুরু, কেয়ামতক তা চিরন্তন ও চিরস্থায়ী।

৩. আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান মুতাবিক বিচার-নিষ্পত্তি না করা পরিষ্কার জুলুম, ফাসিকী ও কুফ্‌রী। অবশ্য এটা কুফ্‌রের থেকে নিম্ন পর্যায়ের কুফরী।

৪. আমাদের নবী করীম (সা)-এর উপর অবতীর্ণ কিতাব আল-কুরআন পূর্বেকার নাযিলকৃত কিতাবগুলোর (তওরাত, যবুর ও ইনজীল) রক্ষক ও প্রভাবাধীন। এই পবিত্র কুরআনুল করীমের অনুসারীদের উপর রাষ্ট্রনীতির সার্বিক ক্ষেত্রেই কুরআনুল করীম, তদীয় ব্যাখ্যা, রসূলে করীম

(সা)-এর হাদীছসমূহ এবং এথেকে নির্গলিত মুজতাহিদীনের (গবেষকবৃন্দ) কথিত রায় ও সিদ্ধান্তসমূহের অনুসরণ অত্যন্ত জরুরী। এর প্রতি উপেক্ষা ও নিস্পৃহ মনোভাব প্রদর্শন জাহিলী বিধান অনুসরণেরই নামান্তর। 'নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর ?"

৫. عدل و قسط এবং حكم بما انزل الله অর্থাৎ ন্যায়, সুবিচার এবং আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিচার-নিষ্পত্তির স্পষ্ট বিধান—কুরআনুল করীমের কতিপয় স্থানে যার উল্লেখ বর্তমান—সবগুলির ভাবার্থ একই আর তা শরীয়তে মুহাম্মদী (সা) দ্বারা বিচার নিষ্পত্তিকরণ। 'আল্লামা আলুসী (র) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ তফসীরে রূহুল মা'আনীতে বলেন ঃ

وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط اى بالعدل الذى امرت به وهو ما تضمنه القران واشتملت عليه شريعة الاسلام.

অর্থাৎ "আর যদি বিচার-নিষ্পত্তি কর তবে ন্যায়বিচার করিও।" ন্যায়বিচার অর্থে আল্লাহ্ আপনাকে যেরূপ আদেশ করেছেন আর যা গোটা কুরআনুল করীমে বিধৃত এবং ইসলামী শরীয়ত পরিবেষ্টিত।"

ন্যায়বিচার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ

হযরত নবী করীম (সা) আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট ছিলেন যেমনি আদিষ্ট ছিলেন তিনি তাঁর উম্মতের মধ্যেও।

ন্যায়বিচার ফরয হওয়া সম্বন্ধে বহু দলীল-প্রমাণাদি বিদ্যমান। নীচে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো ঃ

১. اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ অর্থাৎ "আল্লাহ অবশ্যই তোমাদিগকে ন্যায়-বিচার এবং এহসানের নির্দেশ দান করিতেছেন।" ইমাম জাসসাস রাযী তদীয় আহকামুল কুরআন নামক গ্রন্থে বলেন ঃ ন্যায়-

বিচার যুক্তিসংগত কারণেই বাধ্যতামূলক ছিলো। ইসলামী শরীয়ত উক্ত বাধ্যতাকে আরও অধিকতর গুরুত্ববহ করেছে।

২. আল্লাহ্ পাক বলেন :

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ.

'তোমার প্রতি সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি—যাহাতে তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যাহা জানাইয়াছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা কর।"—(সূরা নিসা—১০৫)।

মুফাসসিরকুল শিরোমণি—সাইয়িদ আলূসী বাগদাদী (র) তাঁর লিখিত প্রসিদ্ধ তফসীর গ্রন্থ তফসীর রূহুল মা'আনীতে বলেন :

اى لتحكم بين الناس برهم وفاجرهم بما اراك الله
اى بما عرفك واوحى به اليك.

অর্থাৎ "যেন তুমি জনগণের মধ্যকার নেককার ও বদকার লোকদের বিচার-মীমাংসা করতে পারো যেরূপ আল্লাহ্ তোমাকে জানিয়েছেন, শিখিয়েছেন ও পরিচিত করিয়েছেন সেই মুতাবিক এবং যেরূপ তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছেন।" অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাদির সুষ্ঠুতা এবং তা ন্যায়বিচারের সাথে সামঞ্জস্য ও সংগতিপূর্ণ হওয়া ওহীর সাথে সামঞ্জস্য ও সংগতিপূর্ণ হওয়ার উপর নির্ভরশীল, চাই কি তা প্রকাশ্য হোক অথবা অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য ওহী বলতে কুরআনুল করীম, রসূলে করীম (সা)-এর সুন্নত, মুজতাহিদীন (ইসলামী গবেষকবৃন্দ)-এর সর্বসম্মত রায় বা সিদ্ধান্ত (ইজমা') এবং অপ্রকাশ্য ওহী বলতে মুজতাহিদীনের ইজতিহাদকে বুঝায়।

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ الآية.

القلب به و تسليم القلب مع غاية الاجلال و نهاية التعظيم كما صرح به الشيخ الامام ابن الهمام فى السايرة و الحافظ ابن تيمية و الحافظ ابن القيم فى كثير من مصنفتها ـ

: মুসলিম বিদ্বানমণ্ডলীর মতে, 'ধর্মের প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য অংশ যারা প্রত্যাখ্যান করে কিংবা শরীয়তের কোন অংশকে আংশিকভাবে গ্রহণ করে এমন কি তা যদি একটি সুন্নতও হয় তবে সে কাফির। কেননা রসূলে করীম (সা) আল্লাহ্‌র তরফ থেকে যা কিছুই এনেছেন তার সব কিছুই পরিপূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে, সন্তুষ্টচিত্তে ও অবনত মস্তকে মেনে নেওয়া ও গ্রহণ করার নামই ঈমান। শেখ ইবনুল হুমাম, হাফিজ ইবনে তায়মিয়া এবং হাফিজ ইবনুল কাইয়িম তাদের বহু রচনায় একথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত 'আলেম শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র) স্বীয় অনুদিত কুরআনুল করীমের টীকায় লিখেছেন: 'দুটি জিনিসের নাম ঈমান—সত্যিকার উপলব্ধি এবং অবনত মস্তকে তারই স্বীকৃতি।' অর্থাৎ আল্লাহ্‌ এবং তদীয় রসূল (সা)-এর সামগ্রিক নির্দেশাবলী বিশুদ্ধ ও সত্য মনে করে স্বীকৃতি দান ও গ্রহণের নিমিত্তে তার সামনে মাথা নত করে দেয়া। স্বীকৃতির দিক থেকে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ পাকের যাবতীয় আইন-কানুন ও বিধানাবলী মেনে নেয়া এবং এর সমস্ত হক আদায় করার ঐকান্তিক ও সমর্পিত সুদৃঢ় অঙ্গীকার ও স্বীকৃতির নামই ঈমান। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিপূর্ণ রবুবিয়তের এটা সেই স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার যা আল্লাহ্‌ পাক কর্তৃক—'আলাসতু বিরাব্বিকুম' 'আমি কি তোমাদের রব নই?' উত্তরে ''বালা'' 'হ্যাঁ'-এর সময় নেয়া হয়েছিলো যার উল্লেখযোগ্য প্রভাব মানুষের স্বভাবও প্রকৃতিতে আজও দৃশ্যমান। ইসলামী শরীয়তের প্রতি পরিপূর্ণ ও আন্তরিক বিশ্বাস ও স্বীকৃতির দ্বারা আমরা পূর্বেকার কৃত ওয়াদা আর একবার দোহরাই মাত্র। ইসলামী শরীয়তে যে অঙ্গীকার ছিলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—পবিত্র কুরআনুল করীমে ও সুন্নতে নববীতে (সা) তো তাই বিস্তৃতভাবে দেখান হয়েছে। এক্ষেত্রে ঈমানের দাবীদার হওয়ার

অর্থ এটাই যে, বান্দাহ, আল্লাহ, পাকের যাবতীয় হুকুম-আহকাম চাই কি তা সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথেই সম্পর্কিত হোক অথবা মানুষের সাথে, হোক তা দৈহিক প্রশিক্ষণ কিংবা আত্মিক পরিশুদ্ধি—'ইহলৌকিক স্বার্থ' কিংবা পারলৌকিক কল্যাণ, ব্যক্তিগত জীবন কিংবা সমষ্টিগত, সন্ধি অথবা যুদ্ধ সকল ক্ষেত্রেই সে এই অঙ্গীকারেই আবদ্ধ হয় যে, সে সকল অবস্থায়ই আপন প্রভুর প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকবে। আর 'আকীদা—বিশ্বাসের ক্ষেত্র যদি হয় একেবারেই শূন্য তথা বিশ্বাস যদি হয় স্রেফ কথার কথা তবে সে সমস্ত লোক নিতান্ত বিভ্রান্ত ও অকাট মূর্খ। তারা কি জানে না যে, কুরআনুল করীম, তফসীর, হাদীছগ্রন্থ এবং ফিকাহ্‌র কিতাবসমূহ যেগুলোকে শরীয়তের প্রমাণপঞ্জী বলা হয়—তন্মধ্যে সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও যাকাতের জন্য মাত্র কয়েকটি পাতা নির্দিষ্ট—আর অবশিষ্ট হাজার নয়—লাখো পৃষ্ঠা রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাদি নিয়ে আলোচনার উপর নিবদ্ধ? এমনকি সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাতের ভেতরেও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত বিষয়াদির উল্লেখ আছে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক সালাত পরিত্যাগ করে ইসলামী শরীয়ত তাকে হত্যা অথবা পরিবর্তে যাবজ্জীবন বন্দী রাখবার বিধান দেয়। এখন আপনিই ন্যায়ত বলুন, ইচ্ছাপূর্বক সালাত তরককারীকে হত্যা অথবা বন্দী করা রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় কিনা? অবশ্যই এটা রাষ্ট্রনীতির সাথে সম্পর্কিত বিষয়। ঠিক তেমনি দুই 'ঈদ, জুম'আ, সালাতুল ইস্তিস্কা ইত্যাদি ইসলামী রাষ্ট্রনীতির সাথে কতখানি সম্পৃক্ত ও সম্পর্কিত—ইসলামী আইনশাস্ত্রের (ফিকাহ্) সুবিজ্ঞ পাঠকের নিকট তা মোটেই প্রচ্ছন্ন নয়। যাকাত প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রনীতিরই শুধু, নয়—বরং বলা চলে তা রাষ্ট্রনীতির প্রাণসত্তা। আপনি বুখারী শরীফের সেই হাদীছটির প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করুন—তাহলেই এর গোপন রহস্য আপনার সামনে ধরা পড়বে :

لما توفى رسول الله وارتد من العرب قال عمر (رض) لابى بكر (رض) كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله (ص) امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا منى دمائهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على

قال ابوبكر (رض) والله لاقاتلن من فرق بين الصلوة والزكوة فان الزكوة حق المال والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله (ص) لقاتلتهم على ذالك الحديث.

"রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই আরবের কিছু সংখ্যক লোক মুরতাদ হয়ে যায়। (হযরত আবুবকর (রা) এসব লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে) হযরত 'উমর (রা) হযরত আবুবকর (রা) কে বলেন: আপনি ঐ সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন? অথচ রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন: লোকেরা যতক্ষণ না কলেমায়ে তাইয়েবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্বীকার করবে ততক্ষণ আমাকে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যখন তারা এটাকে স্বীকার করে নেবে—তখন তাদের জীবন ও সম্পদ আমার তরফ থেকে পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যাবে আর একমাত্র ইসলামের হকই শুধু তার উপর অবশিষ্ট থাকবে এবং হিসাব-নিকাশের সার্বিক দায়িত্ব আল্লাহ্‌র হাতে ন্যস্ত হবে। হযরত আবুবকর (রা) বলেন: আল্লাহ্‌র কসম! যারাই সালাত ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধ অবশ্যই আমি যুদ্ধ ঘোষণা করবো। কেননা—যাকাত সম্পদের উপর আল্লাহ্ সৃষ্ট অধিকার। আল্লাহ্‌র কসম! যদি কেউ এককালে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে পেশকৃত উটের রশিটি দিতেও অস্বীকার করে তাহ'লেও আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো।"—হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (র) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'য় এবং ইমান যুবেয়দী (র) তাঁর 'ইত্তেহাফ' নামক গ্রন্থে যাকাতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। স্বয়ং আমার উস্তাদ শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসায়ন আহমদ মাদানী (র) বুখারী ও তিরমিযী শরীফের দরস পেশ করতে গিয়ে বলেছেন: যদি মিলিয়ে দেখ তবে জানতে পারবে যে, যাকাত বিভাগ ইসলামের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যে, যদি দুনিয়াবাসী একে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করত তবে তারা শত সহস্র দুর্যোগ ও দুর্বিপাক থেকে নাজাত পেত এবং কম্যুনিজম, বলশেভিজম, সোশ্যা-

লিজম ইত্যাদি ফেৎনার শিকারও তারা হ'ত না। মোদ্দা কথা, ইসলামের রাষ্ট্রনীতিকে অস্বীকার করা কুরআনুল করীম এবং নবীয়্যিল আমীন হযরত রসূল করীম (সা)-এর জীবনাদর্শ (সুন্নত) কে অস্বীকার করারই নামান্তর—যা স্পষ্টতই কুফরী।

৩. তৃতীয় দল বলেন: ইসলামে রাষ্ট্রনীত আছে বটে কিন্তু তা বিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই যথেষ্ট নয়। এই দলটিও কাফির। এদের নিকট ইসলাম যেন পূর্ণাঙ্গ নয়। অথচ আল্লাহ্ পাক বলেন:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থাৎ "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করিলাম, আর তোমাদের উপর আমার নিয়ামত (ইসলাম) পরিপূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন (জীবন ব্যবস্থা ও জীবন দর্শন) হিসাবে মনোনীত করিলাম।" বস্তুত ইসলাম আমাদের জন্য একটি পূর্ণাংগ জীবন দর্শন। কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় ও সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে—কি অন্য কোন বিষয়ের জন্য যেমন অক্সফোর্ডের মুখাপেক্ষী নয়, তেমনি মুখাপেক্ষী নয় কেম্ব্রিজ, হার্ভার্ড, হাইডেলবার্গ কিংবা প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়েরও। বরং কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত ও অনুষ্ঠিতব্য সকল কিছুর সমাধানই হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন ও রাষ্ট্রীয় দর্শনে বিদ্যমান।

যদিও আমার পূর্বেকার বর্ণনা দৃঢ়ভিত্তিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তবুও অধিকতর তৃপ্তির জন্য আরও কিছু প্রমাণপঞ্জী এ সম্পর্কে উপস্থিত করছি:

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ

وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّتَحَاكَمُوْا إِلَى الطَّاغُوْتِ

وَقَدْ أُمِرُوْا أَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ - وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ أَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلَالًا

بَعِيْدًا ۝ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلٰى مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى

الرَّسُوْلِ رَأَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۝

১০ অর্থাৎ "তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে তাহারা বিশ্বাস করে অথচ তাহারা তাগূতের[১] কাছে বিচারপ্রার্থী হইতে চায় যদিও উহা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এবং শয়তান তাহাদিগকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করিতে চায়।

"তাহাদিগকে যখন বলা হয় আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার দিকে আইস, তখন মুনাফিকদিগকে তুমি তোমার নিকট হইতে মুখ একেবারে ফিরাইয়া লইতে দেখিবে।"

হাফিজ 'ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর স্বীয় তফসীরের ৫৯৯ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ

هذا انكار من الله عز وجل على من يدعى الايمان بما انزل الله على رسوله وعلى الانبياء الاقدمين وهو مع ذالك يريدان يتحاكم فى فصل الخصومات الى

টীকা ঃ ১ তাগূতের আভিধানিক অর্থ সীমালংঘনকারী, দুষ্কৃতির মূলে বস্তু যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ইত্যাদি। অতএব যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায়-উপকরণ তাগূতের অন্তর্ভুক্ত।

غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله .... الى ان قال
والاية عامة ذامة لمن عدل من الكتاب والسنة وتحاكموا
الى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا .

"এটা আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের তরফ থেকে আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল (সা)-এর উপর নাযিলকৃত বিধানের প্রতি তাদের ঈমানের দাবী ও পূর্ব-বর্তী নবিগণের উপর ঈমানের দাবীকে অস্বীকৃতি জানিয়েছে যারা বিবদমান বিষয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রসূলে করীম (সা)-এর সুন্নতের বাইরে অন্য কোন কিছুর নিকট বিচার-নিষ্পত্তির প্রার্থী হয়।..........আয়াতটিতে সাধারণভাবে ঐ সমস্ত লোকদের প্রতিই নিন্দাবাদ উচ্চারিত হয়েছে যারাই আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রসূল (সা)-এর সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যের নিকট বিচারপ্রার্থী হয়েছে। এটা বাতিল ও ভ্রান্ত এবং এখানে 'তাগূতের' অর্থ এটাই।

মোদ্দা কথা, উল্লিখিত আয়াত সাধারণ অর্থে প্রযোজ্য। এতে ঐ সমস্ত লোকেরই নিন্দাবাদ করা হয়েছে যারা আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রসূলে করীম (সা)-এর সুন্নত (জীবনধারা ও জীবনাদর্শ) ভিত্তিক রাষ্ট্রনীতি পরিত্যাগ করে অন্যবিধ রাষ্ট্রনীতি ও অন্যান্য দর্শনের প্রত্যাশী হয়—চাই কি সে রাষ্ট্রনীতি ও দর্শন ইংলন্ডের হোক কিংবা জার্মানী, রাশিয়া কিংবা চীনের, অক্সফোর্ডের—অথবা কেম্ব্রিজের। সাথে সাথেই উক্ত আয়াতে তাদের ঈমানের দাবীকে সরাসরিভাবে অস্বীকার করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ পাকের বাণী: 'তোমার প্রভুর শপথ! তাহারা কখনই বিশ্বাস স্থাপনকারী হইতে পারিবে না—যে পর্যন্ত (হে নবী!) তোমাকে অভ্যন্তরীণ বিরোধে বিচারক হিসাবে না মানে, তৎপর তুমি যে বিচার করিবে তাহা তাহাদের অন্তরে বিদ্বেষের না হয় এবং উহা শান্তভাবে পরিগ্রহণ না করে।

মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত ইমাম আলূসী বাগদাদী (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—অর্থাৎ (হে নবী), তোমাকে তারা সকল বিষয়ে বিচারক হিসাবে মেনে নেবে। হযরত শেখুল ইসলাম (র) বলেন:

যিন্দীক সম্পর্কে

'খয়রুল বারী, নামক কিতাবের টীকায় বলা হয়েছেঃ কোন ব্যক্তি ইসলামকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে; কিন্তু এর মৌলিক ও অপরিহার্য বিষয়-গুলোর ক্ষেত্রে—সাহাবা, তাবেয়ীন এবং 'উলামায়ে-কিরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়, তবে তাকে যিন্দীক বলে। যেমন,—কেউ স্বীকার করলো—কুরআন এবং কুরআনুল করীমে বর্ণিত বেহেশ্ত—দোযখ সবই সত্য, কিন্তু এর ব্যাখ্যায় বলে, বেহেশ্তে বলতে সেই আনন্দ ও মানসিক তৃপ্তিকেই বুঝায় যা কোন ব্যক্তি তার প্রশংসনীয় কাজের বিনিময়ে পেয়ে থাকে এবং দোযখ বলতে সেই গ্লানি ও অনুশোচনাকে বুঝায় যা কোন ব্যক্তি তার নিন্দনীয় কাজের বিনিময়ে ভোগ করে; এরূপ ব্যক্তিই যিন্দীক। কিংবা যেমন, কেউ কেউ বলে থাকে—হযরত মুহাম্মদ (সা) শেষ নবী—আর তার অর্থ—তারপর আর কাউকেই নবী হিসাবে নামকরণ বৈধ নয়; এরাও যিন্দীক। এদের হত্যার ব্যাপারে শেষ যুগের হানাফী ও শাফেয়ীপন্থী সমস্ত 'উলামায়ে-কিরাম একমত। বর্তমান যুগে কাদীয়ানীরা ও 'আলীগড়ের প্রখ্যাত যিন্দীক এবং যুগে যুগে তাদের অনুসারীরা যারা আজকের যুগে রাফেযীদের ভূমিকা পালন করছে যারা এককালে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত 'উমর ফারুক (রা)-কে গালিগালাজ করতো, অভিশাপ দিতো এবং চারজন সাহাবা ব্যতিরেকে সবাইকে প্রত্যাখ্যান করতো, ইসলামের আরকান-আহকামকে অবিশ্বাস করতো, সাহাবাদের অভিশাপ দিতো, হযরত 'আয়েশা (রা)-এর উপর অপবাদ দেয়; মুতা বিবাহকে পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে ব্যভিচার বলে এবং হযরত হাসান, হুসায়ন, হযরত 'আলী (রা) এমন কি খোদ রসূলুল্লাহ, (সা)-কে ব্যভিচারী হিসাবে অভিযুক্ত করে। আল্লাহ্ পাক এদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। এদের গোমরাহী ও অবমাননা থেকে আমরা তাঁরই আশ্রয় চাই।

আমাদের যুগের যিন্দীকেরা—যারা ইসলামের দাবীদার—অজ্ঞতা ও জাহিলিয়াতের ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে কুরআন শরীফ ও হাদীছ পাকের

ব্যাখ্যা দেয় এবং এমন সব তাবীল পেশ করে—সাহাবা ও তাবেয়ীন (রা) যা শুনলে এদের বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে পড়তেন। এরা 'উলামায়ে কিরাম এবং আল্লাহ্‌র সৎ বান্দাদের বিরুদ্ধে অপবাদ প্রয়োগ করে—তাঁদের প্রত্যাখ্যান করে; ইসলামী শরীয়ত তথা ধর্মের মৌলিক বিধি-বিধানগুলোকে হাসি-তামাশা ও খেলাধুলার বস্তুতে পরিণত করে। এরাই 'আলীগড়ের যিন্দীক সম্পর্কে ধারণা পোষণ করে দীন-ধর্মের তথা জাতির সংস্কারক (মুজাদ্দিদ) রূপে। এরা রসূল (সা) আনীত জীবন-ব্যবস্থা ও জীবন-দর্শনের বাইরে অন্যবিধ জীবন-ব্যবস্থা ও জীবন-দর্শনের প্রতিষ্ঠা চায়। এদের অধিকাংশই বলে, মুহাম্মদ (সা)-এর আনীত দীন সংস্কারের মুখাপেক্ষী এবং তাঁর প্রদর্শিত ও অনুশীলিত রাষ্ট্রনীতির পরিপূর্ণতার জন্য বর্তমান যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণরূপে মুখাপেক্ষী এবং এটা ব্যতিরেকে তা অপূর্ণ। এদের গোমরাহী ও অবমাননা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে এরা কুপিত—নবী করীম (সা)-এর দর্শন সম্পর্কে বিতৃষ্ণ। এদের নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবিরা সালাত সিয়াম, হজ্জ, যাকাত কোনটিরই ছায়া মাড়ায় না। এরা মদে সাংঘাতিকভাবে আসক্ত। শুধু তাই নয়, এরা আসক্ত জুয়ায়, সুদে, অশ্লীল ও গর্হিত কাজে। এরা তাদেরই ছবি ঘরে টাঙিয়ে শ্রদ্ধা জানায়—যাদের দেখলে আল্লাহ্‌র সৎ বান্দাদের গুমরাহ উপস্থিত হয়। আল্লাহ্ সকলকে হিদায়েত দিন।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির 'আল্লামা হক্কানী তাঁর সুবিখ্যাত তফসীরের ভূমিকায় 'আলীগড়ের সুপরিচিত যিন্দীক এবং তদীয় তফসীর তফসীরে মানেসা সম্পর্কে বর্ণনার পর লিখেছেন :

এই ব্যক্তি স্বীয় ভ্রান্ত ও বাতিল ধারণা ইউরোপের মুলহিদদের নিকট থেকে লাভ করেন এবং যার অনুসরণকে তিনি জাতীয় উন্নতি এবং ইসলামের কল্যাণ মনে করেন ও এতে (তফসীরে মানেসায়) তা লিপিবদ্ধ করেন এবং পারম্পরিক সম্পর্কহীন কুরআনুল করীমের আয়াত, রসূল করীম (সা)-এর হাদীছ এবং 'উলামাদের পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন উক্তি স্বীয় মতের

সমর্থনে পেশ করে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশাদির বিকৃতি সাধন করেছেন। বস্তুত এটা কোন তফসীর গ্রন্থই নয় বরং তফসীরের নামে কুরআনুল করীমের উৎকট বিকৃতি তিনি এতে ঘটিয়েছেন। লাগামহীন উক্তি এবং ইলহাদী মতবাদী হওয়ার কারণে হিন্দুস্তানের 'আলিমকুল তার কুফরীর উপর ফতওয়া দিয়েছেন। কেননা তিনি ও তার চেলা-চামুন্ডারা বেহেশ্ত ও দোযখের অস্তিত্বকে যেহেতু অস্বীকার করেছেন, ইলহামের মাধ্যমে প্রাপ্ত বাণীকে তারা বেহুদা ও বাহুল্য মনে করেন। তাদের উপর আরোপিত কুফরীর ফতওয়াকে তারা মোটেই পরওয়া করেন না—উপরন্তু এটাকে তারা হাসি-তামাশার সাহায্যে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা পান। আল্লাহ্ পাক আমাকে আশ্রয় দিন। যারা তাকে মুজাদ্দিদে দীন তথা দীন-ধর্মের সংস্কারক মনে করেন এবং তার চিন্তার বিকৃতিকে সংস্কার নাম দেন তারা নিঃসন্দেহে নিকৃষ্টতম পাপী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। এ সমস্ত লোকের যারা ইসলামের দাবী করেন তাদের সম্পর্কে ইসলাম প্রিয় লোকদের প্রতারিত হওয়া সমীচীন নয়। বরং তাদের যদি সালাত ও সিয়ামের পাবন্দও দেখা যায় তবুও তারা যিন্দীক ও কাফির। এরা প্রকৃত কাফিরদের চেয়েও ইসলামের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর। আফসোস! এদেশে শর'য়ী আইন-কানুন যদি আজ প্রতিষ্ঠিত থাকতো তবে ইসলামী প্রশাসনের পক্ষে এদের হত্যা করা ফরয হতো। হযরত শেখ ইবনুল হুমাম তদপ্রণীত আল-ফাত্হ নামক গ্রন্থে বলেন ঃ

والحق ان الذى يقتل ولا تقبل توبته هو المنافق
فالزنديق ان كان حكمه كذالك فيجب ان يكون مبطنا
كفره الذى هو عدم التدين بدين ويظهر تدينه بالاسلام
وكذا يقتل بلا توبة من علم انه ينكر فى الباطن بعض
الضروريات كحرمة الخمر ويظهر اعتراف حرمته۔

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই যে, যিন্দীককে হত্যা করা হবে এবং তার তওবা কবুল করা হবে না। কেননা সে মুনাফিক। গোপনীয়ভাবে সে কুফরী 'আকীদা পোষণ করে যদিও প্রকাশ্যে সে ইসলামের দাবীদার। ঠিক অনু-রূপভাবে কোন ব্যক্তি পরিবেশগত ও পারিপার্শ্বিক কারণে কিংবা অসদুদ্দেশ্য

প্রণোদিত হয়ে মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে অবিশ্বাসী হয়েও যদি প্রকাশ্যে তা হারাম স্বীকার করে তবুও তাকে হত্যা করা হবে এবং তার তওবা কবুল করা হবে না। তবে এক্ষেত্রে শর্ত থাকবে তার 'আকীদা সম্পর্কে পূর্বাহ্নে অবহিত হতে হবে।

যিন্দীকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'আল্লামা শামী তাঁর সুবিখ্যাত রুদ্দুল মুহতার নামক গ্রন্থে বলেন :

هو المبطن لكفر المعروف بنبوة محمد صلعم۔

অর্থাৎ—সেই ব্যক্তিই যিন্দীক যে অন্তরে কুফরী মতবাদ পোষণ করে কিন্তু মুখে ও বাহ্যত হযরত মুহাম্মদ (সা) আনীত জীবন-দর্শন ইসলামের সত্যতার স্বীকৃতি দেয় আর স্বীকৃতি দেয় মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওতের প্রতি। এরপর তিনি বলেন :

واذا اخذ الزنديق الداعى اى الذى يدع الناس الى زندقته تقتل ولايقبل توبته۔

অর্থাৎ যারা মানুষকে গোমরাহীর দিকে আহবান জানায় যদি তারা ইসলামী প্রশাসনের হাতে বন্দী হয় তবে তাদের হত্যা করা হবে এবং তাদের তওবা কবুল করা হবে না। অবশ্য এর পরও প্রশ্ন থেকে যায়—যিন্দীক তার গোমরাহী ও বিভ্রান্তিকর চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার গোপনীয়তা রক্ষায় সচেষ্ট থাকে, সেক্ষেত্রে তার পক্ষে লোকদের গোমরাহীর দিকে আহবান জানানো কিভাবে সম্ভব? এর জবাবে রুদ্দুল মুহতার প্রণেতা বলেন : যেহেতু সে নিজ গোমরাহীকে কুরআনুল করীমের বিকৃতিরূপে অথবা নিজ বিকৃত চিন্তাধারাকে সংস্কার ও সংশোধনের নামে জনগণের মধ্যে চালু করবার প্রয়াস পায়। রুদ্দুল মুহতারের ভাষায় :

فان قلت كيف يكون معروفا داعيا الى الضلال وقد اعتبر فى مفهومه الشرعى ان يبطن الكفر قلت لا بعد فيه فان الزنديق يموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجها فى الصورة الصحيحة وهذا معنى ابطان الكفر فلا ينافى كونه معروفا بالضلال والاضلال۔

"এরপর যদি তুমি বলো যিন্দীক তার গোমরাহী, বিভ্রান্ত চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার দিকে আহ্বান জানায় এটা কি করে জানা যাবে? অথচ সে তার কুফরী ও বিভ্রান্ত চিন্তাধারা গোপন করবে সেটাই তো স্বাভাবিক। উত্তরে আমরা বলবো যে, এতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। কেননা যিন্দীক তার কুফরী মতবাদ এবং বিকৃত ও বাতিল 'আকীদা সংস্কার ও সংশোধনের নামে চালু করবার প্রয়াস পায়। আর এটাই গোপন করার অর্থ। অতএব নিজে গোমরাহ হওয়া এবং অপরকে গোমরাহ করার ক্ষেত্রে তা আর অপ্রকাশ্য থাকে না।"

এরূপ বিস্তৃত ব্যাখ্যায় এতক্ষণে এটাও জানা গেল যে, এরা 'উলামায়ে কিরামের প্রতি এত নাখোশ কেন—কেনই বা তাদেরকে গালিগালাজের লক্ষ্যে পরিণত করে; ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি শত্রুতামূলক আচরণেরই বা কারণ কি—আর কেনই বা ইসলামী রাষ্ট্রনীতির নামে এরা আঁতকে ওঠে ও এর প্রতি মারমুখো রকমের বিরূপ।

والله الهادى ومنه التوفيق-

আল্লাহ্ই হিদায়েতদানকারী এবং তিনিই সকল শক্তির আধার।

এখন আমরা ইসলামী রাষ্ট্রনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের খসড়া চিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করবো।

বর্তমান পুস্তকের প্রথম অংশে রাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা, এর প্রয়োজনীয়তা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। মোটামুটিভাবে এর সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ:

মানুষ স্বভাবতই সঙ্গলিপ্সু। এজন্যেই তার সামাজিক জীবন। আর সামাজিক জীবনের পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত ব্যবস্থার নামই রাষ্ট্রনীতি। এ ব্যবস্থার ভিত্তি যদি হয় সুদৃঢ় ইনসাফের উপর তবে তাকে বিশুদ্ধ ও সঠিক ব্যবস্থা বলা যায়। আর এর ভিত্তি যদি এর বিরোধী ও পরিপন্থী হয় তবে তাকে জুলুমমূলক ও অত্যাচার-সর্বস্ব বলা হবে। প্রথমেই আমরা বহুবিধ প্রমাণের সাহায্যে প্রমাণিত করতে চেষ্টা করেছি এবং এটাই আমাদের সুদৃঢ় 'আকীদা যে, ন্যায়ানুগ এ সুদৃঢ়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার

জন্য পূর্বশর্ত হলো—তা হবে শরীয়তে মুহাম্মদী (সা)-এর পূর্ণ অনুসারী। সোজা কথা, বিশুদ্ধ ও ন্যায়ানুগ রাষ্ট্রনীতি শরীয়তের পূর্ণ অনুকরণ ও অনুসরণের উপর নির্ভরশীল।

সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় জীবন সঠিক, বিশুদ্ধ ও ন্যায়ানুগ ব্যবস্থাধীনে পরিচালনা করবার জন্য সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল একজন লোকের প্রয়োজন হয়—শরীয়তের পরিভাষায় তাকে খলীফা বলা হয়। জনগণের কর্তব্য তাঁকে মেনে চলা ও তাঁর প্রতি অনুগত থাকা। খলীফাও জনগণের সার্বিক হিফাজতের দায়িত্ব পালন করবেন। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অধিকারের এটাই সীমারেখা। হিফাজত দু' প্রকারের। প্রথমত, অভ্যন্তরীণ হিফাজত—স্বরাষ্ট্র বিভাগ যার দায়িত্বে নিয়োজিত; দ্বিতীয়ত, বহিঃশক্তির হাত থেকে হিফাজত—দেশরক্ষা ও বৈদেশিক বিভাগ যার দায়িত্বে নিয়োজিত।

খলীফা ও সম্পর্কিত বিষয়াবলী

খিলাফত প্রসংগে

الخلافة هى الرياسة العامة فى الدين والدنيا خلافة عن النبى صلعم كذا فى المسامرة ص ١١٩٥---- تطبيق القوانين الفقهية على الوقائع ويستشير فى ذالك من كبار علماء الدين -

সংক্ষেপে : খিলাফত একটি আদর্শবাদী দীনি রাষ্ট্র। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা তথা জীবন-দর্শন এ রাষ্ট্রের সকল আইনের উৎস। ২. এর দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো : জনগণকে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রসূল আকরাম (সা)-এর প্রদর্শিত জীবনাদর্শের মাধ্যমে সার্বিক কল্যাণের পথে পরিচালিত করা; ৩. খলীফা যতদিন পর্যন্ত শরয়ী বিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত করবেন ততদিন তাঁর আনুগত্য মেনে চলা জনগণের উপর ওয়াজিব। ৪. খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় শরীয়তের বুনিয়াদ ছিলো আল্লাহ্‌র কিতাব আল-কুরআন, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনাদর্শ এবং কিয়াস যা উক্ত দু'টো সূত্র থেকে উৎসারিত। ৫. যখন কোন নতুন ঘটনার উদ্ভব ঘটতো যে সম্পর্কে কুরআনুল করীমে কিংবা রসূল (সা) প্রদর্শিত জীবনাদর্শে স্পষ্ট কোন বিধান নেই তখন খলীফা যুগের মুজতাহিদীনের সামনে ঘটনাটি উপস্থাপিত করতেন। এ ব্যাপারে সম্মিলিত রায় ও সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে খলীফা সে মাফিক সমাধান নির্দেশ করতেন। মতবিরোধ ও মত-বৈষম্যের ক্ষেত্রে খলীফা যেটাকে অধিকতর ন্যায় ও যুক্তিযুক্ত মনে করতেন তদনুযায়ী আমল করতেন। ৬. খলীফার দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিলো জনগণের মধ্যে আল্লাহ্‌র বিধান প্রচলিত করা। ৭. আল্লাহ্‌র কিতাব আল-কুরআন এবং রসূল করীম (সা)-এর সুন্নত মুতাবিক জনগণ প্রথম দিকে খলীফার হাতে বায়'আত (আনুগত্যের শপথ) নিতেন। এরপর হযরত আবু বকর

সিদ্দীক (রা), হযরত 'উমর ফারূক (রা)-এর প্রদর্শিত তরীকায়, অতঃপর খুলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত পন্থায় আনুগত্যের শপথ নিতেন। কেননা রসূল মকবূল (সা) বলেছেনঃ তোমাদের উপর আমার সুন্নতের অনুসরণ, অতঃপর সত্যাশ্রয়ী খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণ অপরিহার্য। ৮. বর্তমান যুগে চার ইমামের (যথাক্রমে—ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম শাফি'ঈ (র), ইমাম মালিক (র) ও ইমাম আহমদ বিন-হাম্বল (র)-এর অনুকরণ ও অনুসরণ জরূরী। কেননা তাঁরা ইসলামের সমগ্র রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়াদির সাংবিধানিক রূপদান করে গেছেন। ৯. ফিকাহ্ গ্রন্থে লিখিত আইন-কানূনে বিভিন্নমুখী ঘটনাবলীর সাথে সামঞ্জস্য ও সংগতিপূর্ণ করে তুলতে খলীফা বহুল পরিমাণে ইজ্‌তিহাদের দ্বারস্থ হবেন এবং নিজ নিজ যুগের গভীর প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্যের অধিকারী, বিচক্ষণ, দূরদর্শী 'উলামায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করবেন।

খলীফাকে ইমামও বলা হয়ে থাকে। শব্দ দু'টি একই ব্যক্তির দু'টি মর্যাদামন্ডিত অবস্থানের পরিচয় ও প্রকাশ ঘটিয়েছে। বস্তুতপক্ষে খিলাফত ও ইমামত বলতে সমস্ত নবিগণের প্রতিনিধিত্ব এবং তাঁদের অবর্তমানে সমগ্র উম্মতের নেতৃত্ব বুঝায়। সুপ্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হুযূর আকরাম (সা)-বলেনঃ 'তোমাদের পূর্বে ইসরাঈল বংশীয় নবিগণ রাজনীতি করতেন। যখন একজনের ইন্তেকাল হতো তখন অন্যজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত (খলীফা) হতেন। নুবুওত পর্ব বর্তমানে সমাপ্ত। তোমাদের মধ্যে এখন থেকে শুধু খলীফাই নির্বাচিত হবে।'

খলীফা নির্বাচিত হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্তাদি, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও উপযুক্ততা সম্পর্কে বিস্তর মতভেদ বিদ্যমান। শরহে মাওয়াকিফসহ অন্যান্য কিতাবাদি এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। এখানে আমরা শুধু 'উলামাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তগুলোই লিপিবদ্ধ করে ক্ষান্ত হবো।

قال الحافظ ابن كثير فى تفسير قوله تعالى واذ
قال ربك للملئكة انى جاعل فى الارض خليفة ....
وان الفاسق لايصلح ان يكون اماما ولا قائدا
والله الهادى.

হাফিজ ইবনে কাছীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে কুরআন শরীফের উল্লেখিত "তোমার প্রভু প্রতিপালক যখন ফিরিশতাদিগকে বলিলেন: আমি পৃথিবীর বুকে একজন খলীফা প্রেরণ করিতেছি" আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন: ইমাম কুরতবী ও অন্যান্য বিদ্বান ব্যক্তি আলোচ্য আয়াত দ্বারা খলীফা নির্বাচনকে ওয়াজিব বলে প্রমাণ করেন যেন তিনি জনগণের মধ্যে বিবদমান বিষয়ে ফয়সালা করতে পারেন, তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের অবসান ঘটাতে পারেন, জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমকে সাহায্য ও অপরাধীকে তার কৃত অপরাধের দণ্ড প্রদান-অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের অবসান ইত্যাদিসহ এমন সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারেন-যা ইমাম ব্যতিরেকে অন্যের পক্ষে অসম্ভব বিধায় ইমাম নির্বাচনকে অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয় বলে গণ্য করা হয়েছে। ইমামকে অবশ্যই একজন পুরুষ, স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, মুসলমান, ন্যায়পরায়ণ, মুজতাহিদ, দূরদর্শী এবং বিচক্ষণ, দৈহিক ও মানসিক দিকে সুস্থ ও পরিপূর্ণরূপে নিখুঁত এবং যুদ্ধ বিষয়ে ওয়াকিফহাল—কারও মতে কুরায়শ বংশোদ্ভূত হওয়া আবশ্যক। ইমাম শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় ইমামের জন্য জ্ঞান ও ন্যায়-পরায়ণতার শর্তকে ইজমা'র অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করেন। ইমাম জাস্সাস রাযী স্বীয় আহকামুল কুরআন নামক গ্রন্থে - لا ينال عهدى الظالمين - "আমার ওয়াদা জালিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।" আয়াত দ্বারা ন্যায়-পরায়ণতাকে ইমামের জন্য অপরিহার্য শর্ত বলে উল্লেখ করেন। বিশেষ পর্যালোচনায় ইমাম ও কাযীর ন্যায় ধর্মীয় ক্ষেত্রে ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে ন্যায়পরায়ণতাকে বিশেষ আবশ্যকীয় বলে বিবেচনা করেছেন এবং ফাসিক তথা বদকার লোকদের ইমাম ও নেতা হওয়াকে অশুদ্ধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

ইসলামী রাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্‌র দীন প্রতিষ্ঠাই খিলাফতের উদ্দেশ্য

আমি অনেকবার বলেছি, ইসলামে রাষ্ট্রনীতি আছে এবং তা তাবত দুনিয়ার প্রয়োজনের মুকাবিলায় যথেষ্ট। যারা বলে, ইসলামে রাষ্ট্রনীতি নেই

অথবা ধর্ম এক জিনিস আর রাষ্ট্রনীতি অন্য জিনিস কিংবা ইসলামে রাষ্ট্রনীতি আছে বটে কিন্তু বর্তমান যুগের প্রয়োজন ও চাহিদার তুলনায় তা মোটেই যথেষ্ট নয়--তারা বিভ্রান্ত ও অজ্ঞ--কিংবা তারা মুলহিদ ও যিন্দীক। তাদের উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল এবং ইসলামের দৃষ্টিতে তা গ্রহণের অযোগ্য। এ অধ্যায়ে আমরা এটাই প্রমাণ করতে চাই যে, ইসলামী হুকুমত এবং খিলাফতের একটাই উদ্দেশ্য তার তা হলো-আল্লাহ্‌র বান্দাদের মাঝে ইসলামী রাষ্ট্রনীতির প্রচলন এবং আল্লাহ্‌র দীন কায়েম করা। আর এ কারণেই খিলাফতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করতে চাই যেন সকল বিষয়েই সুবিচার করা সম্ভবপর হয় এবং রাষ্ট্রনীতির প্রকৃতি ও বাস্তবতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ইসলামী রাষ্ট্রনীতি গোটা মানব জাতির সামগ্রিক চাহিদা পূরণে যে পরিপূর্ণরূপে বাস্তব ও ন্যায়ানুগ সে সম্বন্ধে আরও অধিক বক্তব্য উপস্থাপন সম্ভব হবে এবং খিলাফতের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হওয়া যাবে। সমাজ বিজ্ঞানের জনক 'আল্লামা ইবনে খলদুন স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় যা "মুকাদ্দিমা ইবনে খলদুন" বা ইবনে খলদুন রচিত ইতিহাসের মুখবন্ধ নামে পরিচিত—গ্রন্থের লিখিত পেশ কালামের সারসংক্ষেপ নিম্নে পেশ করা গেলো :

১. মানব সমাজের জন্য সামাজিক জীবন একান্ত অপরিহার্য এবং তা তার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২. সামাজিক জীবনের ভিত্তি পারস্পরিক সম্পর্ক, নানাবিধ কার্যকলাপ, লেন-দেন, মিলিত পানাহার ও সামাজিক আদান-প্রদান, পারস্পরিক বিয়ে-শাদী ও সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি।

৩. যেহেতু মানব প্রকৃতিতে কাম, ক্রোধ বিদ্যমান—সেহেতু সামাজিক জীবনে জুলুম ও বাড়াবাড়ি থাকবেই।

৪. জুলুম ও বাড়াবাড়ির পরিণতি শেষ পর্যন্ত ফেতনা—ফাসাদ, হত্যা ও যুদ্ধ এবং বিবাদ--বিসম্বাদ থেকে শুরু করে মানব জাতির নির্মূল-ধ্বংসে গিয়ে শেষ হয়।

৫. মানব সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই সকল রাষ্ট্রনৈতিক আইন-কানুন এবং এসব আইন-কানুন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রচলনের তাগিদেই একজন শাসকের প্রয়োজন।

৬. এই সমস্ত আইন-কানুন যখন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবি মহল তাদের অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে প্রণয়ন করেন তখন তাকে বুদ্ধিবৃত্তিক রাষ্ট্রনীতি বলা হয়।

৭. আর ঐ সমস্ত আইন-কানুনের প্রণেতা যদি স্বয়ং আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন হন তখন তাকে ধর্মীয় রাষ্ট্রনীতি বলা হয় যা নিঃসন্দেহে দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণনির্ভর।

وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها
كانت سياسة دينية نافعة فى الحياة الدنيا والاخرة.

৮. শরীয়ত 'ইবাদত, পারস্পারিক আদান-প্রদান, লেন-দেন এবং রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধানাদির সমাহার।

৯. শরীয়তের বিধানদাতা ও ব্যাখ্যাতা হযরত মুহাম্মদ (সা) কোনটি মানব স্বার্থের অনুকূল, কোনটি প্রতিকূল ও পরিপন্থী সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ও অধিকতম ওয়াকিফহাল।

১০. ধর্মের অন্তর্গত বিষয়াদি ও দুনিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকর্মে ইসলামের পয়গম্বর (আ)-এর প্রতিনিধিত্বকেই খিলাফত বলা হয়।

১১. পার্থিব ক্রিয়াকাণ্ডে ও পরিত্রাণ সম্পর্কিত বিষয়াদিতে জনগণকে শরীয়তের বিধান মাফিক পরিচালনা করাই এর উদ্দেশ্য।

খিলাফতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের সংক্ষিপ্তসারের আরও কতিপয় বিষয়ঃ

১. প্রথমত, খলীফা আইন-কানুনের রচয়িতা কিংবা বিধান-দাতা নন বরং শরীয়তের কিতাবাদিতে যে সমস্ত আইন-কানুন ও বিধানাদি লিপিবদ্ধ শুধু সেগুলোকেই তিনি জারী করবেন।

২. খলীফা এবং শরীয়তের রাষ্ট্রনৈতিক বিধানাদির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো গোটা মানব সমাজকে জুলুম ও বাড়াবাড়ির হাত থেকে নাজাত দান এবং সুবিচার, বিশুদ্ধ ও ভারসাম্যমূলক বিধানের প্রচলন।

৩. ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ এবং চিরন্তন জীবন বিধান। আর এ কারণেই এর রাষ্ট্রনৈতিক বিধানাদি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ হওয়ার সাথে তা চিরন্তনও বটে এবং প্রতিটি শ্রেণীর স্বার্থ ও কল্যাণ এতে নিহিত।

খিলাফতের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং খলীফার পদমর্যাদা ও দায়িত্বের প্রকৃতি

খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রণেতা বলেন: ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় খিলাফতের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধি এতদূর বিস্তৃত এবং দুনিয়াব্যাপী যে, সমগ্র ধর্মীয় ও পার্থিব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহের পরিপূর্ণতা সাধন এর আওতায় এসে পড়ে। এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শুধু একটি বাক্যেই করা যেতে পারে আর তা হলো, আল্লাহর বাণীবাহক পয়গম্বর (আ)-এর মিশন কায়েম ও স্থায়ী রাখা এবং বাইরের নকল ও বিকৃতির হাত থেকে তা পাক-পবিত্র রাখা এবং এর সার্বিক উন্নতি সাধন। দু'টি বাক্যে একে আরও সংক্ষিপ্ত করা যায়,– আর তা হলো, 'ইকামতে দীন' অর্থাৎ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীনের প্রতিষ্ঠা। শব্দ দু'টি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, সমগ্র পার্থিব ও অপার্থিব উদ্দেশ্যাবলী এর আওতায় এসে যায়। অপরটি ইসলামের মৌলিক শাখা-প্রশাখাসমূহের প্রতিষ্ঠা। যেমন: সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত, আমরু বিল মা'রূফ তথা সৎকর্মে আদেশ ও নাহী 'আনিল মুনকার' তথা অসৎকর্মে নিষেধ, জিহাদ, বিচার বিভাগ, ফৌজদারী দণ্ড বিভাগের প্রতিষ্ঠা, জনগণের মধ্যে ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার প্রচার, প্রসার ও শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি সবগুলোই এর শাখা-প্রশাখার অন্তর্গত হয়ে পড়ে। রসূলে করীম (সা)-এর জীবন এসব মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের পূর্ণতা সাধনের নিমিত্তেই ব্যয়িত হয়েছিল। রসূল (সা)-এর ইন্তেকালের পর যাঁরা খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরাও এ সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর পরিপূর্ণতা দানের জন্যেই নিজেদের সমগ্র জীবন ওয়াকফ করেছিলেন। খলীফাদের যুগে এমন কি হুযূর (সা)-এর পবিত্র যুগেও এসব লক্ষ্যসমূহের পরিপূর্ণতা দানের নিমিত্ত আলাদা ব্যক্তি

নিযুক্ত ছিলেন। যেমন : সালাতের প্রতিষ্ঠা এবং সাদাকা ও যাকাত আদায়ের দায়িত্ব নির্দিষ্ট ব্যক্তির ছিল। অন্যায় ও অসৎকর্মের সতর্কীকরণ ও প্রতিরোধে আলাদা ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন। মোকদ্দমা, সালিস-মধ্যস্থতা, বিচার—নিষ্পত্তির ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। কুরআনুল করীম ও হাদীছে রসূল (সা)-এর তা'লীম ও দরস প্রদান অন্য লোকে করতেন। এ সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই খিলাফতের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। বিস্তৃতর ক্ষেত্রে ভিন্নভিন্ন ব্যক্তির দায়িত্ব পালনের জন্য যে সমস্ত গুণাবলীর প্রয়োজন খলীফার মধ্যে সে সমস্ত গুণের সমাবেশ থাকা শুধু সমীচীন তাই নয়, উল্লিখিত প্রকাশ্য গুণাবলী ছাড়া আত্মিক উৎকর্ষের দিক দিয়েও খলীফার মধ্যে নবীসুলভ শিক্ষা ও প্রভাবের ফয়েয উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথেই বিরাজ করা উচিত। আল্লাহ্ পাক বলেন :

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ

وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔

"ইহারাই যাহাদের আমরা দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা দান করিলে সালাত কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, সৎকার্যে আদেশ প্রদান ও অসৎকার্যে নিষেধ করিবে।"

খলীফার পদমর্যাদা

রাখালের মর্যাদা ও অবস্থানের ন্যায়ই ইসলামের খলীফার মর্যাদা ও অবস্থান।

عن عبد الله بن عمر (رض) ان رسول الله ص قال الا كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته فالامير الذى على الناس راع عليهم وهو مسؤل عنهم الحديث ۔

হযরত 'আবদুল্লাহ্ বিন 'উমর (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন : তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল; আর তোমাদের প্রত্যেককেই তোমাদের

অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমীর (শাসক ও পরিচালক) জনগণের উপর রাখালসদৃশ। তাকেও তার প্রজাবৃন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' বুখারী, আবু দাউদ ইত্যাদি।

দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাখ্যা

ইসলামের খলীফা যেহেতু জনগণের উপর রাখালসদৃশ সেহেতু জনগণকে দেখাশোনা করার সার্বিক দায়িত্ব পালন করা খলীফার উপর বাধ্যতামূলক। জনগণের দেখাশোনা ও খবর-তদারকী করার এ অধ্যায়টিও অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। আমার উদ্দেশ্য শুধু এর একটি খসড়া চিত্র তুলে ধরা। সেজন্যে এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শাখা সূচীপত্রের আকারে আমরা পাঠকের সামনে তুলে ধরছি :

১. প্রথমত, খিলাফতের অর্থ ও বিত্ত-সম্পদ গ্রহণ থেকে খলীফার বিরত থাকা। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব পালনের ব্যস্ততাহেতু বায়তুল মাল থেকে ভাতা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সাথে সাথেই এ নির্দেশও তিনি নিজ উত্তরাধিকারিদের প্রতি দিয়ে যান, —তাঁর মৃত্যুর পর ব্যবসার আমদানীকৃত সম্পদ থেকে তা যেন পূরণ করে দেয়া হয়।

عن عائشة (رض) قالت لما استخلف ابوبكر (رض) قال لقد علم قومى ان حرفتى لم تكن تعجز عن مؤنة اهلى وشغلت بامر المسلمين فيأكل ال ابوبكر من هذا المال ويحترف المسلمين فيه -

হযরত আবু বকর (রা) সম্পর্কে তদীয় কন্যা উম্মাহাতুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন : খলীফা নির্বাচিত হবার পর তিনি সকলকে লক্ষ্য করে বললেন : যেহেতু খিলাফতের সার্বিক দায়িত্বের বিরাট বোঝা বহনের ব্যস্ততাহেতু তিনি পরিবারের ভরণ পোষণের নিমিত্ত অতিরিক্ত সময় দিতে অক্ষম সেহেতু সকলের অনুমতিক্রমেই বায়তুলমাল থেকে নিজ

সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ন্যূনতম ভাতা আমি গ্রহণ করবো। হযরত ফারূকে আ'যম (রা)ও মুসলিম সাম্রাজ্যের একজন সাধারণ মজদুরের ন্যায় বায়তুলমাল থেকে ততটুকু গ্রহণ করতেন যতটুকু একজন সাধারণ মজদুর তার প্রয়োজন পূরণে গ্রহণ করতো।

انا جعلناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ـ

"আমি তোমাদের গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছি যেন তোমরা পরস্পরের পরিচিতি লাভ করিতে পার। আল্লাহর নিকট সেই মর্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু।" সূরা হুজুরাত, ১৩ আয়াত।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

لا فضل للعرب على العجم ولا الابيض على الاسود ـ الناس كلهم ابن ادم وادم من تراب ـ

"আরববাসীদের উপর আজমবাসীর কোন মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নেই—ঠিক তেমনি কালোর উপর সাদারও কোন ফযীলত নেই। মানব মাত্রই আদম সন্তান আর আদম মাটির তৈরী।" মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত হয়েছে হযরত 'উমর (রা) বলেছেন :

মু'মিনের মর্যাদা নির্ধারিত হয় তাকওয়ার ভিত্তিতে—বংশীয় মর্যাদা, বিত্ত-সম্পদ কিংবা দৈহিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে নয়। যদি কখনও কোন পদস্থ কর্মচারী হযরত 'উমর (রা)-এর সামনে এমন কোন আচরণ করতো যা তাদের ও একজন সাধারণ মুসলমানের মধ্যে বৈষম্য ও বিভেদ সৃষ্টি করে তবে তিনি অত্যন্ত রেগে যেতেন এবং তাকে ধমক দিতেন। হযরত 'উকবা বিন ফরকাদ একবার হযরত 'উমর (রা)-এর খিদমতে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কিছু উত্তম খাদ্য পাঠান। হযরত 'উমর (রা) বললেন : সমস্ত মুসলমানই কি এরূপ খাবার খায় ? উত্তরে জানানো হলো : না। হযরত 'উমর (রা) এতে বললেন : তবে এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি

লিখে পাঠান,—এ খাদ্য তোমার কিংবা তোমার পিতার নয়। তোমরা মুসলমানদের তাই খাওয়াবে যা নিজেরা খাবে এবং সকল অবস্থায় বিলাসিতা বর্জন করে চলবে।

মোদ্দা কথা, ইসলাম মানুষকে যে সাম্যের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলো খুলাফায়ে রাশেদীন বাস্তবে তারই অনুশীলন করেছিলেন এবং বিশ্বের সামনে তারই জীবন্ত নমুনা উপস্থাপিত করেছেন। পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, ওঠাবসা, মোট কথা—জীবনের সকল ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশেদীন সাম্যের জীবন স্রোতে গতি ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন এবং ধনী-দরিদ্রের কৃত্রিম ভেদরেখা উঠিয়ে তা জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছিলেন।

পারস্পরিক পরামর্শ সম্পর্কে

পরামর্শের মাধ্যমে জোর-জুলুম তথা একনায়কত্বসুলভ হীন মানসিকতার মূলোৎপাটন সম্ভব হয় এবং নাগরিকদের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তাবোধের সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ বলেন :

قال تع شَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ وقال تع وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ـ

"সকল ক্রিয়া-কর্মে তাহাদিগকে পরামর্শ দিবে।" অন্যত্র 'তাহারা তাহাদের ক্রিয়া-কর্ম নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতেই পরিচালনা করিয়া থাকে।'

ومشاورة النبى صلى كبار اصحابه فى مهمات الامور معروفة فى كتب الحديث والسير ـ

খ্যাতনামা, জ্ঞানী ও প্রবীণ সাহাবায়ে কিরামের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রসূলে আকরাম (সা)-এর পরামর্শ অত্যন্ত সুবিদিত। হাদীস ও সীরত গ্রন্থসমূহ এ ধরনের ঘটনাবলীতে পূর্ণ। তাবাকাতে ইবনে সা'দ নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে :

ان ابا بكر الصديق رض كان اذا انزل به امر يريد فيه
مشاورة اهل الراى واهل الفقه دعا رجالا من المهاجرين
والانصار ودعا عمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف
ومعاذ بن جبل وابى بن كعب وزيد بن ثابت وكل هولاء
يفتى فى خلافة ابى بكر رض الخ.

"হযরত আবুবকর (রা)-এর খিলাফতকালে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দিলে ও সংকট-সন্ধিক্ষণে পরামর্শের জন্য জ্ঞানী, গুণী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোকদের বৈঠক আহ্বান করতেন। এরা আনসার ও মুহাজির উভয় শ্রেণীর লোকই হতেন যাদের মধ্যে হযরত 'উমর, 'উসমান, 'আলী, 'আবদুর রহমান বিন 'আওফ, মা'য বিন জাবাল, উবাই বিন কাব ও হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রা) প্রমুখ সাহাবা বিখ্যাত। এঁরা হযরত আবুবকর (রা)-এর যুগে ফতওয়া দানের দায়িত্বেও নিযুক্ত ছিলেন। হযরত 'উমর (রা) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার নীতি আদর্শভিত্তিক যে বুনিয়াদে স্থাপন করেছিলেন আজকের গণতন্ত্র তার সামনে নিতান্তই নিষ্প্রভ। ফতুহুল বুলদান ও কানযুল উম্মাল নামক গ্রন্থদ্বয়ে জানা যায় যে, হযরত 'উমর (রা)-এর খিলাফতকালে সকল রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি সর্বাগ্রে মজলিসে শূরায় পেশ করা হ'তো এবং চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ শেষে গৃহীত সিদ্ধান্তকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হ'তো। মজলিসে শূরায় আনসার ও মুহাজিরদের নির্বাচিত প্রবীণ, জ্ঞানী-গুণী ও দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গ শরীক হতেন। আলোচনা সমালোচনা, বিচার-বিশ্লেষণের পর সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কিংবা শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণের প্রেক্ষিতে অথবা অধিকাংশের মত সাপেক্ষে সার্বিক বিষয়াদি নিষ্পত্তি করতেন। 'মজলিসে শূরা' ছাড়াও 'মজলিসে 'আম' বা সাধারণ সভা ছিলো যেখানে আনসার এবং মুহাজির ছাড়াও আরবের সমস্ত গোত্রের নেতৃবৃন্দও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় অত্যন্ত সংকট সন্ধিক্ষণে কিংবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এ জাতীয় সভা আহ্বান করা হতো। অন্যথায় দৈনন্দিন কার্যাদিতে মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তই যথেষ্ট ছিলো। এই দুই মজলিস ছাড়াও আরও একটি মজলিস 'মজলিসে খাস' বা বিশেষ সভা নামে বর্তমান ছিলো।

'মজলিসে শূরা' এবং 'মজলিসে খাস'-এর সদস্যপদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ভোট, পার্থিব নেতৃত্ব কিংবা বয়সের আধিক্য ছিলো না বরং ইসলামী জীবন দর্শনে তথা ইসলামী শরীয়তে বিশেষ বুৎপত্তি এবং আল্লাহ্-ভীতিই ছিলো যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি। এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন 'আব্বাস (রা)-কে বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও এ সমস্ত মজলিসে উপস্থিত রাখা হতো। বুখারীসহ বিভিন্ন হাদিছ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, হযরত উমর (রা)-এর মজলিসে শূরাতে সে সমস্ত লোককে শামিল করা হতো যাঁরা কুরআনুল করীমের উপর বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতেন। বয়সের স্বল্পতা অথবা আধিক্য এক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো না। হযরত 'উমর (রা) সার্বিক ব্যাপারে ও কাজে-কর্মে কুরআনুল করীম থেকে এতটুকু বিচ্যুত হতেন না। বরং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ও বিচার বিভাগে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও এই নীতিকেই দিগদর্শন হিসেবে সামনে রাখতেন। অর্থাৎ ধর্ম তথা ইসলামী জীবন-দর্শনে গভীর পাণ্ডিত্য ও উপলব্ধি এবং আল্লাহ্ ভীতিই ছিলো এক্ষেত্রে একমাত্র মাপকাঠি। ফলে এ সমস্ত কর্মচারীদের দ্বারাই কুরআনী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং কুরআনী হুকুমতের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিলো। এতে জুলুম ও বাড়াবাড়ির রাজত্ব খতম হয়ে যায়। সকল শ্রেণীর জনগণ শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন-যাপন করতে সক্ষম হয়। সাধারণ গণমানসে এর প্রভাব এত গভীর ও ব্যাপক হয়েছিলো যে, লোকে দলে দলে আনন্দ ও সন্তুষ্টচিত্তে মুসলমান হতে থাকে। আজও যদি কোন ইসলামী হুকুমত এমত নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো তাহলে দুনিয়াভর মানুষের সামনে শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণের উৎসমুখ খুলে যেত। জুলুম ও বাড়াবাড়ির হতো মূলোৎপাটন। ভোটের সাহায্যে কিংবা অন্য কোন উপায়ে যোগ্য ও উপযুক্ত লোকের সন্ধান মিলানো আজকের দুনিয়ায় একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

খুলাফায়ে রাশেদীনের যমানায় নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে পরামর্শ সভা পরিচালিত হ'তো।

১. আল্লাহ্‌র কিতাব কিংবা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নতের ভেতরে যদি কোন সমাধান পাওয়া যেত তবে ঘটনার সাথে তার সংগতি ও সামঞ্জস্য বিধান করা;

২. না পাওয়া গেলে ইজতিহাদ করা এবং মুজতাহিদীনের কোন একজনের মতকে প্রাধান্য দেওয়া ;

৩. যুগের খলীফার হাতে শরীয়ত যে সমস্ত ব্যাপার ও বিষয় সোপর্দ করেছে তার কল্যাণধর্মী দিকগুলির উপর আলোচনা-সমালোচনা করা।

কিন্তু আজকাল যেহেতু সমগ্র রাষ্ট্রনৈতিক বিধান ও নীতিমালা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেহেতু বর্তমানে শুধু উল্লিখিত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে পরামর্শ সভা পরিচালিত হবে ঃ

১. শরীয়তের রাষ্ট্রনৈতিক বিধান ও নীতিমালাকে ঘটনাবলীর সাথে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে গভীর চিন্তা ও গবেষণা ,

২. শরীয়তে মুহাম্মদী (সা) যে সমস্ত বিষয়াদির কতিপয় সংক্ষিপ্ত বিধান বর্ণনার পর অবশিষ্ট অংশটুকু যুগের খলীফার কল্যাণকর ও শুভ বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছে তার কল্যাণকর ও ক্ষতিকর দিকের উপর আলোচনা করা।

ব্যক্তি স্বাধীনতা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এটাই যে, এখানে প্রত্যেকটি নাগরিককে তার অধিকার রক্ষা এবং স্বীয় মতামত প্রকাশের অবাধ সুযোগ দেয়া হবে। শাসকের ক্ষমতা নিরংকুশ হবে না বরং তা হবে সীমাবদ্ধ। তার কার্যপদ্ধতি ও কর্মধারার উপর আলোচনা-সমালোচনার অধিকার থাকবে প্রতিটি নাগরিকের। খুলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতে এ সবের একত্রে সমাবেশ ঘটেছিলো। প্রতিটি ব্যক্তি অবাধে তাহাদের অধিকার দাবী করতো। খলীফার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সম্পর্কে হযরত 'উমর (রা) ও হযরত আবুবকর (রা) বারবার পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেন যে, হুকুমতের কারণে তাদের আলাদা কোন মর্যাদা নেই। নমুনাস্বরূপ এখানে মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা গেল।

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রা) কিতাবুল খারাজ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন,- 'হযরত 'উমর (রা) জনগণের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন ঃ তোমাদের

ন-সম্পদে আমার অধিকার ঠিক ততটুকু, যতটুকু অধিকার এতিমের ধন-সম্পদে তার অভিভাবকের। যদি আমি ধনী হই তবে আমি বায়তুল মাল থেকে কিছুই গ্রহণ করবো না। কিন্তু আমি যদি অভাবী হই তবে প্রয়োজন মাফিক ইনসাফের ভিত্তিতে আমার খোরাক গ্রহণ করবো। লোক সকল! আমার উপর তোমাদের কতিপয় অধিকার রয়েছে যার জবাবদিহী তোমরা আমার নিকট থেকে অবশ্যই গ্রহণ করবে। ১, রাষ্ট্রের খাজনা ও ট্যাক্স বাবদ গৃহীত অর্থ ও গনীমতের মাল যেন অনর্থক জমা না করা হয়। ২, এসব সম্পদ আমার হাত দিয়ে যেন অনর্থক ব্যয় না হতে পারে। ৩, তোমাদের মাসিক ও বাৎসরিক ভাতা যেন আমি বাড়িয়ে দেই। ৪. তোমাদের রাষ্ট্রীয় সীমান্ত যেন রক্ষা করি। ৫. বিপদের মাঝে যেন তোমাদের নিক্ষেপ না করি।

তাবাকাতে ইবনে সা'দ নামক গ্রন্থে হযরত আবু বকর (রা) সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে—হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হবার পর নিম্নোক্ত ভাষণ দান করেছিলেন :

"লোক সকল! আমাকে তোমাদের শাসক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক নই। আমি যদি ভাল কাজ করি তবে আমার সাহায্য-সহযোগিতা করবে। আর যদি মন্দ পথে চলি তবে আমাকে সোজা পথে চলতে বাধ্য করবে। সততাই আমানত আর মিথ্যাই খিয়ানত। তোমাদের মধ্যে দুর্বলতম ব্যক্তি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা শক্তি-মান—যেন তার অধিকার তাকে আমি ফিরিয়ে দেই। তোমাদের শক্তিধর ব্যক্তিটিও আমার নিকট দুর্বল যার তার অধিকারও যেন তাকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারি। যে জাতি ও সম্প্রদায় জিহাদ পরিত্যাগ করে—সে জাতি ও সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ পাক হেয় ও অবমানিত করেন। যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে আল্লাহ্ পাক তাদের সাধারণ দুর্যোগের শিকারে পরিণত করেন। যতক্ষণ আমি আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল (সা)-এর অনুসরণ করি ততক্ষণ আমার আনুগত্য মেনে চলবে আর আমি যদি আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল (সা)-এর নাফরমানী করি তবে আমার আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়।"

বক্তৃতা দু'টির প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করুন। অতঃপর বর্তমান যুগের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করুন—ইসলামের যথার্থ বাস্তবতা আপনার সামনে দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সাথে সাথে এও জানতে পারবেন ইসলাম তলোয়ারের সাহায্যে নয় বরং ন্যায়ানুগ ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দ্বারাই লোকদেরকে অভিভূত ও আকৃষ্ট করেছিলো। আর এরই ফলে তারা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলো।

মোদ্দা কথা, বিনয় নম্রতা, দয়া ও কোমল ব্যবহার, ন্যায় ও সুবিচার এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার যে নমুনা ইসলাম পেশ করেছিলো এবং খুলাফায়ে রাশেদীন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্নভাবে তার বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়ে যেভাবে দুনিয়ার সামনে পেশ করেছিলেন দুনিয়ার কোন দেশ—তা একনায়কতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক কিংবা গণতন্ত্র শাসিতই হোক অদ্যাবধি তার দ্বিতীয় কোন নজীর পেশ করতে পারেনি। হযরত 'উমর (রা) জনগণকে শাসকদের সমালোচনা করার এমনই সাধারণ অনুমতি ও অবাধ স্বাধীনতা দান করেছিলেন যে, নগণ্য থেকে নগণ্যতম লোকটিও খলীফার সামনে তাঁকে সমালোচনা করতে এতটুকু দ্বিধা ও সংকোচ বোধ করতো না। একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত 'উমর (রা)-কে লক্ষ্য করে اتق الله يا عمر।—"হে 'উমর! আল্লাহ্‌কে ভয় করো" বললে উপস্থিত লোকেরা লোকটিকে বাধা দিতে চেষ্টা পায়। হযরত উমর (রা) বললেন: "লোকটিকে তোমরা বাধা দিও না। ওকে বলতে দাও।" আর এ অধিকার ও স্বাধীনতা শুধু পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। একবার হযরত 'উমর (রা) মেয়েদের দেনমোহর সম্পর্কে বক্তৃতা করছিলেন। এমনি মুহূর্তে জনৈকা মহিলা সমাবেশের মাঝ থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বললো: اتق الله يا عمر। "হে উমর! আল্লাহ্‌কে ভয় করো।" বর্তমানে ব্যক্তি স্বাধীনতার যে অর্থ করা হয় মূলত তা সম্পূর্ণ ভুল, বরং ব্যক্তি স্বাধীনতার অর্থ এটাই যে, মানুষ তাদের ন্যায়সংগত অধিকারের দাবীতে স্বাধীন হবে, সংগত ও বৈধ ক্রিয়াকর্মেও স্বাধীন হবে। ইসলামী খিলাফতে সংগত ও অসংগত, বৈধ ও অবৈধতার মাপকাঠি হবে এক মাত্র শরীয়তে মুহাম্মদী (সা)।

প্রকৃতে ব্যাপার এই যে, ব্যক্তি স্বাধীনতা যা কিনা ইসলামী রাষ্ট্রনীতির একটি বৃহত্তর অংশ প্রতিটি ব্যক্তিকে এই অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো যে, তারা রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশ এবং তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। রাষ্ট্রের কল্যাণ তাদেরই কল্যাণ—আর রাষ্ট্রের অকল্যাণ তাদেরই অকল্যাণ। আর এ কারণেই অমুসলিম প্রজারা পর্যন্ত ইসলামী হুকুমতকে আল্লাহর নিয়ামত মনে করতে শুরু করেছিলো। অধিকাংশই তো ইসলামী রাষ্ট্রনীতির সুষম ও ইনসাফমূলক সমাজের বাস্তব রূপ দর্শনে দলে দলে মুসলমানই হয়ে গেল। শেষতক যারা অমুসলিম থেকে গেল তারাও ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী ও সুদৃঢ় অস্তিত্বের স্বার্থেই সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতায় মুসলমানদের প্রতি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো। কাযী আবু ইউসুফ (র) স্বীয় কিতাবুল খারাজ নামক গ্রন্থে এ কথারই স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবে:

فلما راى اهل الذمة وفاء المسلمين لهم وحسن السيرة فيهم صاروا اشداء على عدو المسلمين وعونا المسلمين على اعدائهم فبعث اهل كل مدينة ممن جرى الصلح بينهم وبين المسلمين رجالا من قبلهم يتجسسون الاخبار من الروم وعن ملكهم وما يريدون الخ۔

"যখন যিম্মীরা তাদের প্রতি মুসলমানদের উত্তম আচার-আচরণ ও ওয়াদা পূরণের সত্যতা প্রত্যক্ষ করলো তখন অধিকাংশই মুসলমানদের দুশমনকে নিজেদের দুশমন এবং দুশমনের মুকাবিলায় মুসলমানদের সহযোগী ও সাহায্যকারী হিসাবে নিজেদের দাঁড় করায়। এরপর প্রতিটি জনপদ থেকে প্রতিনিধি দল এসে মুসলিম শক্তির সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে শুরু করে এবং রোমক শক্তির বিরুদ্ধে মুসলিম শক্তির পক্ষে গোয়েন্দাগিরী করতে থাকে।"

অতএব এটা এখন দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার যে, ইসলামের ইনসাফ ও সাম্যের সমাজ, ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক রূপ ও চরিত্রই তাকে দুনিয়া-বিজয়ী ধর্মের মহিমা দান করেছিলো।

খলিফার অধিকার

عن عبادة بن صامت رض قال بايعنا .... وعضوا عليها بالنواجذ اخرجه فى المشكوة.

হযরত 'উবাদা বিন সামিত (রা) বর্ণনা করেন—তিনি বলেন : আমার পছন্দ হোক আর নাই হোক, আমাদের আমীর (নেতা ও রাষ্ট্র পরিচালক) দের নির্দেশ শুনবো ও তাদের আনুগত্য করবো; তাদের রাজ্য-শাসনের ব্যাপারে আমরা বিবাদ করবো না এবং আমরা যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন—কিংবা পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন আমরা সত্যের জন্য উঠে দাঁড়াবো ও সত্য কথা বলবো এবং আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে আমরা নিন্দুক ও ভর্ৎসনাকারীর নিন্দা ও ভর্ৎসনা বাক্যকে ভয় করবো না—এর উপর আমরা রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট বায়'আত নিলাম। (বুখারী); বুখারী হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন—তিনি বলেন : নেতার নির্দেশ শোনা ও সাধ্যমতো তা মেনে চলার এবং মুসলিম জনগণের কল্যাণ কামনায় উপদেশ দেয়ার উপর রসূল (সা)-এর হাতে আমি বায়'আত করলাম।—বুখারীর অন্য এক হাদীছে হযরত 'আবদুল্লাহ্‌ বিন 'উমর (রা) বলেন : রসূল করীম (সা) নেতার নির্দেশ শোনা ও মেনে চলার জন্য প্রতিটি মুসলমানকে নির্দেশ দিয়েছেন—তা সে নির্দেশ তার পছন্দ হোক আর না-ই হোক—যতক্ষণ না নেতা পাপকাজের নির্দেশ দেন। পাপ ও অন্যায় কাজের ক্ষেত্রে নির্দেশ শোনা ও মেনে চলা সংগত নয়। হযরত 'আলী (রা) নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, রসূল (সা) বলেন : আনুগত্য কেবলমাত্র সংগত ও বৈধ কাজের ক্ষেত্রে। হযরত উম্মুল হুসায়ন (রা) বলেন : বিদায় হজ্জের দিন রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে বলতে শুনেছি—'তোমাদের উপর একজন ক্রীতদাসকেও যদি আমীর নিযুক্ত করা হয় এবং সে তোমাদের আল্লাহ্‌ ও তদীয় রসূল (সা)-এর বিধান মুতাবিক পরিচালনা করে তবে তার নির্দেশ মেনে চলবে। খলীফা 'আবদুল মালিকের নিকট হযরত 'আবদুল্লাহ্‌ বিন 'উমর (রা) অনুরূপ শর্তে বায়'আত হয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) আরও বলেছেন : তোমরা ও হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে

রাশেদীনের সুন্নত সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরার ন্যায় এবং এটা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। (মিশকাত);

উদ্ধৃত হাদীছগুলি থেকে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে কতিপয় জিনিষ পাই ঃ

১. ন্যায়বিচারক ও বৈধ ইমামের আনুগত্য জনগণের উপর ফরয আর এ মত সর্বাদীসম্মত।

২. ইমামের আনুগত্য শুধুমাত্র বৈধ কাজের সীমারেখা পর্যন্ত; অন্যায় ও অবৈধ কর্মে ইমামের প্রতি আনুগত্য পোষণ স্পষ্টতই হারাম। আর এ মতও সর্বাদীসম্মত—বরং সেক্ষেত্রে জনগণ 'আমরু বিল মা'রূফ' ও নাহী 'আনিল মুনকার'-এর সার্বজনীন নীতি এবং افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر "অত্যাচারী শাসকের মুকাবিলায় হক্ক-কথা সর্বোত্তম জিহাদ"-এর নীতির আওতায় এসে যায়।

৩. انما الطاعة في المعروف।

অর্থাৎ—"আনুগত্য কেবল বৈধ ও ন্যায়সংগত কাজে—যার অর্থ আল্লাহ্‌র কিতাব, তদীয় রসূলে (সা)-এর সুন্নত এবং এর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে বুঝায়। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ এবং তিনিই একমাত্র হিদায়েতের মালিক ও সকল শক্তির উৎস।"

জাতীয় নিরাপত্তা বিধান শাসকের পক্ষে বাধ্যতামূলক যা জাতির মৌলিক অধিকার

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইসলামী হুকুমতে খলীফার স্থান ও মর্যাদা রাখালসদৃশ। গোটা জাতির হেফাজত ও নিরাপত্তা বিধান করা তার উপর ফরয।

عن معقل بن يسار قال سمعت النبي صلعم يقول ما من
عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة الا لم يجد رائحة
الجنة اخرجه البخاري - وعنه رض قال سمعت رسول
الله صلعم يقول ما من وال يلي رعية من المسلمين
فيموت وهو غاش لهم الا حرم الله عليه الجنة

"হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার (রা) বলেন: আমি রসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি—যে, আল্লাহ্ যদি তার কোন বান্দাকে জনগণের উপর শাসন ও কর্তৃত্বভার অর্পণ করেন—পক্ষান্তরে সে যদি অর্পিত দায়িত্ব সততা ও আন্তরিকতার সাথে পালন না করে তবে সে বেহেশতের গন্ধ পাবে না অর্থাৎ সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। অপর হাদীছে রসূলে করীম (সা) বলেন: কোন শাসকের যদি মুসলমানদের লালন-পালন ও হিফাজতের আমানতরূপ পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করা হয় আর সে যদি উক্ত কর্তব্যরূপ আমানতের খিয়ানত করে এবং এমতাবস্থায় মারা যায় তবে আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতে প্রবেশ হারাম করে দেবেন।"

বর্ণিত হাদীছদ্বয় থেকেও আমাদের উপরিউক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। জনগণের পক্ষে রাখালসদৃশ ইমামের জন্য গোটা জাতির হিফাজত ও নিরাপত্তা বিধান করা সার্বিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের আওতাভুক্ত। ইমাম তথা রাষ্ট্রনায়ক যদি উক্ত কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করেন তবে তিনি ইমামপদবাচ্য হওয়ার অনুপযুক্ত প্রমাণিত হবেন। আর হিফাজত দু'প্রকার: ১. আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বাহিঃশক্তিগুলির হিংস্র লোলুপতা ও অন্যায় হস্তক্ষেপের হাত থেকে নিরাপত্তা। 'আল্লামা মুহাক্কিক তদীয় গ্রন্থ মুহাযিরাতে বলেন:

ونريد بالمدينة مجموع النظام الذى اتبعوه فى احوالهم الاجتماعية سواء فى ادارة امرهم الداخلية او فى حروبهم.

অর্থাৎ 'রাষ্ট্রকে আমরা এই অর্থে গ্রহণ করবো যে, এটা একটি সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা—রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ সামাজিক বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে যার অনুসরণ করে থাকে-চাই কি তা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রদানেই হোক অথবা বাহিঃশক্তির হামলার ক্ষেত্রেই হোক।'

শুধু দু'টি ক্ষেত্রেই নয় বরং খিলাফতের সমগ্র বিষয়ে ও ক্ষেত্রেই শর'য়ী বিধানের অনুসরণ এবং তার প্রচলন শাসকের উপর ফরয। খলীফা আইনের স্রষ্টা নন; তিনি আইনের প্রচলন ও প্রয়োগকারী। আমি বারবার বলেছি

আরও বলছি—পরিষ্কার ভাষায় বলছি—যারা মহল বিশেষে ও সাধারণভাবে জনগণের মাঝে এই ধারণা বিস্তারলাভ করাতে চেষ্টিত যে, ইসলামে রাষ্ট্রনীতি নেই তারা সুস্পষ্টভাবে ইলহাদ ও কুফরী চিন্তাধারায় নিমগ্ন ও বিভ্রান্ত। আমি আল্লাহর কাছে এদের থেকে আশ্রয় চাই। 'আল্লামা ইবনে খলদুন বলেন: 'অতঃপর তোমরা জেনে রেখ, রাষ্ট্রীয় নির্ধারিত বেতন (ওজীফা) ও কার্যাবলী ইসলামী শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত ও খিলাফতের অন্তর্গত। খিলাফতের বিভিন্ন দায়িত্ব ও পদ দীন ও দুনিয়া উভয়কেই বেষ্টন করে আছে—এর উল্লেখ যেমন আমরা পূর্বেও করেছি; শরীয়তের বিধানবলীও এ সকল বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কশীল, বিদ্যমান—খিলাফতের প্রত্যেকটি দিকের সাথে। কারণ শরীয়তের বিধান সাধারণভাবে সকল মানুষের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ'।

ফকীহ্ লক্ষ্য রাখবেন রাষ্ট্রপতির প্রতি,—রাষ্ট্রপতির সম্মান ও মর্যাদার প্রতি, শরীয়তের বিধান প্রতিপালনের আবশ্যকতার প্রতি,—লক্ষ্য রাখবেন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। খিলাফতের প্রতি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের এটাই প্রকৃত অর্থ, অথবা খিলাফতের পরিবর্তে এটাই মন্ত্রিত্বের সঠিক অর্থ বহন করবে।

ফকীহ্ যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রধান :

আইন-কানুন ও বিধানাবলী, সহায়-সম্পদ এবং যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী শর্ত সাপেক্ষে অথবা বিনা শর্তে, পদচ্যুতির কার্যকারণ, যদি সেগুলি সামনে আসে ইত্যাদি—যেগুলি রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বের মধ্যে শামিল। এছাড়াও মন্ত্রিত্ব, সংহতি রক্ষা কর আদায় এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিত্বও এর মধ্যে শামিল।

স্বরাষ্ট্র বিভাগের মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

'আদল' বা ন্যায়বিচার ইসলামী রাষ্ট্রনীতির প্রাণসত্তাস্বরূপ। মানব জীবনের এমন একটি দিকও নেই যা ন্যায়বিচারের সাথে সম্পর্কিত নয়।

'আদল বা ন্যায়বিচারের ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রথম দিকে কিছু করা হয়েছে। হযরত 'আল্লামা আলূসী (রা) বলেন:

هو ما تضمنه القرآن واشتملت عليه شريعة الاسلام

অর্থাৎ 'ন্যায়বিচার তাই যে কুরআনুল করীমে বিধৃত এবং ইসলামী শরীয়তনির্ভর।" মোদ্দা কথা, আল্লাহ্র বান্দাদের ভেতর ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করা খলীফার জন্য ফরয। যেহেতু শুধুমাত্র খলীফার পক্ষে রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর জনগণের ভেতর ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নয় সেহেতু খলীফার পক্ষে প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে গোটা দেশটাকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করা প্রয়োজন এবং প্রত্যেক প্রদেশে একজন গভর্নর বা শাসনকর্তা নিয়োগ করা দরকার। অতঃপর প্রত্যেকটি প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় ভাগ করবেন এবং জেলাগুলিতে স্বয়ং অথবা প্রাদেশিক শাসনকর্তার মাধ্যমে একজন কালেক্টর নিযুক্ত করবেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেকটি জেলা কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত করবেন এবং প্রতিটি পরগণায় একজন 'আরিফ নিযুক্ত করবেন। অতঃপর দ্বিতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে প্রতিটি স্থানে সুবিধা ও প্রয়োজন মাফিক পুলিশ ফাঁড়ি কিংবা থানা স্থাপন করবেন এবং তহশীল অফিস স্থাপন করবেন। আদালত কায়েম করবেন এবং কাযীও নিযুক্ত করবেন। কাযীদের সাহায্য ও সহযোগিতা দানের উদ্দেশ্যে একটি 'দারুল ইফতা' কায়েম করবেন। একজন 'কাযীউল কুযাত' (চীফ জাস্টিস)ও নিযুক্ত করবেন। খলীফা প্রশাসনে নিযুক্ত কর্মচারী ও জনগণের তদারকীর উদ্দেশ্যে একটি দারুল ইহতিসাব (গোয়েন্দা ও তদন্ত বিভাগ) কায়েম করবেন। তিনি সেক্রেটারী নিযুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সামগ্রিক ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে রিপোর্ট সংগ্রহ করবেন। অসুস্থ ও রোগীদের জন্য হাসপাতাল, মেহমানদের জন্য মেহমানখানা (গেস্ট হাউজ) এবং দুর্বল, বৃদ্ধ, নিঃসহায় ও দুঃস্থ লোকদের নিমিত্তে লঙ্গরখানা কায়েম করবেন। খাজনা-ট্যাক্স ন্যায়নীতি ও ইনসাফের ভিত্তিতে আদায় ও বন্টনের ব্যবস্থা আঞ্জাম দেবেন। এর প্রত্যেকটি বিষয়েই আল্লাহ্র কিতাব, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন ও কর্মনীতিতে প্রমাণ মিলবে। ইসলামের ফকীহগণই (ধর্মবিশেষজ্ঞ) ফিকাহ্র

কিতাবসমূহে এতদ্‌সম্পর্কে বিস্তারিত আইন প্রণয়ন করেছেন। আমাকে যেহেতু এর খসড়া তুলে ধরতে হবে বিধায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবেই এর গুরুত্বপূর্ণ দিক ও বিষয়াদি আলোচনা করবো।

প্রথম বিষয়

রাষ্ট্র ও তার কর্মনীতি বিভিন্ন ভাগে বিভক্তকরণ

স্বয়ং হুযূর আকরাম (সা) একাজ শুরু করে যান। মক্কায় 'উত্তাব বিন উসায়দ, তায়েফে 'উসমান বিন 'আস, সান'আয় মুহাজির বিন আবী উমাইয়া; হাদরামাউতে যিয়াদ বিন আবী উমাইয়া এবং বাহরায়নে 'আলা ইবনুল হাদরামী (রা)-কে শাসনকর্তা করে পাঠানোর ঘটনা হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ইয়ামনে হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা)-কে তহশীলদার এবং হযরত 'আলী (রা)-কে কাযী নিযুক্ত করে পাঠানো হাদীছ গ্রন্থসমূহে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। 'আল্লামা হাফিজ ইবনুল কাইয়িম 'যাদুল মা'আদ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

فصل فى امرائه صلى الله عليه وسلم منهم باذان بن ساسا .... وولى الصدقات جماعة كثيرة الخ -

হাফিজ ইবনুল কাইয়িম রসূলুল্লাহ্ (সা) নিযুক্ত শাসনকর্তাদের তালিকা পেশ করতে গিয়ে এতদসম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সা) নিযুক্ত শাসনকর্তাদের মধ্যে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নিযুক্ত ইয়ামনের শাসনকর্তা বাযান বিন সাসান যিনি বাহরাম গোরের বংশধর—অন্যতম ছিলেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর তিনি আজমবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন এবং রসূল (সা) কর্তৃক ইসলামী সাম্রাজ্যে তাকে শাসনকর্তা হিসাবে স্বপদে বহাল থাকেন। এরপর তদীয় পুত্র শহর বিন বাযান শাসনভার লাভ করেন। শহর নিহত হওয়ার পর সান'আয় খালিদ বিন সা'ঈদ বিন 'আসকে, মুহাজির বিন আবী উমাইয়াকে কিন্দা ও সদফে শাসনভার অর্পণ করেন। অতঃপর রসূল (সা) ইন্তেকাল করেন।

রসূল (সা) যিয়াদ বিন উমাইয়াকে হাদরামাউতে, আবূ মূসা আশ'আরীকে যুবায়েদ এডেন, যুমা ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায়, মু'আয বিন জাবালকে জুন্দ, আবূ সুফিয়ানকে নাজরান ও তৎপুত্র ইয়াযীদকে তায়মা, 'উত্তাব বিন উসায়দকে ৮ম বৎসরে মক্কায় মুসলিম হাজীদের হজ্জ মৌসুমে সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বসহ, হযরত 'আলীকে তহশীলদার ও কাযী হিসাবে এবং 'আমর বিন 'আ'সকে 'আম্মানের শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্তি প্রদান করেন। এছাড়া সাদাকা ও যাকাত আদায় করবার জন্যও বহু কর্মচারী নিয়োগ করছিলেন।

হাফিজ ইবনুল কাইয়িম লিখিত তথ্য থেকে জানা গেলো যে, হযরত রসূল করীম (সা) বিজিত ও অধিকৃত এলাকাসমূহকে কতিপয় ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটিতে এক একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কয়েকটি স্থানে শাসনকর্তা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সাথে বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করতেন। কতক ক্ষেত্রে শাসনকর্তা ও কাযী পৃথক পৃথক ব্যক্তি হতেন। কিন্তু যাকাত ও সাদাকাহ্ উসূল করবার জন্য সব সময় পৃথক ব্যক্তি হতেন যাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) নির্বাচিত করে পাঠাতেন। উল্লিখিত তথ্যাদির সার-সংক্ষেপ এটাই যে, রাষ্ট্রীয় বিভাগ এবং এর কর্ম বিভাগ এর জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল উদাহরণ আমরা হুযূর আকরাম (সা)-এর বাস্তব জীবনচিত্রেই পাই। অন্যত্র এর সন্ধান করতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক তাবারী লিখেন যে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালীন সময়ে যখন সমস্ত আরব ভূখণ্ড ইসলামী শাসনাধীনে আসে তখন সমগ্র সাম্রাজ্যকে তিনি কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। মদীনা, মক্কা, তায়েফ, সান'আ, নাজরান, হাদরামাউত, বাহরায়ন, দূমাতুল জন্দল প্রভৃতি সে সময় স্বতন্ত্র প্রদেশভূমি ছিলো। প্রতিটি প্রদেশে একজন করে গভর্নর নিযুক্ত হতেন যিনি সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন। হযরত 'উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে ব্যাপক বিজয়ের ফলে নতুন নতুন এলাকা ইসলামী খিলাফতের অধীনে আসে এবং সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। যেমন - সিরিয়া, জযীরা, বসরা, কূফা, মিসর, ফিলিস্তীন, পারস্য, খূজিস্তান, কিরমান ইত্যাদি সে সময়েই অধিকৃত হয়। 'আল্লামা শিবলী নো'মানী সুবিখ্যাত

'আলফারূক' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন—১৫ হিজরীতে হযরত 'উমর (রা) যখন ফিলিস্তীনে গিয়ে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন তখন তিনি উক্ত প্রদেশ দু'ভাগে বিভক্ত করেন। এক অংশের রাজধানী ইলিয়া এবং অপর অংশের রাজধানী রমলায় স্থাপন করেন। অতঃপর 'আলকামা ইবনে হাকীম এবং 'আলকামা বিন মুজাজ'কে যথাক্রমে দু'প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন। একইরূপে মিসরকেও দু'ভাগে বিভক্ত করেন। উঁচু অংশকে আরবী ভাষায় 'সা'ঈদ' বলা হয়। এই অংশের ২৮টি জেলাসহ একটি প্রদেশে পরিণত করে আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবী সারাহ্কে তথাকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। নিচু এলাকার ১৫ টি জেলা নিয়ে গঠিত অপর প্রদেশটির শাসনভার অন্য একজনের উপর ন্যস্ত করেন এবং হযরত 'আমর বিন 'আস (রা)-কে প্রদেশ দু'টির গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করেন। পারস্য ও তৎসন্নিহিত এলাকাসমূহে তিনি যেহেতু সম্রাট নওশেরওয়াঁ প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখেন সেহেতু এতটুকুই বলা যথেষ্ট হবে যে, সম্রাট নওশেরওয়াঁর রাজত্বকালে সমগ্র রাজ্যটি কত ভাগে বিভক্ত ছিলো। ঐতিহাসিক য়া'কুবী বর্ণনা করেন—সম্রাট নওশেরওয়াঁর গোটা রাজ্য ইরাক ব্যতীত তিনটি বৃহৎ প্রদেশে বিভক্ত ছিলো :

১. খোরাসান—, যার মধ্যে নিম্নোক্ত জেলাগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিলো —যথা : নিশাপুর, হিরাত মার্ভ, মার্ভরূ, ফারিয়াব, তালিকান, বল্খ, বোখারা, বাজেঈস, বাদর্দ, গিরীস্তান, তুস, সারাখ্স ও জুর্জান।

২. আযারবায়জান—নিম্নোক্ত জেলাগুলি এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো : তাবারিস্তান, রে, কুযভীন, জনজান, কোম, ইস্পাহান, নেহাওন্দ, দিনুর, হুলওয়ান, মাসিন্দান, মেহেরবান, আজাক, শহরজোর, সামিগান ও আযারবায়জান।

৩. পারস্য—যার মধ্যে নিম্নলিখিত জেলাগুলি অন্তর্ভুক্ত :—আস্তাখার, শীরায, নওবন্দজান, জওর, কাজরুন, ফসাদ, দারুল বাহ্রে, আরদেশীর, খার্রা, সাবুর, আহওয়ায, জুন্দি, সাবুর, সুস, নহরে তিরি, মুনাজির, তিস্তার, আয়জাহ্ ও মেহেরবান। আরব ভূগোলবেত্তারা প্রদেশকে

'এবলীম' এবং হেলাকে 'কোরা' বলেন। *

দীর্ঘ আলোচনা ও এতদ্সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণাদি পেশের পর এটা এখন পরিষ্কার যে, রাষ্ট্রীয় বিভাগ এবং তার কর্ম বিভাগের উপর বাস্তব কাজ স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সা)-ই শুরু করে যান। খুলাফায়ে রাশেদীন এবং পরবর্তী অন্যান্য খলীফাগণ সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সাথে সাথে এরও উন্নতি বিধান করেন। এতে তারা সুন্নতে রসূল (সা)-এর অনুসরণ ব্যতিরেকে নিজ থেকে কিছু করেন নি। সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সাথে প্রাদেশিক গভর্নরের হাতে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি ন্যস্ত হতো।

অতঃপর প্রতিটি প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করা এবং প্রতি জেলার একজন শাসনকর্তা নিয়োগ—যাকে আজকের পরিভাষায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট—কখনও ডেপুটি কমিশনার বলা হয়- ;অতঃপর জেলাগুলিকে পরগনায় বিভক্তকরণ-এবং পরগনা প্রতি একজন ,আমীক নিযুক্তকরণ প্রয়োজনানুপাতে কাযী নিয়োগ, পুলিশ স্টেশন ও পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন, অফিস ও বিভিন্ন দফতর স্থাপন ইত্যাদি সবগুলির নজীর হুযুরে আকরাম (সা)-এর জীবনাদর্শে পাওয়া যায়। সাধারণভাবে খুলাফায়ে রাশেদীন - বিশেষ করে হযরত 'উমর ফারূক (রা)-এর যে বাস্তব প্রদর্শনী পেশ করেছিলেন—কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল শাসকের পক্ষে উল্লিখিত মহাত্মাদের অনুসরণ ব্যতীত উপায় নেই। "আল-ফারূক" গ্রন্থে এটাও বর্ণিত যে, প্রদেশগুলিতে নিম্নোক্ত বড় বড় পদাধিকারী ব্যক্তি ছিলেন ঃ

ওয়ালী ঃ গভর্নর বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা;
কাতিব ঃ সেক্রেটারী কিংবা চীফ সেক্রেটারী;
কাতিবে দিওয়ান ঃ সৈন্য ও দেশরক্ষা বিভাগের চীফ সেক্রেটারী;

---

* (নোট ঃ অতঃপর গ্রন্থকার ঐতিহাসিক কুদামা ইবনে জা'ফর এবং 'আল্লামা ইবনে খালদুন প্রদত্ত আব্বাসী সাম্রাজ্যের ৪১ টি প্রদেশের একটি তালিকা এবং সেই সাথে প্রদেশগুলি থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটি খসড়া চিত্র পেশ করেছেন। স্মর্তব্য যে, প্রদত্ত তালিকা ও খসড়া চিত্রটি সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্যের নয় বরং তা শুধুই আব্বাসী সাম্রাজ্যের। আমরা এখানে উক্ত তালিকা ও খসড়া চিত্র পেশ করা থেকে বিরত রইলাম। অনুবাদক—।)

সাহিবুল খীরাজ : কালেক্টর;
সাহিবুল ইহ্‌দাছ : ইনস্পেক্টর অব পুলিশ বা পুলিশ সুপার;
কাযীয়ে সদরুসসদুর ও মুনসিফ : প্রধান বিচারপতি ও বিচারক;
অতএব এরই ফলশ্রুতিতে কুফায় শাসনকর্তা ছিলেন হযরত 'আম্মার বিন য়াসির, হযরত 'উসমান বিন হানীফ ছিলেন কালেক্টর, হযরত 'আবদুল্লাহ্ বিন মাস'উদ বায়তুল মালের অধ্যক্ষ, শুরায়হ্ কাযী এবং 'আবদুল্লাহ্ ইবনুল খুজা'য়ী—দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন।

শাসনকর্তা অন্যান্য কর্মচারীদের নিযুক্তি এবং এতদসম্পর্কিত বিভিন্ন মত

প্রদেশ ও জেলাগুলি বিভিন্ন ভাগে ও অংশে ভাগ করবার পর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তির নির্বাচন এবং তাদের কর্মনীতির তালিকা প্রণয়ন। কোন শাসক যতই সজাগ স্থির মস্তিষ্ক এবং মেধার অধিকারী হন না কেন এবং কোন আইন যতই নিখুঁত ও পূর্ণাংগ হোক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত হুকুমতের অংগ-প্রত্যঙ্গাদি অর্থাৎ এর কর্মচারীবৃন্দ যোগ্য, দক্ষ, সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্মভীরু না হবে এবং তাদের থেকে যদি তীক্ষ্ম ও সজাগ মেধার সাথে কাজ করিয়ে নেওয়া না যায়—তাহলে রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ সম্ভব নয়।

ইসলাম জীবনের আদিতেই যা কিছু করেছে এবং দুনিয়ার সামনে পেশ দেখিয়েছে—দুনিয়ার অন্য কোথাও এর জুড়ি মেলা ভার। প্রশাসনের বিভিন্ন পদে লোক নির্বাচন মুহূর্তে প্রথমেই প্রয়োজন—নিয়োগকৃত ব্যক্তি যেন তাকওয়া ও পর্যাপ্ত জ্ঞানে গুণান্বিত হন। আল্লাহ্ পাক বলেন :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ -

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাধিক সম্মানিত যিনি সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্‌ভীরু।"

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ "তোমরা বল, যে ব্যক্তি জানে আর যে ব্যক্তি জানে না—এই উভয় ব্যক্তি কি সমান হতে পারে?" আর এ কারণেই হযরত আবুবকর (রা) যখন কোন ব্যক্তিকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করতে চাইতেন তখনই তাঁকে ডেকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিতেন এবং অত্যন্ত প্রভাবপূর্ণ কথায় শান্তি ও নিরাপত্তার এবং আল্লাহ্‌ভীতির উপদেশ দান করতেন। তাঁকে লক্ষ্য করে বলতেন :

اتق الله فى السر و العلانية - فانه من يتق الله يجعل له مخرجا و يخرجه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته و يعظم له اجرا فان تقوى الله خير ما تواصى به عباد الله وفى سبيل الله لا يسعك فيه الا هان والتفريط و الغفلة عما فيه قدام دينكم وعصمة امركم فلا تنى ولا تفتر كذا فى تاريخ الطبرى -

অর্থাৎ "নির্জনে অথবা প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে ভয় করবে। কেননা যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তার সমস্যাকে সহজ করে দেন এবং সমাধানের পথ বাতলে দেন আর এমন অলৌকিক উপায়ে তাকে রিযিক দান করেন যা সে কল্পনাও করতো না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বন করে আল্লাহ্ পাক তার সকল অন্যায় ও পাপ থেকে মুক্তি দেন এবং তাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করা হয়। আল্লাহ্‌র বান্দাদের কল্যাণ সাধন সর্বোত্তম তাক্ওয়া। তোমরা আল্লাহ্‌র এমন একটি রাস্তায় আছো যার মধ্যে কমতি-বাড়তি উভয়টিই আছে। আর তাই অলসতা ও অসতর্কতার সুযোগ নেই। এর মধ্যেই ধর্মের সুদৃঢ় অস্তিত্ব এবং খিলাফতের হিফাজত নিহিত।"

ইমাম আবু ইউসুফ (র) কিতাবুল খারাজ নামক গ্রন্থে কয়েক জায়গায়

শাসনকর্তা ও কর্মচারীদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন :

ان يكون فقيها عالما مشا ورا لاهل الرأى عفيفا لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخاف فى الله لومة لائم .

অর্থাৎ "শাসনকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ফকীহ্ (ধর্মীয় আইন-কানুন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ), জ্ঞানী, প্রবীণ ও অভিজ্ঞ জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শকারী এমন সচ্চরিত্রবান হবেন যাঁর উল্লেখযোগ্য দোষ-ত্রুটি জনগণ অবহিত নয় এবং যিনি আল্লাহ্‌র কাজে নিন্দুকের নিন্দার ভয়ে ভীত নন।" উক্ত কিতাবেই এর উল্লেখও বর্তমান যে, হযরত 'উমর (রা) কর্মচারী এবং অফিসার নিয়োগকালে—এ আদর্শ ও মানদণ্ড বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন যে, তাঁরা হবেন—জ্ঞানী ও ধর্মতত্ত্ববিদ। একবার এক প্রকাশ্য জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন :

انى اشهد كم امراء الامصار انى لم ابعثهم الا ليتفقهوا الناس فى الدين .

অর্থাৎ "আমি আমার কর্মচারীদের সম্পর্কে তোমাদের সাক্ষী মানছি। আমি তাদেরকে এ জন্যেই পাঠাই যেন তারা তোমাদের ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দান করেন। অন্য আরও একবার জনতার সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

انى لم ابعث عمالى ليضربوا ابشاركم ولا ليأخذوا اموالكم فمن فعل به ذالك فليرفعه الى اقصه منه قال عمرو بن العاص لو ان رجلا ادب بعض رعيته اتقصه منه قال اى والذى نفسى بيده اقصه وقد رأيت رسول الله اقص من نفسه . اخرجه ابوداؤد فى كتاب الديات .

"আমি আমার কর্মচারীদের এ জন্য পাঠাই না যে, তারা তোমাদের লোকদেরকে মারবে কিংবা তোমাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেবে। যে ব্যক্তি এরূপ করবে আমি অবশ্যই তার থেকে বদলা গ্রহণ করবো। এরূপ ক্ষেত্রে অবশ্যই আমার সামনে মামলা দায়ের করতে হবে। এতে হযরত

'আমর বিন 'আস (রা) প্রশ্ন করেনঃ যদি কোন কর্মচারী নাগরিকদের ভদ্রতা ও সৌজন্য শেখাবার জন্য কাউকে শাস্তি দিয়ে থাকেন তবে সে ক্ষেত্রেও কি বদলা নেওয়া হবে? হযরত 'উমর (রা) উত্তর দেনঃ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে 'উমরের জীবন! নিশ্চয়ই আমি বদলা নেব! কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুরূপ বদলার কারণে নিজেকে পেশ করতে আমি দেখেছি।"

উল্লিখিত দলীল-প্রমাণের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য একটাই আর তা হলোঃ

১. শাসনকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগকালে তাদের জ্ঞান, ধর্মীয় তত্ত্বজ্ঞানে গভীর পাণ্ডিত্য, উপলব্ধি এবং তাক্ওয়ার দিকটি অবশ্যই গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখতে হবে।

২. শাসনকর্তা ও তদীয় কর্মচারীদের প্রতিটি আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপের তদারক করা ইমামের উপর ওয়াজিব।

৩. যদি কোন গভর্নর কিংবা শাসনকর্তা জালিম কিংবা খিয়ানতকারীতে পরিণত হয় তবে তাকে সাথে সাথেই পদচ্যুত করা ফরয এবং তাকে স্বীয় পদে বহাল রাখা হারাম।

দ্বিতীয়ত, এটা খেয়াল রাখা খুবই জরুরী যে, কোন অযোগ্য ও অপদার্থ লোককে কারও সুপারিশে অথবা আত্মীয়তার কারণে প্রশাসনের কোন অংশেই যেন নিয়োগ করা না হয়। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে, একবার হযরত আবূবকর (রা) য়াযীদ বিন আবূ সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ

يا يزيدا ان لك قرابة عسى ان توترهم بالامارة وذا لك اكبر ما اخاف عليك فان رسول الله ص قال من ولى بامر المسلمين شيأ لهم عليهم احدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا حتى يدخله جهنم -

"হে য়াযীদ! বহু লোকের সাথেই তুমি আত্মীয়তা সূত্রে জড়িত। আত্মীয়তার কারণে তুমি হয়তো তুমি তোমার শাসনকর্তৃত্বের প্রভাব খাটিয়ে তাদেরকে উপকৃত করতে চাইবে যেটাকে আমি সবচেয়ে বেশী ভয় করি।

জন্য বিপদও সর্বাধিক। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন: কোন ব্যক্তিকে যদি মুসলমানদের উপর শাসক হিসাবে নিয়োগ করা হয় আর সে যদি [illegible] যোগ্যতা ও সংগত কারণ ব্যতিরেকেই কাউকে অনুগৃহীত করবার উদ্দেশে কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করে তবে তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত ও অভিশাপ। আল্লাহ্ পাক তার কোনরূপ ওযর-আপত্তি গ্রহণ ব্যতিরেকেই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।”

জবাবদিহি ও কর্মচারীদের তদারকী প্রসঙ্গে

ইসলাম শাসক ও কর্মচারীদের জন্য বায়তুলমাল থেকে গ্রাসাচ্ছদনের নির্দিষ্ট বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করেছে। এ ছাড়া তোহ্ফা, হাদিয়া, ঘুষ ইত্যাদি শাসকদের জন্যে হারাম করা হয়েছে। রসূলে করীম (সা) বলেন:

قال النبى صلعم من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ
بعد ذالك فهو غلول وقال النبى صلعم من كان لنا عاملا فليكتسب
خادما فان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا وفى رواية
من اتخذ غير ذالك فهو غال او سارق -

অর্থাৎ ‘কাউকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে কোন দায়িত্ব দেওয়া হলে আমি অবশ্যই তাকে গ্রাসাচ্ছদন দেবো। অতিরিক্ত কিংবা এর বাইরে কিছু গ্রহণ করা হলে তা হবে খিয়ানত।” অন্যত্র বলা হয়েছে: “রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নিযুক্ত কর্মচারী বিয়ে করলে—সে খাদেম পাবে—বাসগৃহ না থাকলে বাসগৃহ পাবে।” অন্য রিওয়ায়াতে—“যে এর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করবে সে খিয়ানতকারী ও চোর।”

হাদীসগুলি থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত কর্মচারীদের পক্ষে সরকার প্রদত্ত বেতন-ভাতা ব্যতীত অন্য কোন কিছু গ্রহণ করা হারাম, চাই কি তা হাদিয়াই হোক কিংবা তোহ্ফা। খলীফা যেহেতু উম্মতের রক্ষক সেহেতু কর্মচারীদের তদারকী, জাতীয় নৈতিক জীবন ও রীতি-নীতির হিফাজত করা তার জন্য ফরয। সাধারণভাবে

খুলাফায়ে রাশেদীন—বিশেষ করে হযরত 'উমর ফারূক (রা) এ দায়িত্ব অত্যন্ত সাফল্যের সাথে আঞ্জাম দিতেন। তাবারী এবং কিতাবুল খারাজ নামক গ্রন্থদ্বয়ে বলা হয়েছে: হযরত 'উমর (রা) প্রতিটি কর্মচারীর নিকট থেকেই এই ওয়াদা নিতেন যে, তারা তুর্কী ঘোড়ায় সওয়ার হবে না; সূক্ষ্ম কাপড় পরবে না; মিহি ময়দায় প্রস্তুত রুটি খাবে না এবং দরজায় কখনই দারোয়ান নিযুক্ত করবে না বরং প্রয়োজনীয় ও অভাবী লোকদের জন্যে সর্বদা তা খোলা রাখবে। ফতুহুল বুলদান নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে:

كان عمر بن الخطاب يكتب اموال عماله اذا ولهم ثم يقاسمهم ما زاد على ذالك.

অর্থাৎ হযরত 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) যখনই কোন কর্মচারী নিযুক্ত করতেন তখনই তার ধন-সম্পদের তালিকা তৈরী করতেন এবং তা সংরক্ষণ করতেন। কোন কর্মচারীর আর্থিক অবস্থার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করলেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার অর্ধেক সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতেন এবং তা বায়তুলমালে জমা নিতেন। কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সময়ে ও অসময়ে যে সব অভিযোগ আসতো তার তদন্তের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ স্থাপন করেছিলেন এবং রসূল (সা)-এর সাহাবী মুহাম্মদ বিন মাসলামা আনসারী (রা)-কে এ বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। কানযুল 'উম্মাল নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা) কুফায় একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এতে একটি প্রকাণ্ড দেউড়ীও ছিল। হযরত 'উমর (রা) এটাকে প্রার্থী ও অভাবী লোকদের প্রতিবন্ধক বিবেচনা করে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা)-কে গিয়ে দেওড়ীতে আগুন লাগাবার আদেশ দেন। সাথে সাথে এই নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়। হযরত সা'দ (রা) নীরবেই এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। কিতাবুল খারাজে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত আয়ায বিন গানাম (রা) যিনি মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন—তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ পাওয়া গেল যে, তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন এবং তাঁর দরজায় দ্বারবান নিযুক্ত করা হয়েছে। হযরত 'উমর (রা) তখনই মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা)-কে বিষয়টি তদন্ত করে দেখার

নির্দেশ দেন এবং বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত হলে তাঁকে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে ঐ অবস্থায়ই মদীনায় হাযির করার আদেশ জারী করেন। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা) মিসরে উপস্থিত হয়ে ঘটনার সত্যতা লক্ষ্য করে আয়ায বিন গানাম (রা)-কে যে অবস্থায় পান—সেই অবস্থায়ই মদীনায় নিয়ে উপস্থিত হন। হযরত 'উমর (রা) তাঁর শরীর থেকে সূক্ষ্ম পোশাক নামিয়ে মোটা পশমের তৈরী জামা পরিয়ে জঙ্গলে গিয়ে বকরী চরাবার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ অমান্য করার শক্তি তাঁর ছিলো না। বিধায় তিনি বারবার আক্ষেপের সুরে বলতে থাকেন: এর থেকে মরে যাওয়াও ভাল ছিলো! হযরত 'উমর (রা) বলেন: এতে লজ্জার কি আছে! এটাই তো তোমার পৈতৃক পেশা। এরপর হযরত আয়ায অন্তর থেকেই তওবা করেন এবং যতদিন জীবিত ছিলেন—চমৎকার সুষ্ঠুতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কখনও কতিপয় ব্যক্তির সমন্বয়ে কমিশন গঠন করে তদন্তের জন্য পাঠানো হতো। এর বিভিন্ন নজীর ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থসমূহের পাতায় বিদ্যমান। ইমাম আবু ইউসুফ (র) কিতাবুল খারাজে তদন্ত কমিশন গঠনের উপর জোর দিতে গিয়ে লিখেছেন:

وأرى مع هذا ان يبعث الامام قوما من اهل الصلاح والعفاف ممن يوثق بدينه وامانته يسألون عن سيرة العمال وما عملوا به البلاد.

অর্থাৎ ইমাম সৎ চরিত্রবান একদল লোক পাঠাবেন যাদের আমানত ও দীনদারীর উপর নির্ভর করা যায়—যারা কর্মচারীদের চরিত্র, ব্যবহার ও কার্যকলাপ সম্পর্কে লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করবে।

বিচার বিভাগ সম্পর্কে

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। এর সম্পর্ক পার্থিব ও ধর্মীয় সার্বিক বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত। ইসলামের ফকীহ (ধর্মতত্ত্ববিদগণ এ সম্পর্কে শত সহস্র পাতা লিখে গেছেন। হাদীছ গ্রন্থগুলির পাতাও এ

সম্পর্কে ভরপুর। এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত খসড়া পেশ করাকেই আমরা যথেষ্ট মনে করছি।

ইসলামে বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা নবুওতের যুগেই শুরু হয়েছিলো এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত 'আলী (রা)-কে য়ামনে কাযী নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল এবং মুস্তাদরাক প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থগুলিতে হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

قال بعثنى رسول الله ص الى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلنى وانا حديث السن ولا علم لى بالقضاء فقال ان الله سيهدى قلبك ويثبت لسانك فاذا جلسا بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الاخر كما من الاول فانه احرى بك ان يتبين لك القضاء الحديث -

"হযরত 'আলী (রা) বলেন : আমাকে রসূলুল্লাহ্ (সা) য়ামনে কাযী নিযুক্ত করে পাঠাবার প্রাক্কালে আমি আরজ করলাম : হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি এমন একজন অল্পবয়স্ক তরুণকে কাযী নিযুক্ত করছেন —যার এ সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই নেই। রসূলে করীম (সা) বললেন: আল্লাহ্ তোমাকে হেদায়েত দান করুন এবং তোমার যবানকে সংযত ও সংহত করুন। যখনই তোমার সামনে বাদী ও বিবাদীকে হাযির করা হবে —দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত প্রথম পক্ষের বক্তব্যের উপর কখনই রায় দেবে না। কেননা দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য তোমাকে মামলার প্রকৃতি উপলব্ধিতে ও সঠিক রায় দানে সাহায্য করবে।"

কাযী নির্বাচনের অধিকার সব সময়ই খলীফার জন্য সংরক্ষিত এবং এমন গভর্নরের যিনি কাযী নিযুক্তির ব্যাপারে খলীফার অনুমতি পেরেছেন।[১] কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এবং কাযী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের দীনদারী ও তাকওয়ার মানদণ্ড বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী। তিবরানী নামক হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে 'আব্বাস

(রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

قال رسول الله ص من تولى من امر المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم ان فيهم من هو اولى بذا لك واعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين۔

"রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যদি কোন ব্যক্তির উপর মুসলমানদের কোন বিষয়ে দায়িত্ব ও শাসনভার অর্পণ করা হয় আর উক্ত ব্যক্তি যদি কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে এমন কোন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে যার চেয়ে যোগ্য ও শ্রেষ্ঠতর লোক এবং একই সাথে কুরআনুল করীম এবং তদীয় রসূল (সা)-এর সুন্নাহ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী বিদ্যমান থাকে তবে সে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল (সা) এবং মুসলিম সমাজের সাধারণ স্বার্থের সাথে খিয়ানত করলো।"

বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা যাতে রক্ষিত হয় এবং বিচার যেন সহজ-লভ্য হয় ও ন্যায় বিচারের সুফল যেন সাধারণ গণ-মানুষের দরজায় পেঁছে যায় তজ্জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তা বাস্তবায়িত করা একান্ত আবশ্যক।

শর্ত : ১

বিচারকের নিকট পেঁছুতে কোন রকমের কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা যেন না থাকে, বিচারকের দরজায় কোন দ্বাররক্ষক যেন না থাকে, মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করতে কোন প্রকার ফিস কিংবা স্ট্যাম্প ইত্যাদির প্রয়োজন যেন না পড়ে। কেননা এতে মজলুম ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকের পক্ষে আদালতের দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং এরই ফলে জালিমের জুলুম সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে উপমহাদেশের বিভিন্ন শহরে ও প্রান্তে অবস্থিত আদালতগুলি ন্যায় বিচারের নামে আসলে সরকারী আয়ের স্থায়ী একটি উল্লেখযোগ্য উৎস বটে। আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করছি গরীব, নিঃস্ব অসহায় ও দুর্বল

টীকা : ১. ফতহুল কাদীর দ্র.।

শ্রেণীর লোক মজলুম হওয়া সত্ত্বেও মামলা-মোকদ্দমার নামে আদালতের দরজা মাড়াতে ভয় পায়। আদালতের দরজা এদের জন্য বন্ধ। এদিকে জালিম ও শোষকের দল চাকতির বদৌলতে মিথ্যা মোকদ্দমা ঝুলিয়ে গরীব অসহায় ও দুর্বল লোকগুলিকে নিয়তই গ্রাস করে চলেছে। মেজর বসু স্বীয় পুস্তকের ৫ম খণ্ডে 'আদালতের মাধ্যমে অত্যাচার' সম্পর্কে জজ মিঃ ক্যাম্বেল-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। মিঃ ক্যাম্বেল বলেন: ন্যায় বিচারের স্বার্থে যে আদালত কায়েম করা হয়েছিলো সেখানে যেতে ইচ্ছা ও মর্জি'ই যথেষ্ট নয় বরং টাকা-পয়সারও প্রয়োজন হয়। আর সেটাও উকীলদের দেয়া হয় না বরং সরকারকেই দেওয়া হয়। এর অর্থ এই যে, জনগণের যে অংশ বিচার পেতে প্রয়োজনীয় ট্যাক্স দিতে অক্ষম ও অসমর্থ আদালতের দরজা তাদের জন্য বন্ধ। যাদের টাকা আছে তারা এরই সাহায্যে আদালতে প্রবেশের ছাড়পত্র পায়। বিনিময়ে ঐ সমস্ত লোকেরা যা পায় তাতে বৃটিশ গভর্নমেন্টের অবমাননা ও বদনামই হয় মাত্র।

মোটকথা, ইসলাম গরীব, দুর্বল ও মজলুম শ্রেণীর সামনে আদালতের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো। মোকদ্দমা রুজুকারীর নিকট থেকে স্ট্যাম্প খরচ কিংবা অন্য কোন প্রকার ফিস আদায় করাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছিলো। শুধু তাই নয়—বিচারকের দরজায় দ্বাররক্ষক মোতায়েন করাকেও ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। হুযুর (সা) বলেন:

قال النبى ص من ولاه الله عزوجل شيئا من امر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله تعالى عنه دون حاجته وخلته وفقره الحديث.

অর্থাৎ "আল্লাহ্ পাক তার কোন বান্দাকে যদি মুসলমানদের কোন বিষয়ে শাসন ও দায়িত্বভার অর্পণ করেন, অতঃপর সে ব্যক্তি যদি অভাবী ও দরিদ্র জনগণের প্রয়োজন পূরণ ও অভাব মোচনের দায়িত্ব পালন না করে তবে আল্লাহ্পাকও সে ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণ ও অভাব মোচন থেকে বিরত থাকবেন।"—আবু দাউদ

শর্ত : ২

বাদী-বিবাদী উভয়ের সাথে ছোট-বড় প্রত্যেকটি বিষয়ে সামনে ব্যবহার করতে হবে।

قال فى الدر المختار ويقضى فى المسجد اوفى دار
يأذن عموما ويرد هديته ودعوة خاصة ويسوى وجوبا
بين الخصمين جلوسا واقبالا واشارة ونظرا - ويمتنع من
مسارة احدهما والاشارة اليه ورفع صوته عليه والضحك
فى وجهه وكذا القيام له ولا يمزح فى المجلس الحكم
مطلقا ولا يلقن الشاهد شهادته ولا يكلم احد الخصمين
بلسان لا يعرفه الاخر -

অর্থাৎ ১. কাযী মসজিদ কিংবা এমন কোন জায়গায় বসে বিচার করবেন যেখানে প্রবেশ করা সবার জন্য সহজ হয়; ২. তিনি কোন হাদিয়া কবুল করবেন না; ৩. বিশেষ উদ্দেশ্যে কিংবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে আয়োজিত কোন দাওয়াত কবুল করবেন না; ৪. বাদী-বিবাদী বসাবার, মনোযোগ দেবার, ইশারা কিংবা সংকেত অথবা দৃষ্টিদানের ক্ষেত্রে সাম্য বজায় রাখা ওয়াজিব; ৫. কোন বিশেষ পক্ষের সাথে গোপন আলাপ, উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা কিংবা তাদের জন্য দাঁড়ানো অথবা তাদের দাওয়াত করা স্পষ্টতই হারাম; ৬. বিচার সভায় ঠাট্টা-মস্করা কিংবা টীকা-টিপ্পনী কাটা পরিষ্কার নাজায়েয; ৭. প্রমাণপঞ্জী সম্পর্কে কাউকে শেখানো অথবা সাক্ষীকে কিছু বলে দেওয়া নাজায়েয; এবং ৮. কোন পক্ষ থেকে এমন কথাবার্তা বলা যা অন্য পক্ষ বোঝে না—সম্পূর্ণ নাজায়েয।

শর্ত : ৩

১. প্রমাণ উপস্থিত করার দায়িত্ব বাদীর; ২. যদি সে প্রমাণ উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয় তবে বিবাদীর নিকট থেকে শপথ গ্রহণ করা হবে। বুখারী শরীফের 'বন্ধক' প্রসঙ্গে আশ'আছ বিন কায়েস (রা)-এর হাদীস এবং মুসলিম শরীফের 'ঈমান' অধ্যায় দ্র.।

وقال النبى ص البينة على المدعى واليمين على من انكر
اخرجه البيهقى والدارقطنى.

অর্থাৎ 'নবী করীম (সা) বলেন : বাদীকে প্রমাণ পেশ করতে হবে এবং অস্বীকারকারীর (বিবাদী) উপর শপথ করা বাধ্যতামূলক।' বায়হাকী ও দারকুৎনী; ৩. বাদী-বিবাদী সর্বাবস্থায় সন্ধি করতে পারে কিন্তু শরীয়ত বিরোধী কোন বিষয়ে নয়; ৪. কাযী নিজ মর্জি মুতাবিক ফয়সালা করবার পর পুনরায় তা বিচার-বিবেচনা করে দেখতে পারেন; ৫. মোকদ্দমা পেশের একটি নির্দিষ্ট দিন ও তারিখ থাকা ভাল; ৬. যদি বিবাদী নির্দিষ্ট দিনে হাযির হতে ব্যর্থ হয় তবে মোকদ্দমায় তার বিরুদ্ধে ফয়সালা দেয়া হবে। এ সম্পর্কে আরও বহু কথা আছে যা পরে আরয করবার আশা রইলো। ৭. মুসলমান মাত্রেই সাক্ষ্য দানের উপযুক্ত যদি না সে সাজাপ্রাপ্ত হয় কিংবা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দানের অন্য কোন প্রমাণ মেলে।

শর্ত : ৪

১. প্রত্যেক মোকদ্দমার আপীল জজ অর্থাৎ জেলা বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি, এরপর যথাক্রমে কাযীউল কুযাত বা চীফ জাস্টিস, এরপর গভর্নর, সুলতান বা গভর্নর জেনারেল থেকে শুধু করে খলীফা পর্যন্ত করা যায়।

২. যে বিচারকের নিকট আপীল করা হয়েছে—মযহাবী মতভেদের কারণে তিনি প্রথম ফয়সালাকে রদ কিংবা বাতিল করতে পারেন না। যেমন মনে করুন,- মুনসিফ কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট শাফেয়ী মযহাবের অনুসারী তিনি নিজ মজহাব মাফিক ফয়সালা করেছেন, এরপর জজের নিকট কিংবা হাইকোর্টে কোন একপক্ষ থেকে আপীল করা হলো। অনুসন্ধানে জানা গেল—জজ বাহাদুর অথবা হাইকোর্টের বিচারপতি হানাফী মজহাবের অনুসারী। এমতাবস্থায় পূর্বের ফয়সালাকে কোন অবস্থাতেই নাকচ করা যাবে না।

৩. যে বিচারকের নিকট আপীল করা হয়েছে শুধু মাত্র নিম্নলিখিত কারণেই তিনি প্রথম ফয়সালাকে নাকচ করতে পারেন এবং তা এই : (ক) প্রথম ফয়সালা আল্লাহর কিতাব, রসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ কিংবা

যদি তা ইজমা' অর্থাৎ মুসলিম বিদ্বানমণ্ডলীর সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিরোধী না। 'আল্লামা কুদূরী বলেন :

وإذا رفع اليه حكم حاكم امضاه الا ان يخالف الكتاب والسنة والاجماع۔

আপীলের ক্ষেত্র বিচারক প্রথম বিচারকের রায় কার্যকর করবেন—নাকচ করবেন না যদি না তা আল্লাহ্‌র কিতাব, রসূলে করীম (সা)-এর সুন্নাহ্‌ ও ইজমা' বিরোধী হয়। বিচার বিভাগ এবং এ প্রসংগে ফকীহ্‌ ও মুজতাহিদগণ আল-কুর'আন ও রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাদীস তথা বাস্তব জীবনাদর্শের আলোকে—শত শত কিতাব লিখেছেন। বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন : 'উমদাতুল কারী, আল-মুহাল্লা, তালখীসুল জিয়ার, ফতহুল কাদীর ইত্যাদি—আর তাহলেই জানতে পারবেন কল্যাণকর ও কার্যকর জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি। অক্সফোর্ড কিংবা কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কখনই পাওয়া যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বে তার চরিত্র গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে এবং এর জন্য আলাদা বিভাগ থাকবে যার নাম হবে সাক্ষীদের নৈতিক শুদ্ধি বিভাগ। সাক্ষী এবং বিবাদীর ভেতর পুরাতন কোন শত্রুতা ছিল কিনা ইত্যাদি দেখাও এ বিভাগের কাজ।

৪. নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাযীর পক্ষে ক্রোধান্বিত হওয়া, খিটখিটে মেজাজের হওয়া একদম অনুচিত। এ সম্পর্কে আমি হযরত 'উমর (রা)-এর জগত প্রসিদ্ধ ইশতেহার লিপিবদ্ধ করছি যা বিচারের ক্ষেত্রে বুনিয়াদী নীতির অন্তর্ভুক্ত এবং যার উদ্ধৃতি কানযুল 'উম্মাল, দারকুতনী, মুকাদ্দমা ইবনে খালদূনে বিদ্যমান।

يقول عمر رض اما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة اذا ادلى اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له واس بين الناس فى وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف فى حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على المدعى واليمين على من انكر والصلح جائز

المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولا يمنعك
القضاء قضيته امس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه
لرشدك ان ترجع الى الحق فان الحق قديم ومراجعة
الحق خير من التمادى فى الباطل. الفهم فيما يتلجلج فى
صدرك مما ليس فى كتاب ولا سنة ثم اعرف الامثال
والاشباه وقس الامور بنظائرها واجعل لمن ادعى
حقا غائبا او بينة امرا ينهى اليه فان احضر بينة اخذت
له بحقه والا استحللت القضاء عليه فان ذالك القى للشك
واجلى للعمى. المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا
فى حدا ومجربا عليه شهادة الزورا وظنينا فى ولاء او نسب
فان الله سبحانه عفا عن الايمان ودرأ بالبينات واياك
والقلق والضجر والتاقف بالخصوم فان استقرار الحق فى
مواطن الحق. يعظم الله به الاجر ويحسن به الذكر والسلام.

হযরত ‘উমর (রা) লিখেছিলেন: আল্লাহ্‌র প্রশংসার পর—ন্যায় বিচার অত্যন্ত জরুরী একটি ফরয এবং অনুসরণীয় একটি সুন্নত। ভালভাবে বোঝ, যখন তোমার নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করা হয় তখন এমন কথায় কোন লাভ নেই যা কার্যকর করা যাবে না। মানুষকে তোমার উপস্থিতিতে তোমার দরবারে সব সময় এবং বিচার করতে গিয়ে সমান মর্যাদা দেবে যেন দুর্বল মানুষ কোনদিন ন্যায় ও সুবিচার থেকে বঞ্চিত না হয় এবং প্রভাব প্রতিপত্তিশালী লোকদের মনে তোমার অনুগ্রহ পাওয়ার আশাও না জাগে। সকল অবস্থাতেই বাদীকে সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিবাদীকে শপথ করাতে হবে। সব সময় ও সকল ক্ষেত্রে আপোষ নিষ্পত্তির পথ খোলা রাখবে, কিন্তু তা যেন হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা না হয়। কোন রায় দেওয়ার পর পুনরায় চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণের পর প্রকৃত সত্য ধরা পড়লে সত্যের পথে ফিরে আসতে কোন কিছুই যেন তোমাকে দ্বিধাগ্রস্ত না করে।

কেননা সত্য চিরন্তন এবং সত্যের আলোকোজ্জ্বল পথে ফিরে আসা (এমনকি তা অনেক বিলম্বে হলেও) বাতিল ও বিভ্রান্তির নিকষ অন্ধকারে ঘুরে মরা থেকে বহু গুণে উত্তম। কোন গুরুতর সমস্যা ও মসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে যদি কোনরূপ সন্দেহ দেখা দেয় এবং কুরআনুল করীম ও হাদীস পাকে এর কোন উল্লেখ না পাও—তবে এ ব্যাপারে বারবার চিন্তা কর, আবারও বুঝতে চেষ্টা করো এবং পূর্বতন নজীর খুঁজতে থাক, গবেষণা কর—তারপর বিশেষ বিবেচনা ও গভীর চিন্তা-ভাবনার পর রায় দাও। কেউ সাক্ষী পেশ করতে চাইলে সময় সাপেক্ষে তাকে নির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে দাও। এর মধ্যেই যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণপূর্বক তার সুবিচার পাওয়ার ন্যায়সংগত অধিকার তাকে ফিরিয়ে দেবে—অন্যথায় মোকদ্দমা খারিজ করে দাও। সন্দেহ দূরীকরণে ও অন্ধত্ব দূরাতে এটাই সাহায্য করবে। প্রত্যেকটি মুসলমানের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য, তবে যে ব্যক্তিকে গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে দোররা (বেত্রাঘাত) মারা হয়েছে কিংবা যার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার অভিযোগ প্রমাণিত অথবা অন্যের দ্বারা দিয়েছে কিংবা বাদীর কোন প্রকার আত্মীয় (উত্তরাধিকারীও হতে পারে) তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। কেননা আল্লাহ্ পাক বাদীর পক্ষে শপথ ক্ষমা করেছেন এবং দলীল প্রমাণের দ্বারা দয়া প্রদর্শন করেছেন। অস্থিরতা ও বিরক্তি প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবে। বিবাদীকে ধমক প্রদান করবে না, কারণ সত্য তার নিজস্ব স্বরূপে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত। এর দ্বারা (অর্থাৎ উল্লিখিত নীতিগুলি মনে রাখলে ও পালন করলে) আল্লাহ্ পাক তোমার প্রতিদান ও পুরস্কার বাড়িয়ে দেবেন এবং সুনামও বৃদ্ধি পাবে।—ওয়াস্‌সালাম।।"

সাক্ষ্য প্রমাণের প্রকারভেদ

॥ বিচার প্রসঙ্গে ॥

প্রথম প্রকার : সাক্ষ্য :

এ সম্পর্কে ফিকাহ্‌র কিতাবগুলিতে শত-মসলা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্ত খসড়ার আকারে কতিপয় উসুল ও নীতিমালার বর্ণনা

দেওয়া হচ্ছে। হায়! আজ কোন একটি রাষ্ট্রও যদি এ নীতিমালার অনুসারী হতো তাহলে দুনিয়া জুলুম-অবিচার ও ফিৎনা-ফাসাদের সাক্ষাৎ জাহান্নামে পরিণত হতো না।

নীতিমালা ঃ ১

সাক্ষীর জন্য ন্যায়পরায়ণ হওয়া জরুরী। আল্লাহ্ পাক কুরআনুল করীমে বলেন ঃ

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ

فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ الآية.

অর্থাৎ "তোমরা পুরুষের মধ্য থেকে দুইজন সাক্ষী রাখিবে। আর দুইজন পুরুষ সাক্ষী না পাইলে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষী যাহাদের সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট।" অর্থাৎ সাক্ষী উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং সৎকর্ম ও সদ্গুণাবলীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি হবে। এই একটি মাত্র নীতির প্রতিই যদি নজর দেয়া হতো—তাহলে শত শত জুলুম ও মিথ্যা মোকদ্দমার মূলোৎপাটন হয়ে যেতো।

নীতিমালা ঃ ২

সাক্ষ্য দেওয়া সাক্ষীর জন্য ধর্মীয় এবং জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। সাক্ষ্য দিয়ে সে সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে মাত্র। যার জন্য সে সাক্ষ্য দেয় এতে তাকে কোনরূপ ইহ্সান (অনুগৃহীত) করা হয় না। কেননা আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ.

অর্থাৎ "তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না। আর যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন

করিবে উক্ত পাপের প্রতিক্রিয়া তার অন্তরমূলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে।"
আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ
وَلَوْ عَلٰى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ - إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيْرًا فَاللّٰهُ أَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى أَنْ تَعْدِلُوْا.

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে সুদৃঢ় থাকিও এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রদান করিও যদিও তা তোমার নিজের বিরুদ্ধে যায়; এমনকি তা তোমার পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও যায়। বাদী-বিবাদী ধনী অথবা গরীব হউক তাহাদের তুলনায় আল্লাহ্ পাক অধিকতর হকদার। আর ন্যায়বিচারে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসারী হইও না।"—আয়াতটি ইসলামের একটি মহত্তম নীতি যে সম্পর্কে ব্যাখ্যার জন্য স্বতন্ত্র পুস্তকের অবকাশ রাখে। এখানে তা কোথায়? সংক্ষিপ্তভাবে তা এই ঃ

১. মুসলমানের জন্য সকল ক্ষেত্রে এবং সকল অবস্থায় ন্যায় ও সত্যের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা ফরয।

২. সত্য যদি নিজের বিরুদ্ধেও যায় কিংবা পিতামাতার অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে গেলেও সর্বদাই এবং সকল অবস্থাতেই সত্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও সহায়তা প্রদর্শন করা মুসলমানদের উপর ফরয।

৩. যদি কোন ব্যাপারে একজন মুসলিম একজন অমুসলিমের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের সূত্রপাত হয় এবং সেক্ষেত্রে অমুসলিম যদি ন্যায়-সত্যের অধিকারী হয়—এমতাবস্থায়ও ন্যায় সত্যের পক্ষ ত্যাগ করা কোন মতেই জায়েয হবে না।

৪. ধনাঢ্য ব্যক্তির খুশি ও সন্তুষ্টির স্বার্থে সত্য পরিত্যাগ করা কখনও গ্রহণযোগ্য নয়।

৫. ঠিক তেমনি গরীব নিঃস্ব অসহায় ব্যক্তির অনুকূলে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ভয় পেয়ে কিংবা অন্য কোন কারণে সত্য পরিত্যাগ করে পিছিয়ে আসাও জায়েয নয়।

৬. সাক্ষ্য দেওয়ার উদ্দেশ্য একমাত্র সত্য ও ন্যায়ের সাহায্য—তা সে যেখানেই হোক আর যার কাছেই হোক।

নীতিমালা : ৩

সাক্ষীদের নৈতিক পরিশুদ্ধি : সাক্ষীদের নৈতিক পরিশুদ্ধির জন্য "সাক্ষীদের নৈতিক পরিশুদ্ধি বিভাগ" নামে একটি আলাদা স্থায়ী বিভাগ থাকবে। সাক্ষীদের চরিত্র ও কর্মের অনুসন্ধানই হবে এ বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। যদি বর্তমান কালে কোন সরকার এ ধরনের একটি বিভাগের সাহায্য নিতেন তবে জালিম ও মিথ্যুক সাক্ষীদের উৎখাত সম্ভব হতো। এ বিভাগ সম্পর্কে এতটুকু বলা যথেষ্ট যে, কাযী পার্শ্ববর্তী পরহেযগার ও দীনদার লোকদের একটি তালিকা তৈরী করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। এরপর যে কেউ কোন মোকদ্দমার সাক্ষী হয়ে আসলে পার্শ্ববর্তী উত্তম ও সচ্চরিত্রবান একজন লোকের কাছে যার নাম তালিকায় বিদ্যমান একটি চিঠি পাঠিয়ে দেবেন যেখানে সাক্ষীর নাম-ধাম ঠিকানার পর তার চরিত্র ও কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রশ্ন থাকবে। উক্ত ব্যক্তি তেমন অবস্থায় নিজের নতুন ও পুরাতন জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রেরিত প্রশ্নাদির উত্তর নিম্নের তিনটি পন্থার যে কোন একটি পন্থায় যা অধিকতর সত্যের কাছাকাছি লিখবেন :

ক. যদি তার নিকট সাক্ষীর সাক্ষ্য বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্য হয় তবে তিনি লিখে পাঠাবেন- عدل جائز الشهادة অর্থাৎ সাক্ষী ন্যায়পরায়ণ; সাক্ষ্য গ্রহণ জায়েয।

খ. যদি সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য অথবা অগ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে তার নিকট সন্দেহ দেখা দেয় তবে তিনি লিখে পাঠাবেন—مستور অর্থাৎ গোপনীয়।

গ. আর যদি সাক্ষীর সাক্ষ্য তার মতে গ্রহণযোগ্য না হয় কিংবা তার চরিত্র ও কর্ম নির্ভরযোগ্য ও সন্তোষজনক না হয় তবে এই বিষয়ে কিছুই লিখবেন

না অথবা লিখবেন والله اعلم অর্থাৎ এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই বেশী ভাল জানেন। বিস্তারিত জানতে চাইলে রুদ্দুল মুহতার ও ফতহুল কাদীর ইত্যাদি দেখুন। নৈতিক পরিশুদ্ধির এ গোপন প্রয়াস প্রকাশ্যে চালাবেন।

নীতিমালা : ৪

কোন সাক্ষীর ব্যাপারে যদি জানা যায় যে, সে মিথ্যাবাদী তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। শাস্তির প্রকৃতি ও সময় সীমা সম্পর্কে তৎকালীন খলীফা অবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে নির্ধারণ করবেন। অবশ্য হযরত উমর ফারূক (রা)-এর যমানায় তার চেহারাকে কালো করে দেয়া হতো এবং তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হতো। হাফিজ জামালুদ্দীন যায়লায়ী (র) 'নসবুর রায়' নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার ইবনে আবী শায়বা থেকে বর্ণনা করেন :

ان عمر رض كتب الى عماله بالشام فى شاهد الزور يضرب اربعين سوطا ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطال حبسه انتهى -

"হযরত 'উমর (রা) সিরিয়ায় নিযুক্ত কর্মচারীকে লিখেছিলেন : মিথ্যুক সাক্ষীকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত লাগানো হবে, চেহারা কালিমাময় করা ও মাথা মোড়ানো হবে এবং তার বন্দী জীবন দীর্ঘায়িত করা হবে।"

ইকরার বা স্বীকৃতি

ইকরার বা স্বীকৃতি বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্রে একটি বড় দলীল। বাদীর পক্ষ থেকে চাওয়া মাত্রই বিবাদীর নিকট থেকে স্বীকৃতি গ্রহণ করা হয়। কখনও কখনও বাদীর স্বীকৃতিও উপকারি ও কার্যকরী হয়ে থাকে। উদাহরণত, ফকীহ্‌গণ এভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন :

وما لا يعلم الا منها صدقت فى قولها بيمينها -

কসম

এটাও বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্রে একটি বড় দলীল। বাদী চাওয়া মাত্র বিবাদী থেকে কসম গ্রহণ করা হয়। কখনও কখনও বাদীর নিকট থেকেও

এটা গ্রহণ করা হয়। উদাহরণত, সে সমস্ত মোকদ্দমা যা হায়েয, নিফাস, গর্ভ, 'ইদ্দতের সাথে সম্পর্কিত এবং বাদী যদি মহিলা হয় তবে সেক্ষেত্রে মেয়েদের কসমের উপর আস্থা স্থাপন করা হবে ইত্যাদি। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত হাদীস ও ফিকাহ্‌র কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল হলফ, কিতাবুত্তাবহালক ইত্যাদি পাওয়া যাবে!

অস্বীকৃতি نكور

উভয় পক্ষের যার নিকট কসম দাবী করা হয়েছে সে যদি কসম করতে অস্বীকার করে তবে কাযী তাকে না-হক ও অসৎ মনে করে মোকদ্দমার ফয়সালা করবেন।

কার্যকারণ قرائن

অর্থাৎ এমনই কার্যকারণ যা অত্যন্ত স্পষ্ট আর খোলামেলা এবং তা অকাট্যও বটে—বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্রে একটা বড় প্রমাণ। দেখুন রদ্দুল মুহ্‌তার ৪র্থ খণ্ডের ৩৩১ পৃষ্ঠা :

والحجة للقضاء اما البينة او الاقرارا واليمين او
النكول عنه او القسامة او علم القاضى بما يريد ان يحكم به
او القرائن الواضحة التى تصير الامر فى حيز المقطوع به
كما لو ظهر انسان من دار بيده سكين وهو متلوث بالدم
سريع الحركة عليه اثر الخوف فدخلوا الدار على الفور
فوجد وافيها انسانا مذبوحا بذالك الوقت ولم يوجد احد
غير ذالك الخارج فانه يوخذ به وهو ظاهر اذ لايمترى احد
فى انه قاتله ـ

অর্থাৎ "বিচারের ক্ষেত্রে দলীল-প্রমাণ ও সাক্ষীর সাক্ষ্য, স্বীকৃতি, কসম, কসম অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে একতরফা ডিগ্রী, বাদী বিবাদীর পারস্পরিক কসম, কাযীর মোকদ্দমা সম্পর্কিত জ্ঞান ও বিচার বিশ্লেষণ বিবেচনা অথবা এমন কোন সুস্পষ্ট কার্যকারণ যার সাহায্যে

আসামীকে দোষী করা চলে—সবগুলি দলীল ও প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে।" সুস্পষ্ট কার্যকারণের উদাহরণ নিম্নে দেয়া গেল ঃ

"ধরুন, এক ব্যক্তিকে রক্তাক্ত ছুরি নিয়ে একটা ঘর থেকে বের হতে দেখা গেল। বাইরের লোক দেখামাত্রই সে ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় পালাতে গিয়ে ধরা পড়লো। এদিকে সাথে সাথেই লোকজন ঘরে ঢুকে দেখতে পেল একটি লোক গলা কাটা অবস্থায় পড়ে আছে। ঘরে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিও নেই। নিহত ব্যক্তিকে দেখেও কেবলই তাকে খুন করা হয়েছে বলে মনে হয়। এমতাবস্থায় ছুরিধারী পলায়নপর লোকটিকে অপরাধী সাব্যস্ত করে শরীয়তের বিধান মুতাবিক প্রাপ্য শাস্তি তাকে দেওয়া হবে।"

লিখিত দলীল-প্রমাণ

লিখিত প্রমাণাদিও মামলা-মোকদ্দমা ও ঝগড়া-বিবাদ বিষয়ে একটি বড় দলীল। বিষয়টি অত্যন্ত বিরাট ও বিস্তৃত। সংক্ষিপ্ত নিম্নরূপ ঃ

১. প্রত্যেকটি লিখিত দলীল-প্রমাণ প্রথমত রেজিষ্ট্রিভুক্ত হবে এবং তার সত্যায়িত কপি কাযীর দফতরে কিংবা জেলা প্রশাসক অথবা প্রাদেশিক শাসনকর্তার দফতরে বিদ্যমান থাকবে অথবা তা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী খলীফার সেক্রেটারিয়েটে বর্তমান থাকবে। এরপর যদি উক্ত সত্যায়িত কপির নকল রেজিষ্ট্রিকৃত দলীলের অনুরূপ হয় তবে উক্ত দলীল মামলা-মোকদ্দমা ও বিচার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একটি বড় প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। রেজিষ্ট্রি দলীল তাকেই বলা হয় যার উপর কাযী কিংবা রেজিষ্ট্রারের দস্তখত ও সীলমোহর থাকে এবং দু'জন সাক্ষীর দস্তখতও বর্তমান থাকে। বাহরুর রায়েক ও শামী গ্রন্থে রেজিষ্ট্রিকৃত দলীলের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ

والحجة ما عليه علامة القاضي أعلاه وخط الشاهدين
أسفله .

অর্থাৎ "রেজিষ্ট্রিকৃত দলীল তাকেই বলা হয় যার উপরিভাগে কাযীর চিহ্ন (দস্তখত ও সীলমোহর) এবং নীচে দু'জন সাক্ষীর স্বাক্ষর থাকে।" 'আল্লামা শামী রদ্দুল মুহতার গ্রন্থে বলেন:

ويعمل من السجل مما له رسوم فى تداوين القضاة الماضيين وكذا يعمل بما فى الدفاتر السلطانية وكذا يعمل بمنشور القاضى والوالى وعامة الاوامر السلطانية المكتوبة الخ -

"কাযী ঐ রেজিস্ট্রার মাফিক কাজ করবেন যার নিদর্শনাবলী পূর্ববর্তী বিচারকগণের রেজিস্টারীতে থাকবে। এমনিভাবে রাষ্ট্রীয় দফতর তথা সংবিধান এবং কাযী গভর্নরের প্রকাশ্য বিধান এবং সরকারী লিখিত সাধারণ বিধান অনুসারে কাজ করবেন।"

২. মহাজনী ডায়রী, ব্যবসায়ী ডায়রী ও খাতা, মহাজনী চেকও কখনও কখনও ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে দলীল হতে পারে। বিস্তারিত রদ্দুল মুহতার দ্রষ্টব্য।

৩. রশিদ: আরবী ভাষায় একে ওসূল বলা হয় এবং এ ধরনের লিখিত কাগজ-পত্রাদিও এক্ষেত্রে দলীল-প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিস্তারিত জানতে চাইলে রদ্দুল মুহতার ৪র্থ খণ্ডের باب كتاب القاضى الى القاضى এবং ফিকাহ্‌র অন্যান্য কিতাবাদি দেখুন।

কাযীর অবগতি

কাযী কিংবা খলীফার অবগতিও কোন অবস্থায় বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্রে দলীল হয়ে থাকে। বিস্তারিত ফিকাহ্‌র কিতাব দ্রষ্টব্য।

বাদী ও বিবাদীর পারস্পরিক কসম

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান ফিকাহ্‌র কিতাবাদিতে স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসাবে বিদ্যমান।

মামলা-মোকদ্দমা ও বিবাদ-বিসম্বাদের প্রকারভেদ এবং সম্পর্কিত বিষয়াদি

এমনিতেই মামলা-মোকদ্দমার বহু প্রকারভেদ আছে। এখানেই শুধু তিন প্রকার মোকদ্দমা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

১ম প্রকার ঃ

সেই সমস্ত মামলা-মোকদ্দমাজাত বিষয়াদি যার মধ্যে দাবী শর্ত নয়। ইসলামী সরকারই নয় বরং প্রতিটি মুসলমান যে বিষয়ে বাদী হতে পারে।

২য় প্রকার ঃ

সেই সমস্ত মামলা-মোকদ্দমাজাত বিষয়াদি যাকে আরবীতে 'জিনায়াত' বলা হয়। আমরা একে ফৌজদারী মামলা-মোকদ্দমা হিসাবে বুঝি।

৩য় প্রকার ঃ

যে সমস্ত মোকদ্দমা যা ধন-সম্পদ ও বিভিন্ন অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত; আমরা যাকে দেওয়ানী মোকদ্দমা হিসাবে বুঝি।

উল্লিখিত প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও আলাদাভাবে কিছু বক্তব্য নীচে পেশ করা হলো ঃ

যে সমস্ত মোকদ্দমা দাবী যার শর্তভুক্ত নয়, যে সব মোকদ্দমার সম্পর্ক আল্লাহ্ পাকের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত, সে সমস্ত মোকদ্দমায় প্রতিটি মুসলিম নাগরিকই দাবীদার হতে পারেন অর্থাৎ বাদী হিসেবে মামলা দায়ের করতে পারেন এবং এসব ক্ষেত্রে প্রতিটি মুসলিম বাদীর ন্যায় এক একজন সাক্ষী। হক্কুল্লাহ্ বা আল্লাহ্ অধিকার বহু প্রকারের। যেমন ঃ কোন ব্যক্তি সালাত কায়েম করে না অথবা লোকটি বিদ'আতী[1] এবং জনসাধারণের ভেতর বিদ'আতী চিন্তাধারার প্রসার ঘটাতে ইচ্ছুক অথবা কেউ যিন্দীক, সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তিকর, বাতিল চিন্তাধারা ও

টীকা—১ ঃ রসূল (সা) এবং খুলাফায়ে রাশেদীন পরবর্তী ভ্রান্ত ও গোমরাহী মতবাদের ধারক, বাহক ও প্রচারক।—অনুবাদক।

মতবাদের প্রচার-প্রসার ঘটাচ্ছে—সেক্ষেত্রে প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয যে, সে এ সম্পর্কে ইসলামের কাযী কিংবা মুসলমানদের নিযুক্ত খলীফার নিকট খবর পৌঁছাবে অথবা কোন ব্যক্তি স্বীয় তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে যিনা কিংবা অবৈধ সম্পর্ক রেখেছে—সেক্ষেত্রেও ইসলামী প্রশাসনকে এতদ্‌সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা জনগণের জন্য অত্যন্ত জরুরী। এ সমস্ত মোকদ্দমার ক্ষেত্রের সংবাদদাতা সাক্ষীর ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং এ সম্পর্কিত প্রতিটি কাজ সাক্ষীর অনুরূপ হবে। ইসলামী সরকার সেক্ষেত্রে বাদীর ভূমিকা পালন করবেন।

রদ্দুল মুহতার গ্রন্থে বলা হয়েছে :

ويجب الاداء بلا طلب لو الشهادة فى حقوق الله تعالى وهى كثيرة قال فى الاشباه تقبل شهادة الحسبة بلا دعوى فى طلاق المرأة وعتق الامة والوقف وهلال رمضان والحدود الا حد القذف والسرقة الخ -

"এবং সাক্ষী বিনা নোটিশেই সাক্ষ্য দিতে বাধ্য থাকবেন যদি তা আল্লাহ্‌র অধিকারের সাথে জড়িত ও সম্পর্কিত হয় আর তা বহুবিধ। ইশবাহ্‌ গ্রন্থে বলা হয়েছে—স্ত্রীলোকের তালাকের ক্ষেত্রে, বান্দী আযাদ করা, ওয়াকফ, রমযান মাসের চাঁদ দেখা এবং এমন সব পাপ ও অন্যায় কাজের ক্ষেত্রে যার জন্য শরীয়তে প্রকাশ্য শাস্তির বিধান রয়েছে—সাক্ষীকে নিজ গরজেই ও বিনা আহ্বানেই সাক্ষ্য দিতে হবে। তবে যিনার অপবাদ ও চুরির ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।"

দাবী সম্পর্কে

এ সম্পর্কিত বিষয়াদী এবং এর শাখা-প্রশাখাগুলো পরিমাণে এতই বিরাট ও বহুল বিস্তৃত যে, তার একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া রচনা করাও বর্তমান পুস্তকে সম্ভবপর নয়। এজন্য এখানে কতিপয় নিয়মাবলীর উপর আলোচনা করাতেই নিজেকে সীমিত রাখবো। বিস্তারিত জানতে আগ্রহী ব্যক্তিদের

ফাতাওয়ায়ে 'আলমগীরী, ইবনুল গারসের আলফাওয়াকিহাল বদরীয়া, এবং রাহরুর রায়েক নামক কিতাবগুলো পড়তে অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিয়মাবলী

নিয়ম : ১

কোন শহরে যদি কয়েকজন কাযী থাকেন এবং প্রত্যেকেই বিবাদ-বিসম্বাদ সম্পর্কে বিচার ফয়সালার পূর্ণ ভারপ্রাপ্ত হন—তবে যার নিকট ইচ্ছা বাদী তাঁর মোকদ্দমা পেশ করতে পারেন। অবশ্য মামলা-মোকদ্দমা সংখ্যায় বেশী হলে সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক নিজে অথবা প্রতিনিধি মারফত নিজেই মামলা-মোকদ্দমাগুলো বিভক্ত করে যে কোন মামলা-মোকদ্দমা যে কোন কাযীর নিকট পাঠাতে পারেন। রদ্দুল মুহতার, ৩৮২ পৃঃ।

নিয়ম : ২

যদি বাদী ছত্রিশ (৩৬) বছর পর্যন্ত কোন প্রকার দাবী না করে তবে উক্ত সময়ের পর তার দাবী আর শোনার মতো থাকবে না। অবশ্য সে যদি অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ সে যদি হারিয়ে যায় কিংবা তার কোন সন্ধান না থাকে, সে নাবালেগ কিংবা পাগল হয় এবং কোন বৈধ অভিভাবক না থাকে কিংবা বিবাদী যদি কোন অত্যাচারী শাসক হন—তবে সেক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

قال المتاخرون من اهل الفتوى لاتسمع الدعوى بعد ست وثلثون سنة الا ان يكون المدعى غائبا اوصبيا او مجنونا وليس لها ولى اومدعى عليه اميرا جائرا الخ

"ফতওয়াদাতা 'উলামায়ে মুতাখ্খিরীন (শেষ যুগের বিদ্বানমণ্ডলী) বলেন : কোন দাবী-দাওয়াই ৩৬ বছর অতিক্রান্ত হবার পর শোনা হবে না যদি না বাদী অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ বাদী যদি হারিয়ে যায় কিংবা তার কোন সন্ধান না থাকে অথবা বাদী বালক অথবা পাগল হয় এবং তার কোন বৈধ অভিভাবক না থাকে অথবা বিবাদী যদি হন একজন অত্যাচারী শাসক।"

অন্যান্য অবস্থায় তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পর তা আর শ্রবণযোগ্য থাকে না। বিস্তারিত জানতে হলে ফাতাওয়া খায়রিয়া, ৫৯ পৃ. ২য় খণ্ড এবং তাকমিলায়ে রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

নিয়ম : ৩

যদি বিবাদী হাযির না থাকে তবে কাযীর জন্য ফয়সালা করা জায়েয নয়। কারও মাধ্যমে উপস্থিত হওয়াও যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তার উকীল কিংবা ওসীয়তকৃত ব্যক্তির উপস্থিতি যথেষ্ট বলে গণ্য হবে।

নিয়ম : ৪

যদি বিবাদী হাযির না হয় তবে কাযী সাহেব বিবাদীকে হাযির করাতে জেলা প্রশাসকের নিকট পুলিশের সাহায্য চাইবেন। কাযী সাহেব যদি এভাবেও তাকে হাযির করতে ব্যর্থ ও অসমর্থ হন তবে এক্ষেত্রে তিনি বিবাদীর অনুপস্থিতিতেই ফয়সালা করতে পারবেন। এ ব্যাপারে কাযী সাহেবের পুরো ইখতিয়ার আছে।

قال الشيخ ابن الهمام فى الفتح باب المفقود لا يجوز القضاء على الغائب الا اذارأى القاضى مصلحة فى الحكم له وعليه فحكم فانه ينفذ -

"শেখ ইবনুল হুমাম ফতহুল কাদীরের باب المفقود-এ বলেন : বিবাদীর অনুপস্থিতিতে কাযীর পক্ষে বিচার করা জায়েয হবে না। তবে বিচার করাটাকেই বাদী-বিবাদী উভয়ের ক্ষেত্রে কাযী 'মাসলাহাত' (সমীচীন) মনে করেন তবে তিনি তা করতে পারেন।"

বিস্তারিত রদ্দুল মুহতার দ্রষ্টব্য। কিন্তু এক্ষেত্রে অনুপস্থিতের পক্ষ থেকে কাযীর জন্য একজন উকীল নিযুক্ত করে ফয়সালা করাই সবচেয়ে উত্তম।

فى جامع الفصولين فينبغى أن ينصب القاضى وكيلا عن الغائب يعرف انه يراعى جانب الغائب ولا يفرط فى حقه -

"জামে ফুসূলায়ন নামক কিতাবে বলা হয়েছে যে, কাযীর জন্য সমীচীন অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে একজন উকীল নিয়োগ করা যিনি তার মক্কেলের দিকটি দেখবেন যেন তার অধিকার ও স্বার্থের ক্ষেত্রে কোন বাড়াবাড়ি না হয়।"

নিয়ম ঃ ৫

আর দাবী যদি জমি কিংবা ঘর-বাড়ী সম্পর্কে হয় তবে শহরের নাম, মহল্লার নাম, গলির নাম, সার্টিফিকেট নম্বর, চারি সীমার (চৌহদ্দী) বর্ণনা এবং তার মালিকদের নাম দাবীনামায় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকা আবশ্যক। বিস্তারিত রুদ্দুল মুহতার ও 'আলমগীরীতে দেখুন।

ফৌজদারী ও শাস্তি বিধান প্রসঙ্গে

এতে দু'টি বিভাগ ঃ শাস্তিদান সম্পর্কিত বিভাগ এবং ফৌজদারী মামলা-মোকদ্দমা বিভাগ। আর এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, বর্তমান পুস্তকে এর সকল দিক নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। এখানে সব কিছুই সংক্ষিপ্ত সূচীপত্রের আকারে পেশ করা হবে।

১ম বিভাগ ঃ শাস্তিদান প্রসঙ্গে

ব্যভিচারের শাস্তি ঃ ১. মানুষের হিফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ খলীফার জন্য ফরয এবং গোটা মানব জাতির হিফাজত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেহেতু মানব জাতির হিফাজত, জন্ম ও বংশবৃদ্ধির উপর পুরামাত্রায় নির্ভরশীল সেহেতু ইসলাম বিয়ে-শাদীর বিধান দিয়েছে এবং সেজন্য ইসলাম যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেছে। এ ছাড়া যৌনচাহিদা মেটাবার যতবিধ নিয়ম পদ্ধতি দুনিয়ায় প্রচলিত এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রচলিত হবে ইসলাম তার সবগুলোকেই হারাম ঘোষণা করেছে এবং এর জন্য কঠিনতর এমনকি কঠিনতম শাস্তির বিধান দিয়েছে। কুরআনুল করীম বলে ঃ

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ

وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ - فَمَنِ

ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ -

(সে সমস্ত মু'মিনই সাফল্যের অধিকারী) "যাহারা স্বীয় যৌনাংশের হিফাজত করে। কিন্তু স্ত্রী ও দাসীদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। ই ব্যতীত অন্যবিধ অবস্থায় যাহারা যৌন কামনা চরিতার্থ করে তাহারা স্পষ্টত সীমালংঘনকারী।" অর্থাৎ বিয়ে-শাদী ব্যতিরেকে যৌন-কামনা ও চাহি পূরণ করবার সকল উপায় উপকরণই হারাম এবং যারা উক্ত পাপ পথে যাত্রী তারা প্রকাশ্যত জালিম। তারা মানব স্বভাব ও প্রকৃতির উপর অথ সমগ্র মানবজাতির উপর জুলুম করে। বহুবিধ অবৈধ পন্থার মাত্র দু'টি আমরা উল্লেখ করব। এর মধ্যে প্রথম পন্থা পুংসঙ্গম তিন প্রকার ঃ

অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও কিশোরদের সাথে যুবকদের যৌনক্রিয়া; এর মধ্যে কামভাবে স্পর্শ, চুম্বন, সহবাস ও সঙ্গম, একই বিছানায় শয়ন ই সবগুলোই হারাম। মলদ্বারে সহবাস করা হারাম হওয়া সম্পর্কে কোন প্রকার মতভেদ নেই।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً

مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ -

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ "তোমরাই কি তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যাগ করিয়া যৌন-কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য পুরুষদের নিকট গমন করিয়া থাকে? তোমরা তো মূর্খ জাহিল সম্প্রদায়।" উল্লিখিত আয়াতে 'শাহওয়াতান' শব্দের ব্যবহার দ্বারা ছোট-বড় সকল প্রকার প্রকার যৌন-কামনা চরিতার্থ করবার অস্বাভাবিক পন্থাকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তে যুগের ইমামকে এই অধিকার দিয়েছে যে ধরনের

...মজলিসে শূরা ইচ্ছা করুক না কেন ইমাম তা বাস্তবায়িত করতে ...। চাই কি—সে শাস্তি হত্যাই হোক—কিংবা আগুনে জ্বালানোই হোক।

قال النبی صلعم من وجدتموہ یعمل قوم لوط فا قتلو ا الفاعل و المفعول بہ - اخرجہ ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ

...নবী আকরাম (সা) বলেন: তোমরা কাউকে কওমে লুতের অভ্যাসে (সমকামিতা) লিপ্ত দেখতে পেলে তাদের উভয়কেই হত্যা করবে। আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্।

ইমাম বায়হাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন:

ان خالد بن الولید کتب الی ابی بکر رض انہ وجد ر... فی بعض نواحی العرب ینکح کما تنکح المرأۃ فجمع ابوبکر ر... الصحابۃ فسئالھم فکان من اشرھم فی ذالک قولا علی ر... قال ھذا ذنب لم یعص بہ الا امۃ واحدۃ - صنع اللہ ب... ما قد علمتم - نری ان نحرقہ بالنار فاجتمع رای الصحابۃ علی ذالک -

অর্থাৎ "একবার হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) হযরত আবু বকর (রা)-কে লিখে জানান: আমি আরব উপদ্বীপের আশে-পাশে কিছু এলাকায় লক্ষ্য করেছি যে, তারা মেয়েদের ন্যায় পুরুষদের বিয়ে করে। (অর্থাৎ তারা সমকামিতায় অভ্যস্ত); এ ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি? হযরত আবু বকর (রা) সাহাবাদের পরামর্শ সভা আহ্বান করেন এবং বিষয়টি সম্পর্কে হযরত 'আলী (রা)-এর মতটিই ছিল সর্বাধিক কঠোর। তিনি বললেন: এটা (সমকামিতা) এমনই একটা পাপ যাতে ইতিপূর্বে একটি সম্প্রদায় (কওমে লুত) ব্যতীত আর কেউ লিপ্ত হয়নি। তাদের সাথে আল্লাহ্‌র আচরণ কিরূপ হয়েছিলো তা আপনাদের (কুরআনুল করীমের মাধ্যমে) জানানো হয়েছে। আমার স্পষ্ট অভিমত: তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হোক। এরপর সকল সাহাবা এতে একমত হলেন।"

দ্বিতীয়ত :

অপরিচিতার সাথে—প্রকৃতপক্ষে যা যিনার অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়ত :

নিজ স্ত্রীর সংগে আর এটা হারাম হওয়া সম্পর্কে সর্ববাদীসম্মত বর্তমান।

দ্বিতীয় পন্থা : ব্যভিচার

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا -

"আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যাইও না। কেননা ইহা অত্যন্ত অশ্লীল এবং (যৌন-কামনা চরিতার্থতার) নিকৃষ্টতম পন্থা।"

এ সম্পর্কে শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান এই যে, যিনাকারী যদি বিবাহিত হয় তবে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা হবে আর যদি অবিবাহিত হয় তবে তাকে একশ'টি বেত্রাঘাত করা হবে। আধুনিক কালের কিছু সংখ্যক নব্য আলোকপ্রাপ্ত (?) তথাকথিত প্রগতিবাদী বলছেন : যিনা সম্পর্কিত শরীয়তের বিধান অত্যন্ত কঠোর। এটা তাদের বোকামী ও মূর্খতাপ্রসূত ছাড়া আর কিছুই নয়। আইনের পূর্ণতা তো এখানেই যে তাকে অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর করা হয়েছে; কিন্তু সেজন্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি করা হয়েছে আরও কঠোর কঠিন। ফলে ইসলামী শরীয়ত যেখানে শাস্তির বিধানকে করেছে কঠোরতর সেখানে একে বাস্তবে প্রয়োগের জন্য এমন শর্তাদিও জুড়ে দেয়া হয়েছে যার ফলে একে কার্যকরী করা একরূপ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে এর ভীতিপ্রদতা ও ভয়াবহতা একটি বিরাট ও বিশাল জগত (ইসলামী জগত)কে উল্লিখিত পাপের হাত থেকেও বাঁচিয়েছে। হাদীস ও ফিকাহ্‌র কিতাবাদি পাঠ করলে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

দ্বিতীয় : চুরির শাস্তি

মানব জাতির হিফাজতের সাথে তার ধন-সম্পদের হিফাজতও অন্তর্ভুক্ত। এজন্য ইসলামী শরীয়তে (সংবিধানে) চুরির জন্যও শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا اى

ايمانها جَزَاءً بِمَا كَسَبَا الاية -

"চোর নারী অথবা পুরুষ উভয়ের ডান হাত কেটে দাও। ইহা তাহাদের কৃতকর্মেরই ফল।" অর্থাৎ নারী কিংবা পুরুষ চোর ধরা পড়লে আর সাক্ষ্য প্রমাণে চুরির অপরাধ প্রমাণিত হলে তার ডান হাত কাটা হবে। আজ সমস্ত দুনিয়া চোর ও লুটেরাদের স্বর্গভূমিতে পরিণত হতে চলেছে। শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য আল্লাহর বিশাল ও বিস্তৃত যমীন অত্যন্ত সংকীর্ণ ও স্বল্প পরিসরে সীমিত হয়ে গেছে। এর কারণ একটাই যে, চুরির জন্য কোন শাস্তি নেই। যাকে শাস্তি বলা হয় আসলে তা কোন শাস্তিই নয় বরং তা সরকারের আমদানী খাতের একটা অন্যতম উৎস ও মাধ্যম। এতে চোর কিছু দিনের জন্য সরকারের একজন নিম্নস্তরের কর্মচারীতে পরিণত হয় মাত্র। এদিকে গৃহস্থ বেচারার তো করুণ দশা! সম্পদও গেল আবার চোরকে জেলে পাঠাতে ঘুষের মাধ্যমে অনেক মহাত্মা (?)-কে তার সেবাও করতে হলো যার বিনিময়ে তার একটি কপর্দকও লাভ হয় না। অবশ্য এতায় সরকারের হাতে অনেক মুনাফাই জমা হয়। ওদিকে চোর যখন বেরিয়ে আসে দক্ষ ও অভিজ্ঞ চোর হয়েই বেরিয়ে আসে। আজকের জেলখানা যেন জেলখানা নয় বরং চোরদের ট্রেনিং কলেজ। কিছু দিন এখানে থেকে চোর চুরির উপর ডিগ্রী নিয়ে বের হয় এবং এর ফলে আগের তুলনায় তার চুরির ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়।

তৃতীয় : ডাকাতির শাস্তি

মানব জাতির হিফাজতের মধ্যে তার জীবন ও সম্পদের হিফাজতও অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু ডাকাত মানুষের জীবন ও সম্পদ উভয়টির উপরই হামলা চালায়—কখনও জীবন হানি ঘটায় আবার কখনও সম্পদেরও—কখনও শুধুই সম্পদ অথবা শুধুই জীবন হানি ঘটায়; কখনও বা দয়াপরবশ হলে শুধু ভয় দেখিয়ে ও হুমকী দিয়েই ক্ষান্ত হয়। সেহেতু এর শাস্তিও বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ জীবন ও সম্পদ হানি উভয়টির ক্ষেত্রে ডাকাতের শাস্তি শূলদন্ড; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ শুধু জীবন হানির ক্ষেত্রে শাস্তি মৃত্যুদন্ড; তৃতীয় অর্থাৎ সম্পদ হানির ক্ষেত্রে শাস্তি পরস্পর উল্টা দিক দিয়ে হাত-পা কেটে দেয়া অর্থাৎ ডান হাত কাটলে বাম পা এবং বাম হাত কাটলে ডান পা কেটে দিতে হবে। চতুর্থ ক্ষেত্রে অর্থাৎ হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ডাকাতের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা নির্বাসন। আল্লাহ্ পাক বলেন :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ

وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا - أَنْ يُّقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا

أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا

مِنَ الْأَرْضِ - ذَالِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ

فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

"(তাহাদের) শাস্তি ইহাই যাহারা আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল (সা)-এর সহিত যুদ্ধ করিবে কিংবা দুনিয়াতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির প্রয়াস পাইবে—হয় তাহাদের হত্যা করা হইবে অথবা শূলে চড়ান হইবে কিংবা

উল্টা-সিধা হাত-পা কাটা হইবে কিংবা তাহাকে নির্বাসনে পাঠান হইবে। দুনিয়াতে ইহাই তাহাদের অবমাননাকর শাস্তি আর আখিরাতে তাহাদের জন্য আরও ভয়াবহ শাস্তি রহিয়াছে।" —আল-কুরআন

চতুর্থ : মিথ্যা অপবাদের শাস্তি

যেহেতু 'ইয্যত-আব্রু তথা মান-সম্ভ্রম মানুষের হিফাজতেরই অন্তর্গত, সেহেতু একজন সতী-সাধ্বী ও চরিত্রবতী মহিলার উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া তাকে হত্যারই নামান্তর। এজন্য ইসলামী সংবিধান এর জন্য ৮০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি নির্দিষ্ট করেছে। আল্লাহ্ পাক পবিত্র আল-কুরআনে বলেন :

اَلَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ

شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً -

"যাহারা সতী-সাধ্বী রমণীদের উপর অপবাদ আরোপ করে আর সে জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থিত করিতে না পারিলে তাহাদিগকে আশিটি বেত্রাঘাত কর।" [সূরা নূর ৪ আয়াত]

পঞ্চম : মদ পানের শাস্তি

মানব জাতির হিফাজতের ভেতর তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকের হিফাজতও শামিল বিধায় শরীয়ত নেশাকর মাদক পানীয় দ্রব্যাদি হারাম ঘোষণা করেছে এবং এজন্য আশিটি বেত্রাঘাতের কঠিনতর শাস্তি নির্ধারিত করেছে। আল্লাহ্ পাক বলেন :

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

"হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি-পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।" সাহাবায়ে কিরামের একটি বিরাট জামা'আত হযরত রসূলে করীম (সা) থেকে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি এই ঃ

انه قال من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه -

"যদি কেউ মদ পান করে তবে তাকে বেত্রাঘাত কর, যদি পুনরায় পান করে তবে তাকে আবার বেত্রাঘাত কর; এর পর চতুর্থ বারের ক্ষেত্রে তাকে হত্যা কর।" উল্লিখিত হাদীসটি আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ইবনে মাজাহ্ ইত্যাদিতে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। বুখারী শরীফের একটি হাদীস থেকে জানা যায়—আশিটি বেত্রাঘাতের শাস্তি হযরত 'উমর (রা)-এর যমানা থেকে শুরু হয়েছে এবং মুসলিম শরীফের হাদীস থেকে এর উপর সাহাবাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিষয়ও জানা যায়। এজন্যে হিদায়া প্রণেতা বলেন ঃ

وحد الخمر والسكر ثمانون سوطا لاجتماع الصحابة -

অর্থাৎ—"মদ ও নেশা জাতীয় পানীয় পানের শাস্তি ৮০টি বেত্রাঘাত। এ ব্যাপারে সাহাবাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রয়েছে।" কিন্তু আবু ইয়া'লা মুসিলী কর্তৃক স্বীয় মুসনাদে হযরত 'আবদুল্লাহ্ বিন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি যঈফ বর্ণনায় জানা যায় ঃ

ان رسول الله صلعم قال من شرب بسقة خمر فاجلدوه ثمانين انتهى -

অর্থাৎ "রসূল (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও মদ পান করবে তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত কর।"

দ্বিতীয় বিভাগ

ফৌজদারী মামলা-মোকদ্দমা বর্ণনা প্রসঙ্গে

ফৌজদারী মামলা-মোকদ্দমা এত বিবিধ প্রকারের যে, তার তালিকা প্রণয়ন করাও কঠিন ব্যাপার। যেহেতু মানব জাতির হিফাজতের মধ্যে তার

জীবন, তার শরীর, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির হিফাজতও অন্তর্ভুক্ত সেহেতু আল্লাহ্ পাক ও তদীয় বিশ্বস্ত রসূল (সা) ফৌজদারী সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রসঙ্গে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির বিধান দিয়েছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত হাদীস ও ফিকাহ্‌র কিতাবগুলোতে পাওয়া যাবে। এখানে ফৌজদারী বিভাগগুলির মধ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সূচীপত্রের আকারে পেশ করা হচ্ছে।

প্রথম : ইচ্ছাকৃত হত্যা।

কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক ও ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করা— যার শাস্তি কিসাস অর্থাৎ হত্যার বদলে হত্যা আর তা সাম্য ও ইনসাফের সাথে হতে হবে। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনুল করীমে বলেন :

أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ

وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ - فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ

فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ -

('তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম) যে, প্রাণের বদলে প্রাণ চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহারই পাপ মোচন হইবে।"

সূরা বাকারায় আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء

اليه باحسان -

"হে বিশ্বাসিগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের[১] বিধান দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী; কিন্তু তাহার ভাইয়ের পক্ষ হইতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হইলে প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তাহার দেয় আদায় বিধেয়।"[২]

এ ব্যাপারে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের এ অধিকার আছে :

ক. ইচ্ছা করলে সে বদলা নিতে পারে,

খ. রক্তপণ নিতে পারে;

গ. চাইলে হত্যাকারীকে মাফও করে দিতে পারে।

২য় : ইচ্ছাকৃত সন্দেহে কিংবা ইচ্ছাপূর্বক অনুরূপ হত্যা

অর্থাৎ কাউকে ইচ্ছাপূর্বকভাবে ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক নয় এরূপ অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা আর এর শাস্তি কঠিনতম রক্তপণ। অবশ্য ইমাম ইচ্ছা করলে পরিস্থিতি দৃষ্টে হত্যাও করতে পারেন।

৩য় : ইচ্ছাকৃত ভুল করে হত্যা

উদাহরণত, কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে শিকার ভ্রমে গুলী চালিয়ে-দিল। সেক্ষেত্রে হত্যাকারীর শাস্তি রক্তপণ।

টীকা : ১ কিসাস অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে হত্যার দাবী করা। সজ্ঞানে কেউ কাউকেও হত্যা করলে বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান রয়েছে ইসলামী পরিভাষায় তাকেই কিসাস বলে।

টীকা : ২ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হত্যাকারীকে ক্ষমা করলে হত্যা-কারীর নিকট বিধিমত 'দিয়ত' বা অর্থদণ্ডের দাবী করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে যথাযথভাবে উক্ত দাবী পূরণ করতে হবে।

র্থ : কাজের ক্ষেত্রে ভুল করে হত্যা।

যেমন কোন ব্যক্তি শিকার লক্ষ্য করে গুলী চালিয়েছিল। গুলী ছুটে গিয়ে কোন মানুষকে আঘাত করেছে। যার ফলে মানুষটির মৃত্যু ঘটেছে। র শাস্তিও রক্তপণ।

ম : চলতি অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত হত্যা।

যেমন কোন ব্যক্তি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কোথাও দৌড়াতে গিয়ে কাউকে পদদলনে মেরে ফেলেছে।

ষষ্ঠ : কার্যকারণে হত্যা।

যেমন, কোন ব্যক্তি সাধারণের চলাচলের রাস্তায় এমন কোন পাথর রেখেছিল কিংবা খুঁটি, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি ফেলেছিল। এতে আঘাত লেগে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। এর বিস্তারিত বিধান ও বর্ণনায় হাদীস ও ফিকাহের কিতাবাদি ভরপুর। আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত করলাম।

ম : আঘাত ও যখম প্রসঙ্গে

এর শাখা-প্রশাখা এবং সম্পর্কিত বিধানাদির বর্ণনার কয়েকটি ভলিউম আবশ্যক। কেননা কতিপয় যখম অত্যন্ত মারাত্মক ও গভীর, কতক মধ্যম আর কতক ক্ষুদ্রাকৃতির ও স্বল্প। এ কারণে এর শাস্তিও বিভিন্ন ধরনের; কতিপয় ক্ষেত্রে অনুরূপ বদলা আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরিমানাই এর একমাত্র শাস্তি। মুহাদ্দিছ ও ফকীহ্‌গণ এর শাখা-প্রশাখা এবং বিধানাবলী ও নিয়ম-কানুন অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ইসলামী সংবিধানের দৃষ্টিতে আদায়কৃত জরিমানার মালিক হয় আহত ব্যক্তিই। রাষ্ট্রের একেত্রে কোন অংশ নেই। জরিমানার অর্থ—কড়ি থেকে রাষ্ট্র যেমন একটি পয়সাও নিতে পারে না—ঠিক তেমনি এর বাহানা ও অজুহাত তুলে কোনরূপ স্ট্যাম্প ইত্যাদি বিক্রি করে কোনরূপ উপার্জনও করতে পারে না। আর তা করলে সে হবে পরিষ্কার জুলুম। হায়! আজ যদি কোন রাষ্ট্র একে বাস্তবায়িত করতো! একটি হাদীস এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেই এ সম্পর্কিত আলোচনা আমি এখানেই শেষ করতে চাই।

হযরত রসূলে মকবূল (সা) য়ামনবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি লিখিত ঘোষণাপত্র হযরত 'আমর বিন হাযমের সাথে পাঠিয়েছিলেন। যার মধ্যে রাজস্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত অনেক মসলা-মাসায়েল ছিল। ফৌজদারী বিষয়েও বহু মসলা এতে স্থান পেয়েছে। এখানে ফৌজদারী বিষয়-সংক্রান্ত অংশটুকুর উদ্ধৃতি পেশ করছি। হাদীসটি দীর্ঘ বিস্তৃতি সহকারে নাসায়ী, মুসতাদরাক, সহীহ্ ইবনে হাব্বান, দারকুৎনী, আবু দাউদের মুরসাল গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। হাকেম হাদীসটির উদ্ধৃতির পর লিখেছেন:

اسنادہ صحیح وھو قاعدۃ من قواعد الاسلام -

অর্থাৎ-হাদীসটির সনদ সহীহ্ (বিশুদ্ধ) আর তা ইসলামের নিয়মাবলীর অন্যতম। হাদীসটি অংশত নিম্নরূপ:

ان من اعتبط مومنا قتلا عن بینۃ فانہ قود الا ان یرضی
اولیاء المقتول وان فی النفس الدیۃ مائۃ من الابل وفی
الانف اذا اوعب جدعۃ الدیۃ وفی اللسان الدیۃ وفی
الشفتین الدیۃ وفی البیضتین الدیۃ وفی الذکر الدیۃ
وفی الصلب الدیۃ وفی العینین الدیۃ وفی العین الوحدۃ
نصف الدیۃ وفی الید الوحدۃ نصف الدیۃ وفی الرجل
الواحدۃ نصف الدیۃ وفی المامومۃ ثلث الدیۃ وفی
الجائفۃ ثلث الدیۃ وفی المنقلۃ خمس عشرۃ من الابل
وفی کل اصبع من الاصابع الید والرجل عشرۃ من الابل
وفی السن خمس من الابل وفی الموضحۃ خمس من الابل
وان الرجل یقتل باطراۃ وعلی الذھب الف دینار انتھی -

অর্থাৎ-কোন ব্যক্তি কোন বিশ্বাসীকে যদি সজ্ঞানে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে এবং তা সাক্ষ্য প্রমাণে প্রমাণিত হওয়ার পর কিসাস (বদলা, হত্যার বদলে হত্যা) গ্রহণ করা হবে। অবশ্য নিহত ব্যক্তির অভিভাবক যদি

...কিংবা কোন শর্তে অথবা রক্তপণে রাযী ও সন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে ...কথা। মানুষ হত্যার বিনিময়ে রক্তপণ এক'শ উট; নাক কাটা গেলে ...রক্তপণ; জিহ্বা, দু'ঠোঁট, দু'টো অন্ডকোষ, পুরুষাঙ্গ, মেরুদণ্ড, ...চোখের বিনিময়ে পুরো রক্তপণ দিতে হবে। একটি চোখ, একটি হাত ...একটি পায়ের ক্ষেত্রে অর্ধেক রক্তপণ আদায় করতে হবে। অসুস্থ ও ...হাত-পায়ের ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ রক্তপণ দিতে হবে। অস্থি চর্মসার, ...বেরিয়ে গেছে এমন পায়ের ক্ষেত্রে পনেরটি উট; হাত-পায়ের যে ...আঙ্গুল কাটা গেলে দশটি উট, দাঁতের ক্ষেত্রে পাঁচটি এবং সামনের ...দাঁতের ক্ষেত্রেও পাঁচটি উট দিতে হবে। কোন স্ত্রীলোক যদি কোন পুরুষকে ...হত্যা করে এবং ধনবান ব্যক্তি তথা অর্থের মালিকের জন্যে রক্তপণ এক ...হাজার দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) রক্তপণ আদায় করতে হবে।

...ম: শিক্ষা ও দৃষ্টান্তমূলক বিবিধ শাস্তিদান প্রসঙ্গ (تعزيرات)

ফিকাহ্‌র কিতাবগুলোতে এ সম্পর্কে স্থায়ী অধ্যায় বর্তমান। এখানে ...তিনটি মস্‌লার বর্ণনা দিয়েই প্রসঙ্গ শেষ করব।

মস্‌লা: ১

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যারা জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে থাকে—যেমন: মুলাহিদ, যিন্দীক, বিদ'আতী কিংবা পার্থিব ও বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে জনগণকে শারীরিক, আর্থিক ইত্যাদি দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে ও কষ্ট-নির্যাতন দিয়ে থাকে—যেমন: চোর, ডাকাত, শ্বাসরোধকারী ইত্যাদি-যাদের শাসক যদি সমীচীন মনে করেন তবে হত্যা করতে পারেন। ...এমনও এদের হত্যা করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। দেখুন, রদ্দুল মুহ্‌তার, তৃতীয় খণ্ড এবং দুররুল মুখতার।

ইমাম নাসেহী (রা) ক্ষতিকর ও কষ্টপ্রদানকারী সব কিছুই হত্যা করা ওয়াজিব বলে ফতওয়া দিয়েছেন। রদ্দুল মুহ্‌তার তৃতীয় খণ্ডের ...১৯৮ পৃষ্ঠায় এবং মুলতাকা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে—কোন ঘর থেকে

বাদ্য-যন্ত্রের আওয়াজ শোনার পর উক্ত ঘরে প্রবেশ করা জায়েয, কেননা—বাদ্য-যন্ত্রের আওয়াজ শোনা যেহেতু হারাম সেহেতু সে বাদ্য-যন্ত্রের আওয়াজ শোনামাত্রই ঘরে প্রবেশের হারাম থেকে রেহাই পেয়েছে। অতএব সে শুধু প্রথমোক্ত হারামেই জড়িত। ফকীহ্ সদরুশ শহীদ বর্ণনা করেন: আমাদের ইমামগণের মতে, ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকের ঘর-বাড়ী এবং যে সমস্ত ঘর-বাড়ী নানাবিধ ফিৎনা-ফাসাদ ও পাপাচারের আড্ডা তা ভেঙ্গে দিতে হবে। হযরত 'উমর (রা) চীৎকার করে কান্নারত জনৈকা মহিলাকে তার ঘরে গিয়ে বেত্রাঘাত করেন। এতে তার মাথার উড়না পড়ে যায়। এব্যাপারে অভিযোগ উঠলে হযরত 'উমর (রা) বলেছিলেন,—'এতে কোন অন্যায় হয়নি। কেননা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার ফলে মহিলাটি বাঁদীর পর্যায়ে গিয়ে পেঁৗছেছিল।' হযরত আবুবকর বলখী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, ''একবার তিনি রুস্তাকের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি কতকগুলো স্ত্রীলোককে নদীর ধারে মাথা খোলা ও বাহু খোলা অবস্থায় দেখতে পান। বলা হ'ল: এটা তারা কিভাবে করতে পারে? তখন তিনি বললেন,—এটা তাদের জন্যে হারাম নয়। আমি তাদের ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ করি। সম্ভবত স্ত্রীলোকগুলো দারুল হারবের অমুসলিম মহিলা।'' হযরত 'উমর (রা) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি মদখোরদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়া দিয়েছিলেন।' প্রসিদ্ধ ফকীহ্ সিফারুয্‌যাহিদ পাপাচারী ও দুষ্কৃতিকারীদের ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।

মসলা: ২

মানসিক দিক দিয়ে আঘাত করলে, যেমন: গালি-গালাজ করে কারও মনে আঘাত দিলে ইসলামী সংবিধানে তার জন্যেও শাস্তির বিধান আছে।

মসলা: ৩

কোন মুসলিম যদি কোন যিম্মী (ইসলামী রাষ্ট্রের—অমুসলিম নাগরিক) কে য়াহুদী, কাফির অথবা অগ্নিপূজক ইত্যাদি নামে গালি দেয় কিংবা এছাড়া অন্যবিধ ভাষায় গালি-গালাজ করে তবে সেও পাপী হবে এবং

...রির আওতায় আসবে। দুররুল মুখতারে বলা হয়েছে :

شتم مسلم ذميا عزر قال اليهودى او مجوسى يا كافريا اثم مقتضاه انه يا ثم لا رتكابه الا ثم

অর্থাৎ—মুসলিম যিম্মীকে গালি দিলে শাস্তি পাবে। য়াহুদী, কাফির অগ্নিপূজক ইত্যাদি বললে গোনাহগার হবে। তার উদ্দেশ্য যেহেতু পাপীকে পাপে লিপ্ত করা—আর এ কারণেই সে পাপী হবে। লক্ষ্য করুন, ইসলামী জীবনাদর্শ ভিন্নধর্মী লোকদের সাথে কেমন সম্পর্ক কায়েমের নির্দেশ দেয়।

আলোচনা : ৪
অধিকার ও ধন-সম্পদ প্রসঙ্গে

যে সমস্ত মামলা-মোকদ্দমা ধন-সম্পদ ও বিবিধ অধিকারের সাথে সম্পর্কিত সে সমস্ত মোকদ্দমাকে দেওয়ানী মোকদ্দমা বলা হয়। এর পূর্ণাঙ্গ তালিকার বর্ণনা দেওয়া বর্তমান পুস্তকে সম্ভব নয়। আর সে কারণেই হাদীস ও ফিকাহ্‌র উল্লেখযোগ্য অধ্যায়গুলোর দিকে কিছু ইশারা-ইংগিত দিয়েই উপস্থিত আলোচনার সমাপ্তি টানব।

বিয়ে-শাদী সম্পর্কিত মোকদ্দমা

মামলা : ১

বিয়ে-শাদীর জন্যে সাক্ষীর প্রয়োজন। কিন্তু বিয়ে-শাদীর সঠিক ও বিশুদ্ধতার জন্যে সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণ হওয়া জরুরী নয়। অবশ্য বিয়ে-শাদী নিয়ে যদি মামলা-মোকদ্দমা দেখা দেয় তবে সে অবস্থায় সাক্ষীদের ন্যায়পরায়ণ হওয়া বাধ্যতামূলক হবে। ফিকাহ্ গ্রন্থে এরূপই বলা হয়েছে। হযরত হাফিজ জামাল উদ্দীন যায়লায়ী লিখেন :

عن عائشة رض قالت قال رسول الله صلعم لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذالك فهو باطل فان تشاجرا والسلطان ولى من لا ولى له - اخرجه ابن حبان فى صحيحه -

ইবনে হাব্বান তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে হযরত 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন: অভিভাবক এবং দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতিরেকে বিয়ে-শাদী বৈধ হয় না। এর বাইরে কেউ বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে। উভয়ের ভেতর বিবাদের সূত্রপাত হলে সুলতানই অভিভাবক হবেন—যার অভিভাবক নেই।

মসলা: ২

সাবালিকা মেয়ের বিনানুমতিতে তাকে বিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। যদি কোন অভিভাবক তার বিনানুমতিতেই বিয়ে দেয় তবে সে বিয়ে হবে অর্থহীন। এরূপক্ষেত্রে কাযী তাকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দিতে পারেন। হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত—রসূল করীম (সা) বলেন:

ان النبى صلعم الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها واذنها صامتها ـ قال الشيخ الامام ابن الهمام والايم من لا زوج لها بكرا كانت اوثيبا اخرج مسلم فى صحيحه وابوداود والنسائى وغيرهم ـ

স্বামীহীনা মহিলা অভিভাবকের তুলনায় নিজের উপর বেশী হকদার। কুমারীর ক্ষেত্রে অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন। চুপ থাকা তার সম্মতির লক্ষণ। ইমাম ইবনুল হুমাম বলেন: ايم বলতে সেই মহিলাকে বুঝায় যার স্বামী নেই—তা সে কুমারীই হোক কিংবা পূর্ব বিবাহিতাই হোক।

اخرج سعيد بن منصور فى سننه عن ابى سلمة بن عبد الرحمن قال جاءت امراة الى رسول الله صلعم فقالت ان ابى انكحنى رجلا وانا كارهة فقال رسول الله صلعم لا بيـوا لا نكاح لك اذهبى فانكحى من شئت واخرج ابوداؤد والنسائى وابن ماجة واحمد فى مسنده عن ابن عباس رض ان جارية بكرا اتت النبى صلعم فذكرت ان اباها زوجها وهى كارهة فخيرها النبى صلعم ـ

হযরত আবু সালমা বিন 'আবদুর রহমান বলেন: একজন স্ত্রীলোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে আরয জানায়--হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার বাপ আমাকে বিয়ে দিয়েছেন—অথচ সে বিয়েতে আমি রাযী নই। রসূলুল্লাহ্ (সা) তার অস্বীকৃতির প্রেক্ষিতে বললেন: যাও। তোমার যাকে খুশী বিয়ে করতে পার। তোমার বিয়ে হয়নি। ইবনে 'আব্বাসেরই অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে:

"একজন কুমারী স্ত্রীলোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আরয জানায় যে, তার পিতা তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে বিয়ে স্থায়ী রাখা না রাখার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিলেন।"

দেন-মোহর সম্পর্কিত মোকদ্দমা

মসলা: ১

ومن تزوج امرأة ثم اختلفا فى المهر فالقول قول المرأة الى تمام مهر مثلها والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل كذا فى الهداية.

অর্থাৎ- কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে করার পর উভয়ের ভেতর দেন-মোহরের পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিল। দেন-মোহরের পরিমাণ যদি মাহ্‌রে মিছলের[১] অনুরূপ হয় তবে সেক্ষেত্রে মহিলার কথাই সত্য বলে ধরা হবে। কিন্তু মাহ্‌রে মিছলের অধিক হলে স্বামীর বক্তব্য সঠিক বলে গণ্য করা হবে। হিদায়া কিতাবে এরূপই লিখিত আছে।

মসলা: ২

ومن بعث الى امرأته شيأ فقالت هى هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله الا فى الطعام الذى يوكل فان القول قول المرأة. كذا فى الهداية.

টীকা:—১ বিবাহিতা মহিলার নিকটাত্মীয় মহিলাদের দেন-মোহরের গড় পরিমাণকে মাহ্‌রে মিছ্‌ল বলা হয়।

"কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে কিছু পাঠালো। যদি (বিবাদের ক্ষেত্রে) স্ত্রী লোকটি বলে সেটা হাদিয়া ছিল, অপরপক্ষে স্বামী বলে—ওটা দেন-মোহর ছিল; এক্ষেত্রে স্বামীর কথাই সঠিক বলে ধরা হবে। কিন্তু পাঠানো বস্তু যদি খাবার জাতীয় বস্তু হয় তবে স্ত্রীলোকটির কথাই ধর্তব্য হবে।"—হিদায়া।

ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিভিন্নতার দরুন সৃষ্ট মোকদ্দমা

যখন স্বামী-স্ত্রী বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী হয় কিংবা উভয়ের মধ্যে কোন একজন দারুল হারব[১] ছেড়ে দারুল-ইসলামের দিকে হিজরত করে তখন এ নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং পরিণামে মামলা-মোকদ্দমা দেখা দেয়াও বিচিত্র নয়। এ সম্পর্কে হাদীস ও ফিকাহর কিতাবে বিশদ আলোচনা-সমালোচনা বর্তমান। এখানে শুধু একটি বিষয়ে মসলার বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছি।

মসলা : ১

স্বামী এবং স্ত্রী দু'জনের মধ্যে যদি কেউ মুসলমান হয়ে যায় এবং দারুল-হারব পরিত্যাগ করে দারুল-ইসলামে উপস্থিত হয় তখন তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আর বজায় থাকে না। আমাদের ইমামদের এটাই অভিমত। কিন্তু ইমাম শাফে'য়ীর মতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় থাকে। হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা)-এর হাদীস এক্ষেত্রে ইমাম শাফে'য়ীর দলীল। সংক্ষিপ্তভাবে তা এই :

রসূল আকরাম (সা)-এর কন্যা হযরত যয়নব (রা) স্বীয় স্বামী আবুল 'আসকে মক্কায় রেখে মদীনায় চলে আসেন। ছ'বছর পর আবুল 'আস মুসলমান হয়ে মদীনায় এসে উপস্থিত হন। রসূল (সা) নতুন বিবাহ ব্যতিরেকেই যয়নবকে আবুল 'আসের নিকট সোপর্দ করেন। অন্যদিকে হানাফী ইমামদের দলীল হযরত 'আবদুল্লাহ্ বিন 'উমর (রা)-এর হাদীস যেখানে নতুন বিয়ের পরই শুধু যয়নবকে রসূলুল্লাহ্ (সা) আবুল 'আসের নিকট সোপর্দ করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দু'টি বর্ণনাই তিরমিযী শরীফে বর্তমান।

উল্লিখিত বিপরীতমুখী বর্ণনার জবাবে গ্রন্থকারের বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নরূপ :

—গ্রন্থকারের মতে, হযরত 'আবদুল্লাহ্ বিন 'আব্বাস (রা)-এর হাদীস আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন—মুহাম্মদ বিন ইসহাক দাউদ বিন হুসায়ন থেকে—তিনি 'ইকরামা থেকে এবং 'ইকরামা হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে 'আব্বাসের বর্ণনা মতে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা যয়নবকে নতুন বিয়ে ব্যতিরেকে প্রথম বিয়ের উপরই আবুল 'আসকে সমর্পণ করেছিলেন। অপর পক্ষে 'আবদুল্লাহ্ বিন 'উমর (রা)-এর হাদীস আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ও ইমাম আহমদ হাজ্জাজ বিন আরতাতের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। হাজ্জাজ বিন আরতাত 'আমর বিন শু'আয়বের নিকট থেকে—'আমর তার পিতা শু'আয়বের নিকট থেকে—এবং তাঁর দাদা 'আবদুল্লাহ্ বিন 'আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সা) নতুন বিয়ের পরই শুধু যয়নবকে আবুল 'আসের নিকট সমর্পণ করেছিলেন। ইমাম তিরমিযী আরও বলেন : বিয়ের নতুন দেন-মোহ্রও ধার্য করা হয়েছিল। দু'টি হাদীসের ক্ষেত্রেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে ইতিপূর্বে যা বলা হ'ল। শেখ 'আলাউদ্দীন জওহারুন্নকীর মতে—ইবনে 'আব্বাসের হাদীস বর্ণনাকারীর অন্যতম রাবী মুহম্মদ বিন ইসহাক সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। তদুপরি দাউদ ইবনুল হুসায়ন দুর্বল ব্যক্তি এবং তার সম্পর্কে ইবনুল মদীনী বলেন—'ইকরামা থেকে তিনি যা বর্ণনা করেন তা স্বীকৃত নয় বরং পরিত্যক্ত। আবু দাউদ বলেন : দাউদ ইবনুল হুসায়ন 'ইকরামা থেকে যা বর্ণনা করেন তা কাল্পনিক ও মনগড়া ও আজগুবী। ইমাম যাহাবী মীযানুল ই'তিদাল গ্রন্থেও এরূপই বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন—ইমাম তিরমিযী উল্লিখিত সূত্র ছাড়া আর কোন সূত্র বর্ণনা করেননি এবং সম্ভবত ইবনুল হুসায়ন সম্পর্কে জানার আগেই তা বর্ণনা করেছেন। যাই হোক ইবনে 'আব্বাস (রা)-এর হাদীস মুহাদ্দিসগণের নিকট পরিত্যক্ত এবং এর উপর আমল করা যাবে না। 'আবদুল্লাহ্ বিন 'আমর (রা)-এর হাদীস ইসলামের রীতি ও বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইস্তিযকার গ্রন্থেও

বিয়ে নবায়নের কথা বলা হয়েছে। ইমাম শা'বীও তাই বলেন। ইবনে 'আব্বাস (রা)-এর অন্য হাদীসে বলা হয়েছে:

اذا اسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه رواه البخارى -

অর্থাৎ—যদি কোন খৃীস্টান মহিলা তার স্বামীর কিছু আগেও ইসলাম কবুল করে তবে মহিলা তার স্বামীর জন্যে হারাম হবে। ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যা হোক ইবনে 'আব্বাসের হাদীস বিশুদ্ধ হলেও তা সমস্ত 'উলামায়ে কিরামের নিকট বাতিল ও মনসূখ। এব্যাপারে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। কেননা আবুল 'আস কাফের ছিল আর মুসলিম নারীর জন্যে কাফির স্বামী হালাল নয়। ইমাম শা'বীর মতে কোন কাফির স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের পর স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে 'ইদ্দত অতিক্রান্ত হবার পর নতুন বিয়ে ব্যতীত পূর্বতন স্বামী তার জন্যে বৈধ নয়।

قال صاحب التمهيد بعد ذكر حديث ابن عباس رض ان صح فهو متروك منسوخ عند الجميع ويدل على انه منسوخ اجمع العلماء على ان ابا العاص كان كافرا وان المسلمة لا تحل ان تكون زوجة كافرة قال الشعبى ولا خلاف بين العلماء فى الكافرة تسلم فيابى زوجها الاسلام حتى تنقضى عدتها انه لا سبيل له عليها الا بنكاح جديد -

ইমাম আবু হানীফা (রা) এবং তাঁর অনুসারীরা 'আমর বিন শু'আয়বের হাদীসের উপর আমল করছেন যেখানে বলা হয়েছে:

وان احد الحربيين اذا اسلم وخرج الينا وبقى الاخر بدار الحرب وقعت الفرقة باختلاف الدارين -

لقوله تعالى: فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ - لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ - سورة ممتحنة -

"যদি দারুল হারবের কেউ ইসলাম গ্রহণের পর আমাদের দারুল ইসলামে চলে আসে তবে দেশের পার্থক্যের কারণে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হবে। দলীল: সূরা মুমতাহানায় আল্লাহ্ বলেন: তাহাদিগকে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট ফেরত পাঠাইও না বিশ্বাসী নারীগণ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে বৈধ নহে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারিগণও বিশ্বাসী নারীদিগের জন্যে বৈধ নহে।" সূরা মুমতাহানা:

ইমাম শাফে'য়ী (রা)-এর মতে যদি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বহাল থাকে তবে তারাই তো এর বেশী হকদার। আল্লাহ্ পাক বলেন:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

"অতঃপর তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিলে তোমাদিগের কোন ক্ষতি হইবে না।" প্রথম বিয়েই যদি বাতিল না হয়ে থাকে তবে বিয়ের প্রশ্ন আসে কেমন করে? আল্লাহ্ পাক আরও বলেন:

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ.

"তোমরা অবিশ্বাসী নারীদিগের সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখিও না।" অতএব নির্দ্বিধায় আমরা ইমাম আবু হানীফা (রা)-এর মতকে অগ্রাধিকার দিতে পারি।

চতুর্থ:—দুধপান সম্পর্কিত মোকদ্দমা; পঞ্চম: বংশ সম্পর্কিত মোকদ্দমা; ষষ্ঠ: লি'আন (স্বামী নিজ স্ত্রীকে যিনার দায়ে অভিযুক্ত করলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে লি'আন বলে) সম্পর্কিত মোকদ্দমা; সপ্তম: তালাক সম্পর্কিত মোকদ্দমা; অষ্টম: তালাক ঝুলিয়ে রাখা সম্পর্কিত মোকদ্দমা।

মাসলা:

যদি স্বামী-স্ত্রীর ভেতর 'নফসে শর্ত' সম্পর্কে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়—অর্থাৎ স্ত্রী যদি শর্তের দাবীদার হয় আর স্বামী যদি তা অস্বীকার

করে অথবা শর্তের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দেয় যেমন, স্ত্রী দাবী করছে শর্ত নিশ্চিত হয়ে গেছে কিন্তু স্বামী শর্তের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে অস্বীকৃতি জানায়, উভয়ক্ষেত্রেই স্ত্রীকে সাক্ষ্য পেশ করতে হবে। যদি সাক্ষী না থাকে তবে স্বামীর নিকট হলফ নিতে হবে। হলফ নেয়ার পরই শুধু হলফ মাফিক কোন এক পক্ষে মামলার ডিগ্রী প্রদান করা যাবে। বাহরুররায়েক ও রদ্দুল মুহ্‌তার দেখুন।

وإذا اختلفا في وجود الشرط وتحققه فالقول قوله والبينة بينتها۔

"আর যদি উভয়ের মধ্যে শর্তের অস্তিত্ব ও নিশ্চয়তা সম্বন্ধে মতভেদ ঘটে তবে স্বামীর বক্তব্য গ্রহণ করা এবং স্ত্রীকে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে।"

ইদ্দত সম্পর্কে বিভিন্ন মোকদ্দমা

মসলা : ১

ঋতুবতী স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে তার 'ইদ্দত'[১] তিন হায়েযকাল পর্যন্ত। আল্লাহ্ পাক বলেন:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ۔

"আর তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন হায়েযকালীন সময় পর্যন্ত 'ইদ্দত' পালন করিবে।" যদি কোন মহিলা ৬০ দিনের পূর্বেই 'ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার দাবী করে তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

اقل مدة تنقضى فيها ثلاثة قروء ستون يوما عند ابى حنيفة كما صرح بذالك العلامة العينى فى عمدة القارى والشيخ ابن الهمام فى الفتح۔

টীকা ৫৬—১ স্বামী মারা গেলে কিংবা তালাক দিলে স্ত্রীকে পরবর্তী বিয়ের পূর্বে একটা নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করতে হয়। শরীয়তের পরিভাষায় তাকেই 'ইদ্দত' বলা হয়।—অনুবাদক।

আল্লামা 'আয়নী তাঁর 'উমদাতুল কারী' নামক গ্রন্থে এবং ইমাম ইবনুল হুমাম তার 'ফত্‌হ্‌' নামক গ্রন্থে বলেন: তিন হায়েযের কমতম সময়সীমা ইমাম আবূ হানীফার নিকট ৬০ দিন।"

স্ত্রীকে খোরপোশ দেয়া সম্পর্কিত মোকদ্দমা

(নোট: দেওয়ানী মোকদ্দমার তালিকাসূচী অত্যন্ত দীর্ঘ ও বিস্তৃত। ফিকাহ্‌র كتاب الوكالة - كتاب الكفالة - كتاب الرهن كتاب الشفعة - كتاب الاجارة - كتاب البيوع - كتاب الفرائض - كتاب الحجر - كتاب المساقات - كتاب المزارعة - كتاب الشركة ইত্যাদি দেখুন।)

আরীফ সম্পর্কে

'আরীফ' আমাদের দেশে শ্রীপঞ্চ ও চৌধুরীদের বলা হয়। প্রতিটি পরগণা ও গোত্রে একজন 'আরীফ নিযুক্ত করা প্রয়োজন যিনি খিলাফত ও ইসলামী হুকুমত এবং পরগণা ও গোত্রগুলির মাঝে সংযোগ রক্ষাকারীর দায়িত্ব পালন করবেন। এটাও হুকুমত ও খিলাফতের প্রয়োজনীয় কর্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত। খলীফা যদি সমীচীন মনে করেন তবে প্রতিটি গ্রামে একজন গ্রাম-সর্দার নিযুক্ত করবেন। বুখারী শরীফের سباب احلين حتى يرفع اليناعرفاءكم الحديث অধ্যায়ে আছে এবং

قال النبى ص ان العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء فى النار-

নবী করীম (সা) বলেন: নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব অধিকার বিশেষ। জনগণের জন্যে অবশ্যই 'আরীফ থাকতে হবে। (দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধির বাইরে ন্যায় ও ইনসাফ বিচ্যুত হলে) 'আরীফ দোযখী হবে।

রাষ্ট্রীয় ভাতা মাসোহারা প্রসঙ্গে

পুলিশ ও চৌকিদার বিভাগ

পুলিশ ও চৌকিদার বিভাগ নামে কোন স্থায়ী বিভাগ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে ছিল না। আর তখন এর প্রয়োজনই বা ছিল কোথায়? তখনকার অবস্থা তো এই ছিলো যে, 'জনৈক ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয় এবং দৌঁড়িয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে এসে উপস্থিত হয়। আরজ জানায়, হে আল্লাহ্‌র রসূল! اقم علی حد الله। "আমাকে আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবিক শাস্তি দিন। আমি অত্যন্ত কঠিন পাপ করেছি।" বুখারী ও মুসলিম শরীফের 'ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে ইসলামী বিধান' (باب حد الزنا) শীর্ষক অধ্যায় আপনারা নিজেরাই পড়ুন এবং সাহাবাদের তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতি সম্পর্কে অবহিত হন। হযরত মা'ইয (রা) যিনি একজন অত্যন্ত সাধারণ স্তরের সাহাবী ছিলেন—গোনাহ্‌তে লিপ্ত হন। পরে অনুতপ্ত হন এবং হুযুর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবিক শাস্তিদানের জন্য আরজ জানান। হুযুর (সা) তাঁকে ফেরত পাঠাবার বহু চেষ্টা পান। অবশেষে বাধ্য হয়ে তাকে প্রাপ্য শাস্তি দানের নির্দেশ দেন। আল্লাহ্‌র বান্দা অপরিসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে ভয়াবহ শাস্তি বরদাশ্‌ত করতে থাকেন এবং অবশেষে নিজের জীবন দিয়ে নিজকৃত পাপের কাফ্‌ফারা আদায় করেন। আপনি সহীহ্ হাদীস গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করুন এবং নিজেই বলুন—দুনিয়ার ইতিহাসে অনুরূপ নযীর আর একটাও আছে কি? যদি পান তবে তাও সাহাবাদের পবিত্র জীবনেই পাবেন। আর তা হাদীসের কিতাবাদির ভেতরেই। গভীরভাবে লক্ষ্য করুন—সেখানে কোন পুলিশ ছিলো না—আর না ছিলো তার কোন সাক্ষী। হ্যাঁ! ছিলো বটে আর তা হলো একমাত্র আল্লাহ্‌ভীতি। এরূপ একটি দল ও গোষ্ঠী যাদের একজন সাধারণ সদস্যের অবস্থা যদি এই হয়, তবে তাদের জন্য পুলিশ বিভাগেরই বা প্রয়োজন হবে কেন? অবশ্য বিশেষ বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে স্বয়ং হুযুর আকরাম (সা)-এর পবিত্র সত্তা কাফির, য়াহুদী মুনাফিকদের প্রেরিত গুপ্তঘাতকের হাত থেকে হিফাজত ও নিরাপত্তা

বিধানের স্বার্থে কোন কোন সাহাবীর দ্বারা পাহারাদারীর দায়িত্ব পালন করা হতো।[১] সীরত সংক্রান্ত সকল পুস্তকে এ সম্পর্কে একটি স্থায়ী অধ্যায় বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত 'উমর (রা)-এর যুগে উক্ত বিভাগের সর্বপ্রথম বুনিয়াদ স্থাপিত হয়। হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর যুগে যিয়াদ এ বিভাগ-টির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। চার হাজার লোক পুলিশ বিভাগে ভর্তি করা হয়, যার কর্তৃত্ব দেয়া হয় 'আবদুল্লাহ বিন হিস্‌নকে। এরূপ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য যাই হোক তথাপি এ-বিভাগের দ্বারা শান্তি-শৃংখলা পরিস্থিতির এত দূর উন্নতি হয় যে, রাস্তায় যদি কারও কোন জিনিষ পড়ে যেত—তবুও কোন ব্যক্তি হাত দিয়ে তা স্পর্শও করতো না। মহিলারা ঘরের দরজা খুলে রাতের বেলায় ঘুমুতো। যিয়াদ নিজেই বলতেন, "যদি আমার এবং সুদূর খোরাসান প্রদেশের মাঝে একটি রশিও হারিয়ে যায় তবে সাথে সাথেই রশি গ্রহণকারী ব্যক্তিটির নামও আমি জানতে পারবো।" শান্তিপ্রিয় ও ভদ্রলোকদের হিফাজত করা এবং অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ক্ষতিকর লোকদের দমনে সরকারের সাথে সবরকমের সহযোগিতা করাই হবে ইসলামের দৃষ্টিতে পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অন্য কথায়—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। পুলিশের প্রতিটি ফাঁড়ি তথা প্রতিটি থানায় একটা রেজিস্টার থাকবে যাতে পার্শ্ববর্তী সমস্ত চোর, গুণ্ডা ও বদমা'শ লোকদের নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকবে। হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) এ বিভাগে আরও একটি সংযোজন করেন এবং তা সন্দেহজনক লোকের চাল-চলন ও গতিবিধি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তিনি দামেশকে হযরত আবু দারদা (রা)-কে লিখিতভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি সেখানকার সমস্ত বদমা'শ লোকের নাম লিখে পাঠিয়ে দেন।

নোট : ১ অবশ্য والله يعصمك من الناس অর্থাৎ "আল্লাহই তোমাকে শত্রুদের হাত হইতে রক্ষা করিবেন" আয়াতটি নাযিল হবার পর পাহারাদারী বন্ধ করার রসূল (সা) আদেশ দেন।—অনুবাদক।

দ্বিতীয়

গোয়েন্দা বিভাগ

গোয়েন্দা বিভাগ তথা ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, সি. আই. ডি. (Criminal Investigation Deptt.) ইত্যাদি সম্পর্কে হাদীস গ্রন্থে এদের শ্রেণী বিভাগ এবং এর বিভিন্ন অধ্যায় বর্তমান। এ সম্পর্কে স্থায়ী বিভাগের পত্তন শুরু হয় হযরত 'উমর (রা)-এর খিলাফতকালে। এ বিভাগের দায়িত্ব ছিলো কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার জুলুমের সংবাদ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং তা যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে খলীফাকে অবহিত করা। কানযুল 'উম্মাল নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে : كان لعمر عيون على الناس অর্থাৎ হযরত 'উমর (রা) লোকদের উপর গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিলেন; সর্বত্রই তিনি পত্র লিখক এবং ঘটনার বিবরণ দানকারী ও তথ্য সরবরাহক ও সংগ্রাহক নিযুক্ত করেছিলেন। ঐতিহাসিক তাবারী লিখেছেন :

وكان عمر لا يخفى عليه شيء في عمله كتب اليه العراق بخروج من خرج ومن الشام بجائزة اجيز فيها .

অর্থাৎ হযরত 'উমর (রা)-এর কাছে খিলাফতের কর্মচারীদের কোন বিষয়ই গোপন ছিল না। গোয়েন্দারা সব কিছুই তাঁকে লিখে জানাতেন। এমনকি ইরাক থেকে কোন লোক বের হলেও তার গতিবিধির উপর নজর রাখা হতো ও তদারকী করা হতো। সিরিয়া থেকে বহির্গত ও আগত লোকদের উপরও দৃষ্টি রাখা হতো।

তৃতীয়

পরিদর্শন বিভাগ

এ বিভাগের প্রকৃত উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের দেখাশোনা এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সমালোচনার মাধ্যমে সংশোধন। যেমন : কোন ব্যক্তি সরকারী রাস্তার উপর যেন ঘর-বাড়ী বানাতে না পারে, কোন ব্যক্তি বেচা-কেনার মধ্যে ধোকা-প্রতারণা ও ভেজাল না মিশ্রিত করতে পারে অথবা প্রকাশ্যে মদ বিক্রী

না করতে পারে। খলীফা হযরত 'উমর (রা) এ বিভাগটি সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং এ বিভাগের সকল কাজ যাতে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হতে পারে সেজন্য কতিপয় পদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। মুয়াত্তা ইমাম মালিক নামক হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত 'উমর (রা) হাট-বাজার তদারকী ও নিয়ন্ত্রণের জন্য হযরত 'আবদুল্লাহ্ বিন উতবা (রা)-কে প্রধান দায়িত্বে নিযুক্ত করেন এবং হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদকে তার সহকারী নিযুক্ত করেন। এছাড়া আরও অনেক লোক এতে নিয়োজিত ছিলেন যাদের দায়িত্ব ছিলো অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং ওজনের ক্ষেত্রে কম-বেশীসহ বিভিন্নরূপে কারচুপির তদারকী করা।

চতুর্থ

ডাক বিভাগ

জনাব রসূলে মকবুল (সা) এ বিভাগের বুনিয়াদ স্থাপন করেন; রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র দরবার থেকে যে সব চিঠিপত্র পাঠানো হতো তার উপর তিনি সীলমোহর দিতেন। এতদুদ্দেশ্যেই তিনি একটি মোহরাংকিত অংশ তৈরী করিয়ে নেন। সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে :

اراد النبى صلعم ان يكتب الى كسرى وقيصر والنجاشى فقيل انهم لا يقبلون كتابا الا بخاتم نصاغ رسول الله صلعم خاتما الحديث -

অর্থাৎ নবী করীম (সা) রোম ও পারস্য সম্রাট, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশীর নিকট পত্র পাঠাতে ইচ্ছুক হলে রসূল (সা)-কে বলা হলো— 'অনারব কোন সম্রাট কিংবা বাদশাহ সীলমোহরাংকিত পত্র ছাড়া অন্য কোন প্রকার চিঠিপত্র গ্রহণ করেন না।' এরপর রসূলে করীম (সা) একটি মোহরাংকিত আংটি তৈরী করিয়ে নেন। সহীহ্ বুখারীতে বলা হয়েছে :

ان نقش الخاتم ثلاثة اسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر -

অর্থাৎ মোহরাংকিত আংটিতে তিনটি লাইন ছিলো। 'মুহাম্মদ' এক লাইনে, দ্বিতীয় লাইনে 'রসূল' এবং তৃতীয় লাইনে 'আল্লাহ্' শব্দটি ছিলো। পরে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথেই ডাক বিভাগের প্রভূত পরিমাণে উন্নতি সাধিত হয়। ইমাম আবু ইউসুফ (রা) কিতাবুল খারাজে লিখেছেন:

وتامر باختيار الثقات العدول من اهل كل بلد ومصر فتوليهم البريد والاخبار ويجرى لهم الرزق من بيت المال.

অর্থাৎ 'খলীফা ডাক বিভাগ বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ লোকের হাতে সমর্পণ করবেন এবং বায়তুলমাল থেকে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবেন।'

পঞ্চম
সেক্রেটারিয়েট বা দফতর বিভাগ

এ বিভাগটিকে রাষ্ট্রের জীবন ও আত্মাস্বরূপ বলা হয়। নবী করীম (সা)-এর যুগে এ সম্পর্কে কোন স্থায়ী বিভাগ সৃষ্টি হয়নি। তবুও চিঠি-পত্র ও ফরমানাদির কারণে এর প্রাথমিক কাঠামো তখনই তৈরী হয়ে গিয়েছিলো। হযরত যায়িদ বিন ছাবিত (রা) এবং হযরত মুআবিয়া (রা) একাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। এ দু'জন সাহাবা ছাড়াও আরও অনেক সাহাবাই সময় সময় প্রয়োজন মাফিক এ দায়িত্ব পালন করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গের নিকট যে সমস্ত চিঠি-পত্র পাঠিয়েছিলেন; অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সাথে যে সব সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছিলেন, মুসলিম গোত্র ও সম্প্রদায়গুলির প্রতি যে সব নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, কর্মচারী ও রাজস্ব আদায়কারীদের যে সমস্ত লিখিত ফরমান দিয়েছিলেন, সৈন্যদের জন্য যে স্থায়ী রেজিস্টার প্রস্তত করেছিলেন এবং কতক সুহাবাকে দিয়ে যে সব হাদীস লিখিয়েছিলেন—তা সবই এর অন্তর্গত।

ইমাম যারকানী হুযূর (সা)-এর লিখিত নির্দেশ ও ফরমানাদির একটি স্থায়ী অধ্যায় সৃষ্টি করেন। হযরত ফারূকই-আ'জম (রা) এ বিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। বর্তমান পুস্তকে বিচার বিভাগীয় ও রাষ্ট্রীয় দফতর সম্পর্কে অল্পবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। রুদ্দুল মুহতার, বাহরুর্রায়েক, আল-বিনায়াহ, ফতহুল কাদীরসহ ফিকাহ্‌র কিতাবাদির বিভিন্ন স্থান দফতর ও সেক্রেটারিয়েট সম্পর্কে আলোচনায় সমৃদ্ধ। এতদসম্পর্কিত হুকুম-আহকাম ও তার শাখা-প্রশাখার বিস্তারিত বর্ণনাও ফিকাহ্‌র কিতাব-গুলিতে বিদ্যমান।

কেবলমাত্র দফতরের গুরুত্ব বুঝাবার তাগিদে ইবনে খলদুনের মুকাদ্দমা থেকে উদ্ধৃতি পেশ করা হলো। ইবনে খলদুন বলেন ঃ

"স্মরণ রাখবে, রাষ্ট্রের জরুরী কার্যাবলীর মধ্যে কর আদায়ের ব্যবস্থাপনা এর অন্তর্ভুক্ত। এতদ্‌সঙ্গে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃবিভাগীয় প্রাপ্য ও প্রাপ্ত রাজস্বের হিফাজত, সেনাবাহিনীর নাম রেজিস্ট্রিকরণ, তাদের রসদপত্র নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় গৌরব বৃদ্ধিকল্পে তাদের কাজের স্বীকৃতি ও পুরস্কারের ব্যবস্থাকরণও এর অন্তর্গত। এতে সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষক এবং উল্লিখিত সকল কার্যাবলীর প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক প্রণীত ও সন্নিবেশিত নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা সমীচীন। উক্ত নিয়মাবলী, অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিভাগীয় বিষয়াবলী তার নির্দিষ্ট নিয়মাবলী সুস্পষ্ট বিবরণসহ লিপিবদ্ধ থাকবে। এর ভিত্তি হবে বড় ও বিরাটাকারের হিসাব-নিকাশের উপর। একমাত্র উক্ত কার্যাবলী সংক্রান্ত অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তিবর্গই তা নিয়ন্ত্রণে সমর্থ ও সক্ষম হবেন। উক্ত লিপিবদ্ধ বিভাগটিকেই দিওয়ান' বলা হয়। অনুরূপভাবে উপরিউক্ত কার্যাবলীর সাথে জড়িত কর্মচারীবৃন্দের অবস্থান নির্ধারণও এর অন্তর্গত।

ইসলামী খিলাফতে দিওয়ান বা দফতর বিভাগ হযরত 'উমর (রা) সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। তিনি 'আকীল বিন আবূ তালিব, মাখরামা বিন নওফল ও যুবায়র বিন মুত্'ইম (রা)-কে যাঁরা কুরায়শদের শিক্ষিত লোকদের অন্তর্গত ছিলেন—নির্দেশ দেন যেন তারা দফতর কায়েম করেন। অতঃপর তাঁরা দিওয়ানে আসাকীর বা ইসলামী সৈন্যদের দফতর প্রণয়ন

করেন এবং রসূল (সা)-এর নৈকট্যলাভে এবং আত্মীয়তাসূত্রে যে যত বেশী নিকটতম ছিলেন—তাঁদের প্রাধান্য ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সবার মধ্যে ভাতা বন্টন করেন। আর ভাতা বন্টন ছিলো রাষ্ট্রের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ।"

ষষ্ঠ

শিক্ষা বিভাগ

এ বিভাগ সম্পর্কে বেশী বলতে যাওয়া নিরর্থক। সমগ্র কুরআন শরীফ এবং নবী করীম (সা)-এর সকল হাদীস গ্রন্থাদি শিক্ষা লাভ ও বিদ্যার্জন এবং শিক্ষা প্রদান সম্পর্কে উৎসাহ দান ও এর ফযীলত বর্ণনায় ভরপুর। মুসলমানদের নিকট আজ হাদীস, তফসীর, ফিকাহ্, উসূল, বালাগত (অলংকার শাস্ত্র ও শব্দ প্রকরণ), মানতিক (তর্ক-শাস্ত্র বা যুক্তি বিদ্যা), ফালসেফা (দর্শন), ইতিহাস, ভূগোল,—চিকিৎসা শাস্ত্র, অংক ও হিসাব বিজ্ঞান, 'ইলমে কালাম, নীতিশাস্ত্র, তাসাওউফ, ধর্মের গোপন রহস্য ইত্যাদি বিষয় ও শিল্পকলা সম্পর্কে বিরাট ভাণ্ডার বিদ্যমান। এ অধ্যায়ে মুসলমানেরাই সাক্ষী ও ন্যায়বিচারের দাবীদার। যদিও প্রথম যুগের মুসলমানদের ন্যায় তা উল্লেখযোগ্য নয়। আল্লাহ্‌র দুশমন তথা গোটা মানবতার দুশমন চেঙ্গীষ খান ও হালাকু খানের বর্বর সেনাবাহিনী এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বরেণ্য 'উলামায়ে কিরাম ও শ্রদ্ধেয় বিদ্বান ও পণ্ডিতমণ্ডলী হত্যা ও ধ্বংসের শেষ সীমায় নামিয়ে অবশেষে ইসলামী পাঠাগার ও লাইব্রেরীগুলি জ্বালিয়ে দেয়। আল্লাহ্‌র দুশমন তথা জ্ঞান ও সংস্কৃতির দুশমন মধ্যযুগীয় বর্বর পণ, খৃস্টীয় ক্রুসেড বাহিনী সমগ্র ইউরোপ ও আফ্রিকা ভূখণ্ডের 'উলামায়ে কেরাম ও সুধী বিদ্বজনদের হত্যা করে এর বিশালায়তন লাইব্রেরী ও পাঠাগারগুলি জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়, একদা যার সাহায্যে অন্ধ-ইউরোপে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছিল এবং যার বদৌলতে আজ তারা গোটা প্রাচ্যভূখণ্ডের সমগ্র জাতিগোষ্ঠীর উপর মাথা উঁচিয়ে আছে! দুঃখ হয়! সে যুগে বাগদাদ, বুখারা, সমরখন্দ, নিশাপুর,

কুফা, বসরা, দামেশ্‌ক, হলব (আলেপ্পো), কর্ডোভা, গ্রানাডা, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতির প্রতিটি শহরে দু'তিন হাজার লাইব্রেরী থাকতো এবং এর প্রতিটি লাইব্রেরীতে তিন থেকে চার লাখ পুস্তকের সংগ্রহ ছিল। এর মধ্যে শত শত কিতাব এমনও ছিল যা মুসলমানদের আল্লাহ্‌প্রদত্ত যোগ্যতা ও প্রতিভার অলৌকিক কর্ম-কৃতিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর ও অকাট্য দলীলরূপে বিবেচিত হতো। উদারণত, তিনটি কিতাবের নাম করা যায়ঃ ১. ইমাম আবু ইউসুফের 'কিতাবুল আমালী' যা ৩৩০ খণ্ডে সমাপ্ত—যার ৫০০টি খণ্ডই ছিলো রাজনীতি বিষয়ক ব্যাখ্যা ও আলোচনায় সমৃদ্ধ; ২. কিতাব 'বাহরুল আসানীদ' যা ইলমুল হাদীস সম্পর্কিত এবং ৫৫০টি বিরাট খণ্ডে সমাপ্ত; ৩. ইমাম তাহাবীর 'আহকামুল কুরআন' যা ১৫০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছিলো। এ ধরনের শত শত কিতাব ও পুস্তকাদি বিভিন্ন বিষয় ও শিল্পকলার উপর লেখা হয়েছিলো দুনিয়া আজ যেগুলি থেকে বঞ্চিত। সে সব হারিয়ে যাওয়ার বেদনা ও দুঃখ শুধু মুসলমানদেরই নয় বরং প্রতিটি সহৃদয় ও বিবেকবান অমুসলিমেরা পর্যন্ত এ জন্যে আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ করে থাকেন। তারাও উদার চিত্তে স্বীকার করেছেন—ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজকের যা কিছু উন্নতি ও অগ্রগতি তার উৎসমূলে আরব মুসলমানেরাই অবস্থান করছেন। 'ইলমে রিয়াযীর (জ্যামিতি, এ্যালজেব্রা) ক্ষেত্রে দ্যোলক, অণুবীক্ষণযন্ত্র ইত্যাদি, দূরবীক্ষণ যার প্রভাব ও পরিণতি আজকের ফটোগ্রাফী, এ্যালজেব্রা, জ্যামিতি ইত্যাদি জ্ঞানের শাখা পুনর্জীবিত করেন মুসলিম আরবরাই। মান-মন্দির বানান এবং নক্ষত্রের গতিবিধি সম্পর্কে নীতি পুনঃনির্ধারণ করেন। স্থাপত্য ও কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ে আজও মুসলমানদের জগদ্‌গুরু মান্য করা হয়। নৌ ও সমুদ্র বিদ্যা এবং তারকারাজির হিসাব ধরে সমুদ্র ভ্রমণের বিষয় অধিকাংশই মুসলমানদের দ্বারা প্রচলিত হয়। প্রকৃতি বিজ্ঞানে মৌলিক বিজ্ঞান (علم الفروق) যার সাহায্যে পানি, বাতাস, যমীন, আগ্নেয়গিরির অত্যাশ্চর্য বিষয়গুলি জানা যায়; মৃত্তিকা বিদ্যা—যার সাহায্যে যমীনের অভ্যন্তরস্থ খনিজ পদার্থের অবস্থাদি, মূল্যবান ধাতব পদার্থ এবং যমীনের অভ্যন্তর ভাগ থেকে সোনা-রূপা বের করবার কলা-কৌশল, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী

ও ঝর্ণাধারা থেকে সৃষ্ট অবস্থাদি প্রতিভাত নয়—সবই মুসলমানদের দান। উদ্ভিদ বিদ্যা যার সাহায্যে বৃক্ষের লাল-সবুজ ফুল আসা, তার বিভিন্ন স্বাদের কারণ এবং মাটি থেকে উদ্গত বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়; প্রাণী বিদ্যা—যার মধ্যে প্রাণী জগতের বিভিন্ন প্রকার পশুপাখীসহ সকল প্রকার প্রাণীর অত্যাশ্চর্য অবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়; ইলমুল কিমিয়া বা রসায়ন বিদ্যা ইংরেজীতে যাকে কেমিষ্ট্রি (Chemistry) বলা হয়—যাতে বিভিন্ন দ্রব্যের রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়—ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গুরু হিসেবে আজও মুসলমানদের মান্য করা হয়ে থাকে। দর্শন, লজিক, চরিত্র ও নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, স্থাপত্য বিদ্যা, ভূগোল, চিকিৎসা শাস্ত্র, ইতিহাস ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখাগুলিকে মুসলমানেরা নবজীবন দান করেন। তারাই পৃথিবীর স্থলভাগের পরিমাপ করেন এবং ইউক্লিডের জ্যামিতির ব্যাখ্যা করেন। টলেমীর (بطلیموس) পঞ্জিকার সংস্কার করেন ও জ্যোতিঃবিজ্ঞানের বিভিন্ন গরমিলের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন করেন; এবং আলোর গতিবেগ সম্পর্কে অবহিত হন। প্রখ্যাত জ্ঞানী ও দার্শনিক স্যাডলিত ইসলামের ইতিহাস নামক গ্রন্থে বলেন: আরব জাতি নিঃসন্দেহে আমাদের অর্থাৎ ইউরোপবাসীদের শিক্ষাগুরু। ডার্বির ইতিহাস—যার প্রণেতা ফ্রান্সের একজন প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী—লিখেছেন: "এমন এক যুগ ছিলো যখন ইউরোপবাসীরা ছিলো অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকারে চরমভাবে নিমজ্জিত। অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই মুসলিম জাতির তরফ থেকে সাহিত্য, দর্শন, শিল্প-কলা, হস্তশিল্প ইত্যাদির এক ঝলক উজ্জ্বল আলোকরেখা তাদের উপর এসে পড়ে এবং তাদের সে আলোক উদ্ভাসিত করে তোলে। কেননা সে যুগে বাগদাদ, বসরা, সমরখন্দ, দামেশ্ক, কায়রোয়ান, গ্রানাডা, কর্ডোভা প্রভৃতি ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-কলা, শিল্প ইত্যাদির কেন্দ্রভূমি। অন্যত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্বগত ও বাস্তব প্রতিফলন যেখানেই ঘটুক না কেন তা ঐ সমস্ত শহরগুলির অবদান। মধ্য যুগে ইউরোপবাসীরা উল্লিখিত শহরগুলি থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-কলা ইত্যাদি নিজেদের দেশে ছেকে নিয়ে যায়।" আর কেনই বা এমন হবে না। আমাদের নবী (সা) ছিলেন

সম্পূর্ণ নিরক্ষর। নব জীবনের প্রথম প্রভাতেই যখন হযরত জিব্রাঈল (আ) এর সাথে সাক্ষাত ঘটে তখন তিনি লাভ করেছিলেন সূরা 'আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত। বলা হয়েছে ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

"পাঠ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হইতে। পাঠ কর, তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন—মানুষকে যাহা সে জানিত না।" আর এ আয়াত-টিই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সার নির্যাস। এর অভ্যন্তরীণ ও নিগূঢ় অর্থ একমাত্র রহস্যজ্ঞানীই জানেন। ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের যে সকল বন্দী আর্থিক অসমর্থতার দরুন নিজেদের মুক্তিপণ দিতে অপারগ হয়েছিল রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের মুক্তিপণ ধার্য করেছিলেন যে, তারা প্রতিদিন মদীনার আনসার বালকদের লেখাপড়া শেখাবে। আনসার বালকদের লেখাপড়ার হাতে খড়ি এদের হাতেই হয়েছিলো। হযরত 'আবদুল্লাহ্ বিন সা'ঈদ ইবনুল আস (রা) অজ্ঞতা ও অন্ধকার যুগেও লেখাপড়া জানতেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নির্দেশ দেন যেন তিনি মদীনার লোকদের লেখাপড়া শেখান। এ ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদার যুগে আরও উন্নতি সাধিত হয়। এ প্রসঙ্গেই হযরত 'উমর ফারূক (রা) সমগ্র বিজিত এলাকাতেই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে মক্তব কায়েম করেছিলেন—যেখানে কুরআন মজীদ, নীতি ও উপদেশ-মূলক কবিতা এবং আরবের বিভিন্ন শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হতো। জেলাগুলিতে বড় বড় সাহাবা হাদীস ও ফিকাহ্ সম্পর্কে শিক্ষা দেবার জন্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন। শিক্ষকদের জন্যে বেতন নির্ধারিত

হয়। 'আল্লামা ইবনুল জওযী 'সীরাতুল 'উমর' (রা) নামক গ্রন্থে বলেন:

ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضـ كان
يرزقان المؤذنين والائمة والمعلمين۔

অর্থাৎ হযরত 'উমর (রা) এবং হযরত 'উছমান (রা) মুয়াযযিন, ইমাম এবং শিক্ষকদের জন্য বেতন-ভাতা নির্দিষ্ট করেছিলেন।" হযরত 'উমর (রা) যাযাবর জাতীয় লোকদের জন্য কুরআন শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছিলেন। ইতদুদ্দেশ্যেই তিনি আবু সুফিয়ান নামে এক ব্যক্তিকে আদেশ দিয়েছিলেন যেন যিনি লোকসহ গোত্রে গোত্রে ঘুরে ফিরে প্রতিটি মানুষের পরীক্ষা নেন এবং যদি এমন কাউকে পাওয়া যায়—কুরআন মজীদের সামান্যতম অংশও যার স্মৃতিতে নেই তাকে যেন শাস্তি দেয়া হয়। মক্তবে লেখা শিখানোর নির্দেশও তিনি দিয়েছিলেন। সাধারণভাবে সমস্ত জেলাতেই তিনি নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে, বালক ও কিশোরদের ঘোড়ায় চড়া ও লেখাপড়া শিখাতেই হবে। 'কানযুল 'উম্মাল' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে—হযরত ফারুক-ই আ'জম (রা) স্বীয় কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন, যারা কুরআন মজীদ শিখেছেন তাদের বেতন নির্দিষ্ট করা হোক। শুধুমাত্র আবু দারদা (রা)-এর শিক্ষাঙ্গনেই ষোলশত ছাত্রর সমাগম হতো। 'আল্লামা শামী রুদ্দুল মুহতারের তৃতীয় খণ্ডে বায়তুলমাল থেকে ভাতাপ্রাপ্তদের তালিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদেরকেও তিনি তাদের অন্যতম হিসেবে গণ্য করেছেন। এর উপর ইবনুল হুমামসহ আরও কতিপয় ফকীহ্ অত্যধিক জোর দিয়েছেন। ইমাম আবু 'উবায়দ 'কিতাবুল আমওয়াল নামক পুস্তকে লিখেছেন:

ان عمر بن خطاب رضـ كتب الى بعض العمال
اعطا لناس على تعلم القرآن۔

অর্থাৎ "হযরত 'উমর (রা) তার জনৈক কর্মচারীকে লিখে পাঠান: লোকদের কুরআন শিক্ষার জন্য যেন ভাতা দেয়া হয়।" এখন এমন একটি শিক্ষার ব্যবস্থা যেখানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই সরকারী ভাতা ও বৃত্তি

পায়—অন্য আর একটি শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে তুলনা করুন—যেখানে শিক্ষার্থীকে ফিস ও বেতন প্রদান করতে হয়—তাহলে তখনই আপনার সামনে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার অনুপম বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ধরা পড়বে।

খাজনা ট্যাক্স ইত্যাদি আর্থিক আয়ের উদ্দেশ্য এবং এর বিভিন্ন অধ্যায়

বায়তুল মাল এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াদি

ইসলামী অর্থনীতি ব্যবস্থা বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে হুকুমতে-রব্বানীয়া তথা রবুবিয়তের দর্শন ও আদর্শভিত্তিক ইসলামী খিলাফতের জন্যে সরকারী অর্থভাণ্ডারের অস্তিত্ব অপরিহার্য। উক্ত অর্থভাণ্ডারের নিরাপদ ও সংরক্ষিত স্থানকেই ইসলামী পরিভাষায় 'বায়তুলমাল' বলা হয়। কেন্দ্রীয় বায়তুলমালের প্রাদেশিক ও জেলাওয়ারী শাখাও স্থাপিত হয়ে থাকে। এর দ্বারা সে স্থানীয় চাহিদা পূরণের যামিনদার হিসেবে কেন্দ্রীয় বায়তুল-মালের নির্দেশ মুতাবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। বায়তুলমাল আইনানুগ খিলাফতের সেই সব আয়-আমদানীর বাহক হয়ে থাকে যা ইসলামী বিধান মুতাবিক সরকারী অর্থভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত। ঠিক অনুরূপভাবেই বায়তুল-মাল ঐ সমস্ত ব্যয় নির্বাহেরও যামিনদার যা ব্যক্তি এবং সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য অপরিহার্য। বায়তুলমালের উপার্জিত ও আমদানীকৃত সকল অর্থ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলাদা আলাদা চারটি ভাণ্ডার ঘর স্থাপন করা উচিত। চারটি আলাদা অফিস এবং এর জন্য স্বতন্ত্র রেজিস্টারও থাকবে। ইসলামী বিধান শাস্ত্রের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'শামীর' দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে এবং ফিকাহ্‌র অন্যান্য কিতাবাদিতেও এ সম্পর্কিত সকল কিছু বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বায়তুলমালের আয়ের উৎস ছিলো নিম্নরূপ ঃ

১. বায়তুলমালের প্রাপ্য এক-পঞ্চমাংশ যা যুদ্ধলব্ধ গণীমতের মাল ও খনিজ-সম্পদ থেকে রাষ্ট্রের প্রাপ্য হিসাবে পাওয়া যায়। তাতারখানিয়া কিতাবে এর উল্লেখ আছে।

২. অর্থ ও বিভিন্ন সম্পদের উপর ধার্যকৃত যাকাত, উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ ইসলামী পরিভাষায় যাকে 'উশর' বলা হয়, ব্যবসায়ীদের লভ্যাংশের উপর এক-দশমাংশ শুল্ক হিসাবে ধার্যকৃত অর্থ। বাদায়ে গ্রন্থে এরূপই বলা হয়েছে।

৩. জমির খাযনা, বনু-নাজরানের গোত্রাধিপতিদের সাথে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত করবার পর যে সম্পদ পাওয়া গিয়েছিলো, বনু তাগলিবের বর্ধিত সাদাকাহ্, দারুল-হারবের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত এবং যিম্মী ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত এক-দশমাংশ শুল্ক, দারুল হারব থেকে প্রাপ্ত উপহার-উপঢৌকনাদি, বিনা যুদ্ধে দারুল হারব থেকে প্রাপ্ত সম্পদ, সৈন্য ও যুদ্ধসম্ভার যুদ্ধে নামানোর আগেই যুদ্ধ না করার শর্তে সন্ধি-চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ এবং যে জমির কোন নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট মালিক নেই অর্থাৎ সরকারই যে সম্পত্তির মালিক, উক্ত সম্পত্তির ভাড়া কিংবা লব্ধ আয় ইত্যাদি।

৪. উপরি-উক্তরূপ সম্পদের অতিরিক্ত প্রাপ্ত লব্ধ সম্পদ দ্বারা গঠিত বায়তুল মাল। 'আল্লামা শামী 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে এর ব্যাখ্যায় বলেন। অতিরিক্ত সম্পদ বলতে সেই সব সম্পত্তি ও সম্পদ বুঝাবে যার কোন ওয়ারিস নেই—কিংবা এমন কোন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ—যার কোন অভিভাবক নেই—আর এ সবই এই বিভাগের আওতায় আসবে। ইমাম এসবের জন্য আলাদা ঘর করানো এবং নির্দিষ্ট খাতের অর্থ নির্দিষ্ট ঘরে জমা রাখবেন। এক খাতের অর্থ-সম্পদে কর্জস্বরূপ অন্য খাতে ব্যয় নির্বাহের অধিকার থাকবে।

উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্ট চারটি শাখাই কেন্দ্রীয় বায়তুল-মালের অধীনে থাকবে। বায়তুল মালের রেজিস্টার ও ক্যাশবুক হবে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। হযরত ফারুক-ই আ'জম (রা)-এর যামানায় বায়তুল-মালের রেজিস্টার ও ক্যাশবুক অত্যন্ত স্বচ্ছ, নিখুঁত ও বিস্তারিতভাবে তৈরী ও সংরক্ষণ করা হতো। এমনকি সাদাকা ও যাকাতের উট আসা মাত্রই তার বয়স ও রং ইত্যাদি পর্যন্ত উল্লেখপূর্বক লিখিত হতো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বায়তুল-মালের ব্যয়ের খাতসমূহ

لا يجوز دفع الزكوة والعشر الى الذمى وجاز دفع غيرهما اليه الخ.

অর্থাৎ যাকাত ও 'উশর থেকে প্রাপ্ত অর্থ ও সম্পদ যিম্মী এবং কাফিরদের জন্য ব্যয় করা জায়েয নয়। এছাড়া বাকী অন্যান্য খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ ও লব্ধ আয়—চাই কি তা বাধ্যতামূলক খাতের হোক কিংবা ইচ্ছাধীন যিম্মী ও কাফিরদের জন্য ব্যয় করা জায়েয। বিস্তারিত হেদায়া, ফতহুল কাদীর ইত্যাদি দেখুন। ইমাম যায়লা'ঈ 'নসবুর রায়' নামক গ্রন্থে ইমাম ইবনে আবী শায়বা ও ইবনে যনজাবিয়া কিতাবুল আমওয়াল শীর্ষক গ্রন্থে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন:

قال تصدقوا على اهل الاديان وفى رواية عن محمد بن الحنفية قال كره الناس ان يتصدقوا على المشركين فانزل الله ليس عليك هداهم قال فتصدق الناس عليهم.

'তোমরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও দান-খয়রাত করবে।" হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া থেকে বর্ণিত,—তিনি বলেছেন: লোকেরা কাফির মুশরিকদের দান-খয়রাত করাকে খারাপ জানে। এজন্যেই এ আয়াত নাযিল হয়— ليس عليك هداهم অর্থাৎ 'তোমাদের এ দায়িত্ব নয় যে, তোমরাই লোকদের হিদায়েত করবে।" তিনি এরপর সবাইকে বললেন,—"তোমরা লোকদেরকে তাদের জন্যও দান খয়রাত করতে বল।' 'আল্লামা শামী ব্যয়ের খাত সম্পর্কিত অধ্যায়ে 'আস-সিয়ারুল কবীর' থেকে উদ্ধৃতি দেন:

قال محمد لا باس للمسلم ان يعطى كافرا حربيا او ذميا وان يقبل الهدية منه لما روى عن النبى صلعم

...ث خمس مائة دينار الى مكة حين قحطوا وامر
...ر دفعها الى سفيان بن حرب وصفوان بن امية ليفرقا
...على فقراء اهل مكة ولان صلة الرحم محمودة فى
...كل دين والاهداء الغير من مكارم الاخلاق الخ.

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ

দারুল হারবের কাফির ও যিম্মীদের দান-খয়রাত করতে মুসলমানদের কোন দোষ নেই এবং দোষ নেই তাদের তরফ থেকে পাঠানো উপহার উপঢৌকন গ্রহণ করাতেও। যেহেতু রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ৫০০ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে আবু সুফিয়ান বিন হারব এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়ার নিকট পাঠিয়েছিলেন যেন তা দুঃস্থ দুর্গত লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কেননা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন প্রতিটি ধর্মেই প্রশংসিত কাজ। অন্যকে উপহার-উপঢৌকন পাঠানো উন্নত ও মহৎ চরিত্রের পরিচায়ক।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

১ম :

প্রথমোক্ত প্রকার সম্পদের ব্যয়ের খাতসমূহ ঃ অর্থাৎ গনীমতের মাল, খনিজ ভাণ্ডার থেকে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ ইত্যাদির ব্যয়ের খাত প্রধানত তিনটি ঃ ক. অভাবী পিতৃহীন শিশু, খ. মিসকীন এবং গ. মুসাফির। আল্লামা শামী বলেন ঃ

يصرف ما فى هذا البيت لليتامى المحتاجين
والمساكين وابن السبيل فتقسم عندنا ثلاثا ويقدم
...فقراء ذوالقربى انتهى وجاز صرفه لصنف واحد
...كما فى البحر.

অর্থাৎ এমত প্রকার সম্পদ অভাবী, পিতৃহীন শিশু, মিসকীন এবং মুসাফিরের জন্য ব্যয় করতে হবে। আমাদের মতে (অর্থাৎ হানাফী মযহাবের মতে) এই তিন প্রকার লোকের মধ্যেই বণ্টন করতে হবে এবং

গরীব দরিদ্র নিকটাত্মীয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শুধু এক শ্রেণীর লোকের ভেতর ব্যয়-বন্টন করাও জায়েয। বাহ্‌রুররায়েক কিতাবেও এরূপই লিখিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২য় ঃ

দ্বিতীয় প্রকার অর্থ-সম্পদ অর্থাৎ যাকাত, উশর এবং মুসলিম ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে আদায়কৃত শুল্কের মাধ্যমে প্রাপ্ত একদশমাংশ সম্পদের ব্যয়ের খাতগুলি নিম্নরূপ ঃ

ক. ফকীর,—'আল্লামা শামীর মতে—যার অল্প কিছু আছে কিন্তু সে সাহিবে নেসাব নয়; هو من له ادنى شئ دون نصاب খ. মিসকীন,—একদম নিঃস্ব; গ. উক্ত বিভাগের নিযুক্ত কর্মচারী; ঘ. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যার পক্ষে ঋণ পরিশোধ করা অত্যন্ত কষ্টকর; ঙ. মুসাফির; চ. সাবীলিল্লাহ,—আল্লাহ্‌র পথে এবং আল্লাহ্‌রই জন্যে ও উদ্দেশ্যে। এটি একটি সাধারণ ব্যয়ের খাত। ধর্মীয় শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় এরই আওতাভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী শিক্ষার একজন শিক্ষার্থী, শিক্ষক তথা মুদাররিস, ইসলামী জিহাদ তথা ধর্মযুদ্ধের বীর মুজাহিদ এবং সেই ব্যক্তি যার উপর একদা হজ্জ ফরয ছিলো, বর্তমানে আর্থিক দুরাবস্থার কারণে উক্ত ফরয পালনে কার্যত সে অক্ষম। বাদায়ে গ্রন্থ প্রণেতা বলেন ঃ

وفى سبيل الله يعم جميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله وسبيل الخيرات اذا كان محتاجا.

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (র) কিতাবুল খারাজে আরও একটি খাতের কথা বলেছেন আর তা হলো ঃ ৭. রাস্তাঘাট ইত্যাদির নির্মাণ ও সংস্কার সাধন ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৩য় :

তৃতীয় প্রকার অর্থ-সম্পদের ব্যয়ের খাতসমূহ ঃ অর্থাৎ খাযনা, জিযয়া, অমুসলিম ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত এক-দশমাংশ শুল্ক, যমীন ভাড়া,

কাফির অমুসলমানদের নিকট থেকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সূত্রে লব্ধ সম্পদ—যার খাত যেমন ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং যেহেতু এই তৃতীয় প্রকার সম্পদের আমদানী আর সব থেকে বেশী বিধায়-এর ব্যয়ের খাতগুলিও অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। একটি মাত্র বাক্যে একে ব্যাখ্যা দেয়া চলে আর তা হলো : জাতীয় কল্যাণ—কিংবা রাষ্ট্রীয় কল্যাণ مصالح الامة يا مصالح المسلمين। এখানে আমরা সীমাবদ্ধ কতিপয় কল্যাণের কথা উল্লেখ করবো। বিস্তারিত জানতে হলে ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল খারাজ এবং হাদীস ও ফিকাহ্'র অন্যান্য কিতাবাদি দেখুন।

১. বেতন : ইমাম আবু ইউসুফ (র) কিতাবুল খারাজে বলেন :

فيجرى على والى كل مدينة و قاضيها بقدر ما يحتمل كل رجل تصيره فى العمل المسلمين فاجر عليهم من بيت ما لهم انتهى -

অর্থাৎ প্রতিটি সরকারী চাকুরে তা তিনি রাষ্ট্রীয় গভর্নর কিংবা কাযী অথবা যে কোন বিভাগেই ও পদেই চাকুরী করুন না কেন—বায়তুলমাল থেকে তিনি তাঁর পারিশ্রমিক পাবেন।

২. ভাতা :

প্রত্যেক ব্যক্তি যিনিই ইসলামের সেবা ও খিদমতের জন্য নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিয়েছেন,—যেমন : ইসলামী শিক্ষার শিক্ষার্থী ও শিক্ষক; সে সমস্ত ওয়াজ নসীহতকারী ব্যক্তি যিনি ন্যায় ও সংগতভাবে ওয়াজ-নসীহত করে থাকেন; ইমাম ও মুয়াযযিন—তাদের ও তাদের স্ত্রী-পুত্রের জন্য নির্দিষ্ট ভাতা ও মাসোহারা দেয়া হবে।

৩. সৈন্যদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা যার ভেতর আরও কতিপয় বস্তু শামিল :

প্রকৃতপক্ষে এটাই ব্যয়ের সবচেয়ে বড় খাত। এর ভেতর সৈন্য ও তাদের স্ত্রী-পুত্রের বেতন-ভাতা, দুর্গের নির্মাণ, সংস্কারসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা; ছাউনি-শিবিরের ব্যবস্থাপনা, সীমান্ত রক্ষা, সামুদ্রিক জলসীমা রক্ষা করা,

সীমান্তরক্ষীদের তদারকী, রসদ ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা, যুদ্ধজাহাজ, উড়োজাহাজ, গোলা-বারুদ, ট্যাংক, মেশিনগানসহ সকল প্রকার যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবস্থা ইত্যাদি এর আওতাভুক্ত।

৪. **জনহিতকর ও কল্যাণমূলক কার্যাবলী :**

বর্তমানে একে Public Works বলা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে একটি বিস্তৃত অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চতুর্থ প্রকার অর্থ সম্পদের (অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ) অর্থাৎ বেওয়ারিছ মাল, অভিভাবক নেই এমন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ ইত্যাদির ব্যয়-খাতগুলির বর্ণনায় ফকীহ্গণ প্রধানত দু'টি খাত নির্দেশ করেছেন।

১. লা-ওয়ারিছ শিশুদের লালন-পালন; ২. সেই দরিদ্র ব্যক্তি যার কোন অভিভাবক নেই।

'আল্লামা শামী উল্লিখিত দু'টি ব্যয়-খাতের উল্লেখ শেষে মন্তব্য করেন; এর উদ্দেশ্য একটাই—ان مرفد العاجزون الفقراء-এর ব্যয়ের খাত দুর্বল ও অসহায় দরিদ্র ব্যক্তি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) 'কিতাবুল খারাজ' এবং ঐতিহাসিক 'আল্লামা বালাযুরী স্বীয় 'ফতুহুল বুলদান' নামক গ্রন্থে হযরত 'উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে ভাতা ও বৃত্তি নির্ধারণের এবং বন্টনের স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : হযরত 'উমর (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর মর্যাদার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নীতির ভিত্তিতে ভাতা বন্টন করেন। তিনি বলেছিলেন : সেই আল্লাহ্র কসম—যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই—এমন কেউ নেই যার বায়তুল মালের সম্পদে ন্যায়সংগত অধিকার নেই—কার্যত সে তা পা'ক কিংবা নাই পা'ক। ক্রীতদাস ব্যতিরেকে কারও হকই কারও থেকে বেশী নয়। এক্ষেত্রে আমার প্রাপ্য অধিকারও তোমাদেরই একজন সাধারণ মানুষের ন্যায়। মর্যাদা নির্ণীত হবে কেবল মাত্র আল্লাহ্র

কিতাব আল-কুরআনের আলোকে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে। যাদেরকে ইসলাম গ্রহণের পর কঠিনতম অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো এবং যাঁরা সকলের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন—তাঁদের বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করা হবে। ইসলাম গ্রহণ অবস্থায় তাঁর ধনাঢ্যতা ও দরিদ্রতা এক্ষেত্রে তেমনই বিবেচনার দাবী রাখে। অতঃপর উল্লিখিত নীতির ভিত্তিতে তিনি নিম্নরূপে ভাতা বন্টন করেন :

সংখ্যা	বিবরণ	বাৎসরিক ভাতার পরিমাণ
১.	নবী করীম (সা)-এর সহধর্মীনিগণ ও চাচা হযরত ‘আব্বাস বিন মুত্তালিব (রা)	১২,০০০ দিঃ
২.	মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যাঁরা বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন; হযরত হাসান ও হযরত হুসায়ন (রা)-কে এর মধ্যে ধরা হয়েছিল	৫,০০০ ,,
৩.	যাঁদের ইসলাম গ্রহণ বদর যুদ্ধে শরীক মুহাজির ও আনসারদেরই অনুরূপে অর্থাৎ আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী ও ওহোদ যুদ্ধে যোগদানকারী; হযরত উসামা বিন যায়দ (রা)-এর অন্তর্গত	৪,০০০ ,,
৪.	হযরত ‘আবদুল্লাহ্ বিন ‘উমর (রা), ‘উমর বিন আবী সালমার (রা) ন্যায় মুহাজির ও আনসারদের সন্তানবর্গ এবং যাঁরা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই হিজরত করেছিলেন	৩,০০০ ,,
৫.	সাধারণভাবে সকল মুহাজির ও আনসারদের সন্তান-সন্ততির জন্য প্রত্যেককে এবং মক্কা বিজয়ের সময় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের প্রত্যেককে	২,০০০ ,,

এ ছাড়া অন্যান্য মক্কাবাসীকে আটশ’ ও চারশ এবং সাধারণভাবে সবার জন্যই তিনশত দিরহাম ভাতা মঞ্জুর করেন। মুহাজির ও আনসারগণের স্ত্রীদের জন্য সম্মান ও মর্যাদার ভিত্তিতে কাউকে ছয়শ, চারশ, দুশ, এবং

সেনাবাহিনীর সেনানায়কদের খিদমতের ভিত্তিতে নয়, আট ও সাতশ' দিরহাম ভাতা নির্ধারিত করেছিলেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে দশ দিরহাম, বয়ঃপ্রাপ্ত হবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ও দুধ ছাড়ার পর থেকে দু'শ' দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেন, বয়স বাড়ার সাথে তা বৃদ্ধি পেত।

তৃতীয় অধ্যায়

বায়তুল মালের আমদানী রাজস্ব প্রসঙ্গে

ম খাত :

সাদকাহ্ (যাকাত) যা বিশেষভাবে মুসলমানদের থেকেই নেয়া হয়। প্রথমত, পশুর সাদাকাহ্‌র—আর এগুলির মধ্যে উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি। ফিকাহ্‌র কিতাবে এসবের নির্দিষ্ট হারের উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, যা মুদ্রাকারে নগদ গ্রহণ করা হয়—চাই কি তা স্বর্ণের হোক কিংবা রৌপ্যের অথবা এর বাইরের মুদ্রা যা বাজারে বৈধ মুদ্রা হিসেবে প্রচলিত ও স্বীকৃত। শেষ যুগের 'উলামায়ে কিরাম এর উপর একমত যে, মুদ্রা যদি বৈধ স্বীকৃত সরকারে বাজারে চালু থাকে তবে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। অনুরূপ বাজারে প্রচলিত সকল প্রকার টাকা-পয়সার উপর যাকাত ওয়াজিব। আমাদের দেশে প্রচলিত কাগজী মুদ্রাও এর শামিল। এ সম্পর্কে আমি স্বতন্ত্র একখানা পুস্তিকা লিখেছি। তৃতীয়ত, ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত শুল্ক যার পরিমাণ এক-দশমাংশ। চতুর্থত, জমির উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশ;—সেচ-বিহীন জমির ক্ষেত্রে এক-দশমাংশ এবং সেচযুক্ত জমির ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ।

ইসলামী খিলাফতের প্রথম প্রকার আয়-আমদানীর উৎসের নাম সাদাকাহ্, যা শুধু মুসলমানদের নিকট থেকে আদায় ও গ্রহণ করা হয় এবং তা কয়েকটি মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় :

ম : সোনা-রূপা;

য় : দেশের প্রচলিত মুদ্রা, যেমন—পয়সা, দেশীয় টাকা ও নোট ইত্যাদি।

৩য় : ব্যবসার মাল-মাত্তা;

৪র্থ : উট, গরু ও ছাগলের যুথ;

৫ম : ব্যবসার শুল্ক—যা মুসলমান ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে আদায় করা হয়; 'উশরের জমির ফলমূল ও অন্যান্য উৎপন্নজাত দ্রব্যাদি। এর বিস্তারিত শাখা-প্রশাখা ও বিধানাদির জন্য হাদীসের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য এবং ফিকাহ্‌র কিতাবাদি দ্রষ্টব্য। এ অধ্যায়ে রসূল আকরাম (সা)-এর মৌলিক ও লিখিত, নির্দেশাদি হাদীসের গ্রন্থগুলিতে বিদ্যমান। হুযূর (সা)-এর চারটি ফরমান এ অধ্যায়ে অত্যন্ত দীর্ঘ ও প্রসিদ্ধ।

১. 'কিতাবে হযরত আবু বকর' (রা) অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট লিখিত পত্র। ইমাম বুখারী (রা) পত্রটিকে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে স্বীয় সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।

৩. 'কিতাবে 'আমর বিন হাযম' বা 'আমর বিন হাযমকে লিখিত পত্র। মুসতাদরাকুস সহীহায়ন, নাসায়ী প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ. ইমাম হাকেম হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলবার পর লিখেছেন—هذا اصل من اصول الدين অর্থাৎ ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম।

৪. 'কিতাবে যিয়াদ বিন লবীদ' বা যিয়াদ বিন লবীদের নিকট লিখিত পত্র যা হাফিজ যায়লা'য়ী ইমাম ওয়াকিদীর 'কিতাবুর রিদ্দা' থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

সম্ভবত আপনি এই সন্দেহে পড়তে পারেন যে, যাকাতের মর্যাদা সালাতের অনেক নীচে। তথাপি রসূল করীম (সা) সালাত সম্পর্কে কোন লিখিত নির্দেশ ও ব্যবস্থা রেখে যাননি। উত্তরে বলা যায় যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সামগ্রিক জীবন-বিধান। রাষ্ট্রনীতি এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এজন্য এর মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য আল্লাহ্‌র 'ইবাদতের সাথে সাথেই বাতিল ও বিভ্রান্তিকর চিন্তা এবং ধ্যান-ধারণাকে ধ্বংস করে সামাজিক জীবনে সুস্থ, সঠিক ও বিশুদ্ধ ব্যবস্থাপনা কায়েম করা। এজন্যে ইসলামের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকারী পুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সা) ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রেখেও পুঁজিবাদের নিকৃষ্ট ও জঘন্যতম দিকগুলিকে খা

শেষ পর্যন্ত জুলুম ও সীমালংঘনে এবং সাধারণ ও সার্বিকভাবে জনগণকে চরম নিঃস্বতার ও দারিদ্র্য দশায় নিক্ষেপ করে—সমূলে উচ্ছেদ করার জন্যে অত বেশী প্রয়াস চালিয়েছেন যা আর অন্য কোথাও করেন নি। যাকাত সমাজ জীবন থেকে পুঁজিবাদের শেষ চিহ্নটুকু নিঃশেষে মুছে দেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এর উদ্দেশ্যে সুস্থ, সঠিক ও বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন তবে ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ্ আরও কিছু লিখবো। و الله اعلم

২য় খাত : খাজনা ও নিম্নোক্ত বিষয়গুলি যার অন্তর্ভুক্ত :

প্রথমত : খাজনা ধার্যকৃত জমির ভাড়া;

দ্বিতীয়ত : যিম্মীদের প্রদত্ত জিয্য়া;

তৃতীয়ত : যিম্মী ব্যবসায়ী ও দারুল হারবের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের এক-দশমাংশ;

চতুর্থত : দারুল হারবের বাসিন্দাদের নিকট থেকে সন্ধিসূত্রে অথবা উপহার-উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ;

পঞ্চমত : রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ভাড়া।

ইসলামী খিলাফতের রাজস্ব আমদানীর দ্বিতীয় সূত্রের কতিপয় বিভাগ ও দিক :

১. **খাজনা :** যে সমস্ত দেশের উপর ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং মুসলিম জাহানের খলীফা সেখানকার জমিগুলি বিজিত এলাকার অমুসলিমদের নিকট রাখবার অনুমতি দিয়েছেন এবং যে সমস্ত অমুসলিম দেশের সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে—যার পরিণতিতে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে এসে যিম্মীতে পরিণত হয়েছে—তাদের ভূ-সম্পত্তিকে 'খারাজী' বা খাজনাকৃত জমি এবং উল্লেখিত জমির উপর যা ধার্য করা হবে তাকে 'খারাজ' বা খাজনা বলা হয়। হযরত 'উমর ফারূক (রা)-এর যমানায় যখন ইরাকসহ অন্যান্য দেশ ও এলাকা বিজিত হয় তখন হযরত 'উমর ফারূক (রা) খাজনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিয়ম-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দেন। সর্বাগ্রে তিনি হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রা) কে সমগ্র ইরাকব্যাপী আদমশুমারী করবার নির্দেশ দেন। হযরত সা'দ

(রা) অত্যন্ত সুষ্ঠু ও শৃংখলার সাথে তা সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র পাঠিয়ে দেন। হযরত 'উমর (রা) আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিজিত এলাকার জমি প্রাক্তন মালিকদের ব্যবস্থাধীনেই রাখা হবে এবং এ ব্যাপারে তাদের প্রয়োজনীয় সব রকমের স্বাধীনতাও দেয়া হবে। জমির উপর শুধু মাত্র খাজনা ধার্য করা হবে। বিষয়টি মজলিসে শূরায় পেশ করা হলে এ নিয়ে বিরাট ও ব্যাপক মতভেদ দেখা দেয়। অনেক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর হযরত 'উমর (রা) সূরা হাশরের নিম্নোক্ত আয়াতের সাহায্যে সকল বিরোধিতা ও মতভেদের অবসান ঘটান—। আয়াতটি এই :—

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ

وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ

وَابْنِ السَّبِيْلِ . كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ .

অর্থাৎ "আল্লাহ্ জনপদবাসীদিগের নিকট হইতে তাহার রসূলকে যাহা কিছু দিয়াছেন—তাহা আল্লাহের, তাঁহার রসূলের, রসূলের স্বজনগণের এবং পিতৃহীন বালক-বালিকার, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদিগের, যাহাতে তোমা-দিগের মধ্যেই যারা বিত্তবান কেবল তাহাদিগের মধ্যে ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।" আয়াতটিতে "ফাই" অর্থাৎ গনীমতের মালের বর্ণনা ও তার ব্যয় খাতগুলির বর্ণনা বিদ্যমান। এর পরপরই :

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ

وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ

وَرَسُوْلَهٗ . اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝

অর্থাৎ "এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য যাহারা আল্লাহের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া নিজদিগের ঘর-বাড়ী ও সম্পত্তি হইতে উৎখাত হইয়াছে; উহারাই তো সত্যাশ্রয়ী।" আয়াত দ্বারা মুহাজিরদের উক্ত গনীমতের মালে অংশীদার করা হয়। এর পরপরই :

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

অর্থাৎ "মুহাজিরদিগের আগমনের পূর্বে এই নগরের যে সকল অধিবাসী বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল তাহারা মুহাজিরদিগকে ভালবাসে এবং মুহাজির-দিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য তাহারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না। তাহারা মুহাজিরদিগকে নিজদিগের উপর স্থান দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হইলেও, যাহারা কার্পণ্য হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিয়াছে—তাহারাই সফলকাম।" আয়াত দ্বারা আনসারদেরও অংশীভুক্ত করা হলো। এর পরই :

وَالَّذِينَ جَاءُو مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

অর্থাৎ "যাহারা উহাদিগের পরে আসিয়াছে তাহারা বলে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে এবং বিশ্বাসে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং বিশ্বাসীদিগের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখিও না। হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।" আয়াত দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত যত লোক মুহাজির ও আনসারদের অনুসারী এবং তাদের সাথে প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্কে সম্পর্কিত হবে সবাইকে গনীমতের মালে অংশীদারিত্ব প্রদান করা হলো। আর এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব ছিল না যতক্ষণ পর্যন্ত না হযরত 'উমর (রা)-এর সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত ও কার্যকর করা হতো। প্রকৃতপ্রস্তাবে আয়াতের শুরুতেই

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔

অর্থাৎ "ধন-সম্পদ যেন তোমাদের ধনীদের মধ্যেই কেবল আবর্তিত হতে না থাকে' ঘৃণ্যতম পুঁজিবাদের দিকে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং যার মুলোৎপাটনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে,—তদুপরি মূলোৎপাটনের পদ্ধতি ও পন্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে অত্যন্ত বিস্তারিত বাক্যের আশ্রয় নেয়া হয়েছে এবং এজন্য হৃদয়গ্রাহী, প্রেমপূর্ণ, অন্তর ফিরাতে সক্ষম, চিত্তে প্রভাব সৃষ্টিকারী যাদুকরী ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। খোদানাখাস্তা হযরত 'উমর (রা)-এর সিদ্ধান্ত মুতাবিক যদি কাজ করা না হতো তবে উল্লিখিত আয়াতটি অর্থহীন হয়ে পড়তো এবং মুসলিম জাতি নিশ্চিতভাবেই নিকৃষ্ট পুঁজিবাদের শিকারে পরিণত হতো। তাদের সামাজিক জীবনের সুদৃঢ় ও মযবুত ভীত বহু আগেই বিনষ্ট হয়ে যেত। হুযূর (সা)-এর পবিত্র বাণী ঃ

ان الله تعالى جعل الحق على لسان عمر۔

'আল্লাহ্ পাক 'উমর (রা)-এর জিহ্বাগ্রে হক-ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।' হযরত 'উমর (রা)-এর বিখ্যাত উক্তি যা বুখারী শরীফে বর্তমান,—আপনি নিজেই পড়ুন এবং তাঁর আধ্যাত্মিকতা, দূরদর্শিতা, পবিত্র কুরআনুল করীম বুঝবার এবং অনাগতকালের সুপ্ত বিষয় সম্পর্কে ধারণা

প্তিটের বিস্ময়কর ক্ষমতা ও নৈপুণ্য দেখে আপনি নিজেই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়বেন। হযরত 'উমর (রা) বলেন ঃ

عن زيد بن اسلم ان عمر رض قال : والذى نفسى بيده لولا اترك الناس بيانا ليس لهم شيء ما فتحت على قرية الا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلعم خيبر ولكن اتركها لهم خزنته يقسمونها .

"আল্লাহ্‌র কসম ! যার হাতে আমার জীবন; পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য আমরা যদি কিছুই অবশিষ্ট না রাখতাম তবে তাদের জন্য কিছুই থাকতো না। আমাদের অধিকারে গ্রাম ও জনপদ যাই আসতো—সব কিছু খায়বরের বণ্টিত সম্পদ ও ভূ-সম্পত্তির ন্যায় ভাগ-বন্টিত হয়ে যেত। সেজন্যে আমরা পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য তা খাজনা আকারে রেখে দিলাম যেন তারা তা ভাগ-বণ্টন করে নিতে পারে।"

এর পর এতদসম্পর্কিত সকল তর্ক-বিতর্ক সমাপ্তির সাথে সাথেই হযরত 'উমর (রা) হযরত 'উছমান বিন হানীফ (রা)-কে সমগ্র ইরাক ভূ-খণ্ড জরীপের জন্য পাঠান। তিনি গভীর নিষ্ঠা, সতর্কতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহকারে জরীপ কাজ পরিচালনা করেন ঠিক তেমনিভাবে—যেমনিভাবে সূক্ষ্ম ও মূল্যবান কাপড় পরিমাপ করা হয়। দীর্ঘ কয়েকটি মাস অত্যন্ত সচকিত ব্যবস্থাপনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাথে কাজ চলতে থাকে। পাহাড়, ময়দান, নদ-নদী এবং রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ব্যতিরেকে শুধু কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণই হয়েছিল তিন কোটি ষাট লক্ষ একর। ইবনে খুররাদাজবাহ বলেন ঃ উক্ত জমি থেকে বায়তুল মাল বাৎসরিক বারো কোটি আশি লাখ দিরহাম রাজস্ব হিসেবে পেত। আমরা এখানে কেবল হাফিজ ইমাম যায়লা'য়ীর কিতাব 'আত্তাখরীজ' থেকে কিছু অংশের উদ্ধৃতি দেয়া প্রয়োজন মনে করছি ঃ

قال الزيلعى روى ابن سعد فى الطبقات ان عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حنيف رض على خراج السواد ورزقه

كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم وامره ان يمسح السواد عامره وغامره ... الى ... فتكون ذاع الملك ذراعا وربعا بالسوداء .

আমি এখানে হাফিজ যায়লা'য়ীর 'তাখরীজ' গ্রন্থ থেকে এই রিওয়ায়েতটি মূল গ্রন্থের ৭৯ পৃষ্ঠা উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। যায়লা'য়ী বলেন: ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

"হযরত 'উমর বিন খাত্তাব (রা) সওয়াদ এলাকার রাজস্ব আদায়ের জন্য হযরত 'উছমান বিন হানীফ (রা)-কে পাঠান এবং তাঁকে প্রতিদিন এক চতুর্থাংশ বকরী ও পাঁচ দিরহাম বেতন হিসেবে প্রদান করেন এবং তাঁকে শহরতলীর আবাদী ও অনাবাদী জমির পরিমাপ করার নির্দেশ দেন। লবণাক্ত ও অধিক গভীর পানি, ঝোপ-জঙ্গল, পানির রং বিবর্ণকারী ভূমি এবং যেস্থানে পানি পৌঁছে না—সেসব জমির পরিমাপ করতে নিষেধ করেন। তিনি পাহাড় ব্যতীত প্রতিটি স্থানের পরিমাপ করেন অর্থাৎ হালওয়ান থেকে আরব ভূমি পর্যন্ত অবস্থিত এবং ফোরাত নদীর নিম্নভাগ পরিমাপ করেন।"

"এরপর তিনি হযরত 'উমর (রা)-কে লিখে জানান যে, সওয়াদ এলাকার আবাদী ও অনাবাদী জায়গা,—যেখানে পানি পৌঁছেছে—এ ধরনের জমি পরিমাপ করে আমি তিন কোটি ষাট লাখ যরীব ভূমি পেয়েছি। আর যে গজ দ্বারা তিনি জমির পরিমাপ করেছিলেন তার সঠিক মাপ এক গজ ও এক মুষ্টি। এতে হযরত 'উমর (রা) 'উছমান বিন হানীফ (রা)-কে লিখে জানালেন,- তিনি যেন প্রতি জরীব, আবাদী ও অনাবাদী উভয় ক্ষেত্রে রাজস্ব নির্ধারণ করেন চাই কি জমি ব্যবহার করুক কিংবা না করুক—এক এক দিরহাম এক কফীয। আঙ্গুরের ক্ষেত্রে প্রতি জরীবে দশ দিরহাম নির্ধারণ করবে, কাঁচা খেজুরের উপর পাঁচ দিরহাম। খেজুরগাছসহ অন্যান্য গাছ বাদ দেবে। তিনি আরও বলেন যে, এটা তাদের খাদ্য—এবং শহর আবাদীর জন্য। ঘোড়-সওয়ার ধনী হলে ৪৮ দিরহাম আর নিম্ন পর্যায়ের ২৪ দিরহাম আর যার কাছে কোন জিনিষ নেই—তাকে ১২ দিরহাম রাজস্ব

দিতে হবে। তিনি বলেন, প্রতি মাসে এক দিরহাম কাউকে নিঃস্ব করে ফেলবে না। গোলাম এবং নয়ম—অনবর'র ভূমির খাজনা মওকুফ করে দিলেন যা তাদের উপর চাপানো হয়েছিল। ভূমিহীন কৃষকদের জমি দিলেন এবং অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আনলেন। এতে কুফা থেকে প্রথম বছরে আট কোটি দিরহাম রাজস্ব আদায় হয়। পরে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে চার কোটি দিরহামে পৌঁছেছিল—এবং এটাই বহাল ছিল। ইবনে যায়্‌হ্‌ইয়াও এরূপই বর্ণনা করেছেন কিতাবুল আমওয়াল নামক গ্রন্থে। মুহাযিরাত গ্রন্থে বলা হয়েছে—জরীব বলা হয় সরকারী যাট গজের পূর্ণ যাট গজকে।"

'আল্লামা মাওয়ারদী 'আহকামুস সুলতানিয়া' নামক গ্রন্থে বলেন, বেসরকারী গজ অপেক্ষা সরকারী গজ ৫¾ আঙ্গুল বড়। 'আল্লামা 'আলী মুবারক পাশা বলেন, গজ দু'টির মধ্যে সম্পর্ক হলো ⅘, তাহলে সরকারী গজ বেসরকারী গজের হিসাবে ১¼ গজ হবে।"

২. জিযয়া :

قال المحقق فى المحاضرات . وضع المسلمون ...
ومن المشركين ان توضع عنهم جزية تلك السنة .

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে আমরা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সন্ধান পাই।

১. জযীরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপে ইসলামের অনুসারী মুসলিম ব্যতিরেকে আর কেউ বসবাস করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ পাক বলেন :

اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .

অর্থাৎ "মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা কর।" ইমাম জাস্‌সাস রাযী 'আহকামুল কুরআন' নামক গ্রন্থে কতিপয় স্থানে এর ব্যাখ্যায় বলেন : এ ধরনের আয়াতে বর্ণিত মুশরিক অর্থে শুধু আরবের মুশরিক বুঝাবে। নবী করীম (সা) বলেন :

لا يصلح دينان فى جزيرة العرب

"আরব উপদ্বীপে দু'টি ধর্মের পারস্পরিক সন্ধি ও সহাবস্থান সম্ভব নয়।"

২. 'জযীরাতুল আরব' (আরব উপদ্বীপ) ব্যতীত অন্যান্য ভূখণ্ডের

কাফির ও মুশরিকরা যদি ইসলামী হুকুমতের অধীনতা স্বীকার করে নেয় তবে তাদের নিকট থেকে জিযয়া প্রদানের শর্তে তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া যাবে।

৩. স্বাধীনতা দেয়ার পর তাদের জীবন, সম্পদ ও মান-সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বিধান করা ইসলামী হুকুমতের জন্য ফরয হয়ে যায়।

৪. নিরাপত্তা প্রদানের বিনিময়ে অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণের যে ট্যাক্স নেয়া হয় তারই নাম জিযয়া।

قال الحافظ الزيلعى قال على رض انما بذلوا الجزية يكون دمائهم كدمائنا و اموالهم كاموالنا.

হাফিজ যায়লা'য়ী বলেনঃ হযরত 'আলী (রা) বলেছেন,—জিযয়া এ জন্যেই নেয়া হয় যেন—তাদের রক্ত আমাদের রক্ত, তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের ন্যায় গুরুত্ববহ ও মূল্যবান বিবেচিত হয়।

৫. হিফাজত তথা নিরাপত্তা বিধান দু'প্রকার—যথাঃ ক. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা—আর এর জন্য প্রয়োজন পুলিশ বিভাগ, ডাক ও যোগাযোগ বিভাগ ইত্যাদি। খ. বহিঃশক্তির হাত থেকে নিরাপত্তা আর এর জন্য প্রয়োজন সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধ-সম্ভার ইত্যাদি। অবশ্য এটাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে এই উভয়টির জন্য দরকার কোটি কোটি টাকার। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার জন্য মুসলমানদের নিকট থেকে যত টাকা আদায় করা হয়—যিম্মীদের নিকট থেকে তার দশ ভাগের এক ভাগও আদায় করা হয় না। তদুপরি এই নগণ্য অর্থ আদায় করতে গিয়ে তাদের সাথে যে ধরনের বিনয়-নম্র আচরণ করা হয় দুনিয়ার ইতিহাসে কোথাও এর নজীর মিলবে না। বিস্তারিত বক্তব্য ও আলোচনা এড়িয়ে গিয়ে আমরা শুধু কিতাবুল খারাজের উদ্ধৃতি পেশ করেই এতদ্সম্পর্কিত সকল আলোচনা শেষ করবো।

قال ابو يوسف وينبغى يا امير المؤمنين ايدك الله ان تتقدم فى الرفق باهل الذمة و التفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يكلفوا فوق طاقتهم وان لا يوخذ شىء من اموالهم الا بحق يجب عليهم -

ইমাম আবূ ইউসূফ (র) বলেন : "হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করুন।—যিম্মীদের সাথে কোমল ব্যবহারে আপনার অগ্রণী হওয়া সমীচীন এবং গভীরভাবে লক্ষ্য রাখবেন যেন তাদের উপর কেউ জুলুম করতে, কষ্ট দিতে এবং সাধ্যাতীত ভার চাপাতে সাহসী না হয় আর সংগত কারণ ব্যতিরেকে তাদের নিকট থেকে অর্থ সম্পদ যেন গ্রহণ করা না হয়।" আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা হলে ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে আরও লিখবার আশা রইলো। সংক্ষেপে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, জিযয়া অত্যাচার ও নির্যাতনমূলক কোন ট্যাক্স নয়—বরং তা অত্যন্ত কোমল ও সহয়পূর্ণ এবং সকল প্রকার বিদ্বেষের হাত থেকে এ সম্পূর্ণ মুক্ত।

৩. বাণিজ্যিক শুল্ক :

যেহেতু ইসলাম সমগ্র দুনিয়ার জন্য শান্তি ও করুণার বার্তাবাহী,—যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

"(হে রসূল!) তোমাকে সমস্ত বিশ্ব-জগতের রহমতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে,"—সেহেতু ইসলামের আইন রব্বানী (স্বর্গীয়) আইন, ইসলাম—দুনিয়ার সমগ্র মানবগোষ্ঠির সামনে মানবীয় ভ্রাতৃত্ব, সৎ ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার ইত্যাদির মহান ও অনুপম চরিত্রের চিরন্তন, পরিপূর্ণ ও কার্যকরী ব্যবস্থা পেশ করতে চায়। সেজন্যে সে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বাণিজ্যিক শুল্কের পক্ষপাতী নয় বরং উদার ও অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষপাতী। কিন্তু হযরত 'উমর (রা)-এর খিলাফতকালে বাইরের অত্যাচারী রাষ্ট্রগুলো যখন মুসলিম ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে শতকরা ১০ টাকা হারে শুল্ক আদায় করতে থাকে এবং চতুর্দিক থেকে এ সম্পর্কিত খবর ও তথ্যাদি হযরত 'উমর (রা)-এর নিকট পৌঁছতে থাকে—তখন ইসলামী হুকুমতের পক্ষে ন্যায়, ইনসাফ ও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাণিজ্যিক শুল্ক ধার্য করা ছাড়া

আর কোন গত্যন্তর থাকলো না। কেননা—ইসলাম অন্যের ক্ষতি ও অনিষ্ট সাধন করাকে যেমন পছন্দ করে না—তেমনি এটাও পছন্দ করেন যে সে অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হোক? 'মুহাযিরাত' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে:

لم يكن العشور من الموارد التي ذكرها القرآن الكريم ولكنها حدثت في عهد عمر بن الخطاب رض وسبب ذالك ان ابا موسى الاشعري رض كتب اليه ان تجارا من قبلنا المسلمين يأتون ارض الحرب فيأخذون منهم العشر فكتب اليه عمر رض خذ انت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين-

অর্থাৎ "কুরআনুল করীম প্রদত্ত বিধানে বাণিজ্যিক শুল্কের স্থান ছিল না। হযরত 'উমর (রা)-এর যমানায় তা প্রবর্তিত হয়। এর কারণ ছিল, একবার হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) হযরত 'উমর কে লিখে জানান: অমুসলিম রাষ্ট্রগুলি (দারুল হারব) মুসলিম ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে শতকরা ১০ টাকা হারে বাণিজ্যিক শুল্ক আদায় করছে। এতে হযরত 'উমর (রা) আবু মূসা আশ'আরী (রা)-কে লিখিত নির্দেশ পাঠান—তারা যে হারে মুসলিম ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে শুল্ক আদায় করবে তুমিও তাদের নিকট থেকে অনুরূপ ভাবে তা আদায় করবে।" আর এটা শুধু দারুল হারবের অধিবাসীদের নিকট থেকেই নয় বরং সে সমস্ত লোকের নিকট থেকেও তা আদায় করা হবে যারা দারুল ইসলাম (ইসলামী রাষ্ট্র) এবং দারুল হারবের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত রাখবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, শুল্কের হার নির্ধারণে ইসলাম—ন্যায় ও ইনসাফের যে মান বজায় রেখেছে তার নজীর দুনিয়ার জাতি ও রাষ্ট্রপুঞ্জের ইতিহাসে মিলবে না। হাদীছ ও ফিকাহ্‌র কিতাবগুলি এ সম্পর্কিত আলোচনা, বিন্দু মাত্র কার্পণ্য করেনি। এখানে এতদ্‌সম্পর্কীয় কতিপয় মূলনীতি বর্ণনা করাই যথেষ্ট হবে।

১. দুইশত দিরহাম মূল্যের কম দ্রব্যে কোন ট্যাক্স নেয়া যাবে না।

২. সম্পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রকার সম্পদ ও দ্রব্যাদির ট্যাক্স নেয়া যাবে না।

৩. যদি ব্যবসায়ী সম্পদের মালিক না হয় কিংবা অন্যের সম্পদ ব্যবসার উদ্দেশ্যে এসে থাকে অথবা ব্যবসা ভিন্ন অন্যবিধ উদ্দেশ্যে এনে থাকে তবে তার উপর শুল্ক ধরা যাবে না।

৪. বছরে মাত্র একবারই ট্যাক্স নেয়া যাবে।

৫. দারুল হারবের সরকার যদি আমাদের নিকট থেকে কোন শুল্ক আদায় না করে তবে তাদের নিকট থেকেও কোন শুল্ক আদায় করা হবে না।

৬. যদি দারুল হারব সরকার ট্যাক্স আদায়ে জোর-জুলুমের আশ্রয় গ্রহণ করে তবে বিনিময়ে অনুরূপ জোর-জুলুমের আশ্রয় গ্রহণ কিছুতেই জায়েয হবে না।

৭. যদি ব্যবসায়ী ঋণগ্রস্ত হয়—যার কারণে তার পক্ষে সাহিবে নিসাব[১] থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে—তবে তার নিকট থেকে ট্যাক্স আদায় করা ঠিক হবে না।

৮. যদি সে বলে 'আমার মাল ব্যবসার মাল নয়' তাহলেও তার নিকট থেকে শুল্ক আদায় করা যাবে না ইত্যাদি।

আপনি এবার বর্ণিত মূলনীতি ও শর্তগুলির দিকে লক্ষ্য করুন এবং হাল আমলের দুনিয়ার দেশে দেশে প্রচলিত বাণিজ্যিক শুল্কের সাথে এর তুলনা করুন—তাহলে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার ও স্পষ্ট প্রতিভাত হবে—ইসলামী ব্যবস্থাপনার মত ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থাপনা দুনিয়াতে আর একটিও নেই আর কিয়ামততক হয়তো তা সম্ভব হবে না। আজকাল চুঙ্গীর নামে শত শত প্রকারের বাণিজ্যিক শুল্ক দুনিয়ায় বর্তমান—যার ফলে গোটা পৃথিবীর অর্থনৈতিক জীবন সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ হয়ে গেছে। ইসলাম ঐ সকল ট্যাক্স ও শুল্ক ঘৃণার চোখে দেখে।

টীকা :—১ যে পরিমাণ বিত্ত-সম্পদ থাকলে ও ফেতরা প্রদান করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে এমত পরিমাণ সম্পদের মালিককে 'সাহিবে নিসাব' বলা হয়।

اخرج ابوداود وابن خزيمة فى صحيحه والحاكم ان رسول الله صلعم قال: لا يدخل صاحب المكس الجنة. قال البغوى يريد بصاحب المكس الذى ياخذ من تجار اذا امروا عليه مكسا باسم العشر قال الحافظ المنذر وهو حرام وسحت ياكلونه فى بطونهم نارا حجتهم فيه داحضة عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ.

وروى الطبرانى ان الله تعالى يدنو من خلقه اى برحمته وفضله فيغفر لمن يشاء الا لبغى بفرجها او عشار.

অর্থাৎ আবু দাউদ, ইবনে খুযায়মা এবং হাকেম তাদের সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন—রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ "বাণিজ্যিক শুল্ক আদায়কারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।' ইমাম বাগবী (রা) বলেনঃ صاحب المكس বা শুল্ক আদায়কারী বলতে তাদের বুঝান হয়েছে যারা ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে 'মুক্স' বা এক দশমাংশ শুল্ক হিসাবে আদায় করে। হাফিজ মুনযির বলেনঃ এটা হারাম ও অবৈধ উপার্জিত। এরূপ উপার্জিত অর্থ যারা খায় তারা আগুন দিয়ে পেট ভর্তি করে মাত্র। তাদের দলীল-প্রমাণ আল্লাহ্‌র নিকট বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হবে,—এদের উপর গযব এবং এদেরই জন্য ভয়াবহ শাস্তি! তিবরানী বর্ণনা করেনঃ আল্লাহ্ পাক তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ নিয়ে বান্দাহ্‌র নিকটবর্তী হন; যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন,—কিন্তু তারা ক্ষমা পায় না—যারা যৌনব্যাপারে সীমালংঘনকারী ও শুল্ক আদায়কারী।

৪. দারুল হারবের অধিবাসীদের নিকট থেকে সন্ধিসূত্রে অথবা উপহার উপঢৌকন হিসাবে প্রাপ্ত সম্পদঃ

এ সম্পর্কে বিস্তারিত হাদীস ও ফিকাহ্‌র কিতাবে পাওয়া যাবে। সংক্ষেপ এই যে, যদি দারুল হারব সরকার ইসলামী হুকুমতের সাথে বাৎসরিক অথবা মাসিক নগদ অর্থ অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ প্রদানের শর্তে সন্ধিতে

আবদ্ধ হয় অথবা উপহার-উপঢৌকন হিসেবে কিছু কড়ি বা সম্পদ পাঠায় তবে তা সকল ক্ষেত্রেই খাজনার বিধানের অন্তর্গত হিসেবে গণ্য হবে এবং এ ধরনের সন্ধিও জায়েয। স্বয়ং হুযুরে আকরাম (সা) নাজরান অঞ্চলের খৃস্টান ও অন্যান্য গোত্রের সাথে উক্তরূপ সন্ধিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। দেখুন—কিতাবুল খারাজ ও সুনানে আবু দাউদ প্রভৃতি।

قال العلامة البلاذری فی فتوح البلدان ص۳۴۵ ثم سار یزید بن المهلب الی طبرستان فاستجاش الاصبهذ الدیلم فانجدوه فقاتله یزید ثم انه صالحه علی نقد اربعة الاف الف درهم وعلی سبع مائة الف مثاقیل فی کل سنة ووقرا اربعمائة جماز زعفران-

"ঐতিহাসিক 'আল্লামা বালাযুরী ফতুহুল বুলদান নামক গ্রন্থের ৩৪৫ পৃষ্ঠায় বলেন—অতঃপর য়াযীদ বিন মুহাল্লাব তাবারিস্তানের দিকে সৈন্য পরিচালনা করেন। এরপর তিনি দায়লামের আসবাহাবার নিকট সৈন্য চেয়ে পাঠালে তাকে তা দেওয়া হয়। এরপর যুদ্ধ এবং পরিণতিতে য়াযীদ নগদ ৪০ লাখ দিরহাম, ৭ লক্ষ তোলা স্বর্ণ প্রতি বছর আদায় করা এবং ৪০০ 'জিমায' জাফরান প্রদানের শর্তে চুক্তি করেন।"

৫. রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তির ভাড়া প্রসঙ্গে :

যে সকল ভূ-সম্পত্তির মালিক স্বয়ং রাষ্ট্র এবং ইসলামী হুকুমত উক্ত ভূ-সম্পত্তি তার নাগরিকদের নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে দিয়ে দিয়ে থাকে—ইসলামের ফকীহগণ একে اجر ارض الحوز বলে থাকেন। শেখ ইবনুল হুমাম ও অন্যান্য ফকীহদের মতে মিসর ও সিরিয়ার ভূ-সম্পত্তি উক্তরূপ সম্পত্তির অন্তর্গত। 'আল্লামা শামী বলেন :

هذا نوع ثالث یعنی لاعشریة ولاخراجیة من الاراضی تسمی اراضی المملکة والحوز والماخوذ منها من الزراعین تسمی اجرة فی حق الاکرة وخراجا فی حق الامام کان حکمه حکم الخراج قال ابن العلیم واصله ما ذکر البلاذری

فى فتوح البلدان والامام ابويوسف فى كتاب الخراج
ان عمررض ان فتح العراق اصطفى من ارضه كل ما كان
لكسرى ومرازبته واهل بيته مما لم يكن فى يد احد او
لرجل قتل فى الحرب اوالحق بارض الحرب وكانت مساحة
ما اصطفاه من هذا الارض ---٠٠٠٠٠٠٠٤' جريب -

অর্থাৎ "এটা তৃতীয় প্রকারের যা ওশরভুক্তও নয় আবার খারাজভুক্তও নয়; এটা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি যা রাষ্ট্রপ্রধান জনগণকে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের (اجرة) ভিত্তিতে দিয়ে থাকেন। গ্রন্থকার ইবনুল 'আলীম বলেন, এর উৎস বা বালাযুরী 'ফতুহুল বুলদান' এবং ইমাম আবু ইউসুফ কিতাবুল খারাজ-এ বর্ণনা করেছেন: হযরত 'উমর (রা) ইরাক বিজয়ের পর যেসব জমি পারস্য সম্রাট, সম্রাটের বংশাবলী এবং তার গভর্নর ও সুবেদারগণ, যুদ্ধে নিহত ও পালিয়ে অন্য অমুসলিম দেশে আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তির মালিকানাধীন ছিল সবই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে নিয়ে আসেন। আর এ ধরনের সম্পত্তির পরিমাণ ৪০ লক্ষ জরীব। ১— এসব জমির ক্ষেত্রে যে বিধান তা খারাজভুক্ত জমির বিধানের অনুরূপ।"

অর্থাৎ হযরত ফারুক-ই-'আজম (রা) শুধু ইরাক ভূখণ্ডে চল্লিশ লাখ যরীপ জমি রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। ফতওয়ায়ে 'আযীযিয়া থেকে জানা যায় যে, ভারতবর্ষের ভূ-সম্পত্তি সম্পর্কে কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তির ধারণাও অনুরূপ।

টীকা: ১ জরীব আরবীয় পরিমাপ বিশেষ। দশ হাজার গজ পরিমিত জায়গাকে আরবী ভাষায় জরীব (جريب) বলা হয়। আমাদের দেশের এক বিঘার মতো হবে।

[নোট: রাজস্বের অন্যান্য প্রকার সম্পর্কে যেমন—গনীমতের মাল, খনিজ পদার্থ, গুপ্তধন ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃতির ভয়ে এখানে আলোচনা করা থেকে বিরত রইলাম। গ্রন্থকার) কিন্তু আমরা মনে করি খনিজ, পদার্থ সম্পর্কে অল্প-বিস্তর আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বর্তমান যুগে (প.প.র.)

জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জনকল্যামূলক ও জনহিতকর কাজের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে 'আল্লামা শামী বলেন : হাট-বাজার স্থাপন, ব্রীজ ও পুল নির্মাণ, 'আলেম-'উলামায়ে কিরাম, জ্ঞানী-গুণী, বিচারকমণ্ডলী ও রাষ্ট্রীয় কর্মচারীবৃন্দের ভরণ-পোষণ, যুদ্ধে আহত ও নিহত সৈনিক ও তার পরিবারবর্গ, রোগী, পঙ্গু লাওয়ারিছ শিশুর আচ্ছাদনের ব্যবস্থা—প্রাসাদ, সীমান্ত ছাউনী নির্মাণ, মসজিদ ও অনুরূপ গৃহাদি নির্মাণ ইত্যাদি সবই জনকল্যাণমূলক কাজের অন্তর্গত।

(পূ:পৃ:পর) পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় বেশী ছিলো। কেননা ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদের গুরুত্ব অসামান্য এবং অনস্বীকার্য। মানব সভ্যতার স্থিতি ও প্রগতির পথে এর ভূমিকা অপরিসীম। মানুষের জৈবিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত খনিজ পদার্থও মাটিতেই মিশে আছে। মানব-সভ্যতার পক্ষে অপরিহার্য লোহা, তামা, পিতল, সোনা-রূপা, হীরা ও মণি-মাণিক্য, পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতি মানুষ খনি থেকেই লাভ করে। সূরা হাদীদে আল্লাহ্ পাক অন্যতম প্রধান খনিজ পদার্থ লোহাকে منافع للناس বা মানুষের জন্য অশেষ কল্যাণকর ঘোষণা করে সমগ্র মানবমণ্ডলীকেই এ থেকে উপকৃত হবার হকদার বানিয়েছে। সর্বসাধারণের হক—প্রতিটি মানুষেরই যার থেকে উপকৃত হবার অধিকার রয়েছে—তাকে কখনই ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত রাখা চলে না—স্বয়ং রসূল (সা)-এর হাদীছ—

الناس مشترك فى الثلاث , الكلاء , والماء , والنار ـ

অর্থাৎ তিনটি দ্রব্যে সকল মানুষের সম-শরীকানা থাকবে,—আর তা হলো—পশুচারণভূমি, পানি ও আগুন—যার উপর কিয়াস করে আমরা অবশ্যই খনিজজাত দ্রব্যাদিকে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত ঘোষণা করতে পারি। অবশ্য রাষ্ট্রীয় মালিকানার কথাটাও ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত সংকীর্ণ। ইসলামে মালিকানার ধারণা আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। ইসলামী অর্থনীতিতে মালিকানার ধারণা আল্লাহ্‌র মালিকানার ধারণার ভিত্তিতে আর এ নীতির ফলেই বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের সাধারণ মানুষটি পর্যন্ত (প:পৃ:দ্র:)

১ম : বেতন-ভাতা

এর অনেকগুলি শাখা-প্রশাখা আছে। বর্তমান গ্রন্থে যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রনীতির সংক্ষিপ্ত একটি খসড়া চিত্র তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য সেহেতু যে সমস্ত শাখা-প্রশাখার বর্ণনা বায়তুল মালের ব্যয় খাত বর্ণনা করতে গিয়ে মোটামুটিভাবে হয়েছে যেমন,—বিচার বিভাগ, প্রশাসন, ছাত্র কল্যাণ, শিক্ষকদের বেতন ভাতা ইত্যাদি; এখানে তার পুনরুল্লেখ করা হবে না।

(পূ-পৃ-পর) আরবের পেট্রোলে, দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণে, ভারতের লোহা ও কয়লায়, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার রবারে, বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত গ্যাসে এবং আমেরিকার গম, রাশিয়ার ও অস্ট্রেলিয়া-ব্রাজিলের উদ্বৃত্ত জমি থেকে উপকৃত হবার অধিকার রাখে। আর এ মালিকানা নীতি প্রতিষ্ঠিত হলে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য সমুদ্র নিক্ষেপ কিংবা জ্বালানীতে পরিণত করা যায় না। ইমাম আবু হানীফা (রা) যদিও খনিজ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ মাত্র রাষ্ট্রের প্রাপ্য বলেছেন—কিন্তু তা ঐ সময় যখন উৎপাদিত খনিজ দ্রব্যের ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ ছিল নিতান্ত সামান্য। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (রা) সর্বাবস্থায় খনিজ সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যার ভিত্তি উল্লিখিত হাদীস। অতএব আমরা নির্দ্বিধায় উল্লিখিত হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম মালিক (রা)-এর মতকে অগ্রাধিকার দিতে পারি। বন-জঙ্গল, সমুদ্র, নদ-নদী, বিস্তৃত খালবিল—মোট কথা যার উপর জনসাধারণ প্রতিটি মুহূর্তে একান্তভাবে নির্ভরশীল—এবং যা ব্যক্তি-মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত থাকলে জনগণের সাধারণ স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা বর্তমান—তেমন বিষয়গুলি অবশ্যই জাতীয় মালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। অন্যথায় পুঁজিবাদকেই প্রশ্রয় দেয়া হবে শুধু, ইসলামের আধুনিক অর্থনীতিবিদগণও এ মতই সমর্থন করেন। ডাক, তার, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিরাটায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান এ নীতিরই আওতাভুক্ত বিষয়। ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা লাভের জন্য এতদ্সংক্রান্ত পুস্তক পড়ে দেখার জন্য পাঠককে অনুরোধ করি।—অনুবাদক।

এখানে শুধু জীবিকা ও প্রয়োজনীয় সম্পদের অপ্রতুলতা এবং এসবের অভাব দূর করে মানুষের জীবনের বাঁচার অপরিহার্য ন্যূনতম মৌলিক দাবী মেটাবার যে গুরু দায়িত্ব খলীফার উপর বর্তায় এখানে তারই একটা খসড়া পেশ করা আমাদের ঐকান্তিক উদ্দেশ্য। কেননা হযরত ফারুক-ই-'আজম (রা) কতকগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে ভাতাপ্রাপ্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মুহাক্কিক দেহলভী (মাওলানা হিফজুর রহমান) 'ইসলাম কা ইকতিসাদী নিযাম' বা ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নামক পুস্তকে ইমাম তাবারীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'নিজামুল 'আলমে ওয়াল উমাম' (দুনিয়া ও তার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস)-এর দ্বিতীয় খণ্ডের ৯৮১ পৃষ্ঠার বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন:

فلما كثرت الاموال فى ايام عمر رض ووضع الديوان
فرض الرواتب للعمال والقضاة ومنع ادخار المال وحرم
على المسلمين اقتناء الضياع والزراعة لان ارزاقهم وارزاق
عيالهم تدفع لهم من بيت المال حتى الى عبيدهم ومواليهم
اراد بذالك ان تبقوا جندا على اهبة الرحيل لا يمنعهم انتظار
الزراع ولا يقعدهم الطرف والقصف - الخ

অর্থাৎ হযরত 'উমর (রা)-এর খিলাফতকালে যখন সারা ইসলাম জাহানে সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিল এবং আদমশুমারীর রেজিস্টার প্রস্তুতের কাজ শেষ হলো—তখন তিনি রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও সকল কর্মচারী, গভর্নর, বিচারক প্রমুখের জন্য বেতন-ভাতা নির্ধারিত করেন এবং বিত্ত-সম্পদের পুঞ্জীভূত করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে জমিদারী ও কৃষিকাজকে নিষিদ্ধ করা হলো। কেননা তাদের গ্রাসাচ্ছদনের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি-ভাতা বায়তুল মাল থেকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয় তাদের পরিবারবর্গের জন্যেও ভাতা নির্ধারিত হয়েছিল—এমনকি তাদের ক্রীতদাস ও আযাদকৃত গোলামদের পর্যন্ত ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা বায়তুল মাল থেকেই করা হয়েছিল—কেননা এর একমাত্র উদ্দেশ্য

ছিল যেন গোটা জাতিই সৈনিক ও যোদ্ধা জাতি হিসাবে গড়ে ওঠে এবং সদা-প্রস্তুত অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে অগ্রসর হওয়ার জন্য তৈরী থাকে। তাদের এ যাত্রাপথে জমিদারী কৃষিকাজ যেন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে এবং তারা যেন অলস জীবনও বিলাসিতায় নিমজ্জিত না হয়।

দারিদ্র্য দূরীকরণে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী

'শারাহ শির'আতুল ইসলাম' নামক গ্রন্থে সৈয়দ 'আলীযাদা-হানাফী শাসকের (আমীর) দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে' আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন :

ولا يدع فقيرا في ولايته الا اعطاه ولا مديونا الا قضى عنه دينه ولا ضعيفا الا اعانه ولا مظلوما الا نصره ولا ظالما الا منعه عن الظلم ولا عاريا الا كساه كسوة الخ -

অর্থাৎ (আমীরের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো) তিনি স্বীয় শাসনাধীন অঞ্চলে ও দেশে কোন দরিদ্রকে দরিদ্র থাকতে দেবেন না—অর্থাৎ তিনি জনগণের দারিদ্র্য দশা দূর করবেন; ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণের হাত থেকে মুক্ত করবেন; দুর্বল ও মজলুমকে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন; জালিমকে তার জুলুম থেকে বিরত রাখবেন—এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেবেন ইত্যাদি।"

আদম শুমারী

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এর আসল ও প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো সমগ্র রাষ্ট্রে তথা দেশের আনাচে-কানাচে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে যত বেকার, দরিদ্র, অক্ষম, চিররোগী এবং অভাবী লোক আছে তাদের সংবাদ সংগ্রহ করা এবং তাদের জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা। আর এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই হযরত 'উমর (রা) গোত্র ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে আদম শুমারীর তালিকা প্রস্তুত করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক তাবারী বলেন :

كتب الناس على قبائلهم وفرض لهم العطاء -

অর্থাৎ হযরত 'উমর (রা) গোত্রীয় ভিত্তিতে আদম শুমারী করান এবং ...দের ভাতা নির্ধারিত করেন। ফতুহুল বুলদান ও তাবারীতে অন্যত্র ...া হয়েছে :

قال حزام رايت عمر رض بن الخطاب يحمل د واوين خزاعة حتى ينزل قديدا فتاتيه بقديد فلا يغيب عنه امراة بكر ولا ثيب فيعطيهن فى ايدهن ثم يروح بعسفان فيفعل مثل ذالك ايضا حتى توفى -

অর্থাৎ "হিযাম বলেন : আমি হযরত 'উমর (রা)-কে খুযা'আ গোত্রের রেজিস্টার হাতে কাদীদ নামক স্থানে গিয়ে ভাতা বণ্টন করতে দেখেছি। এমন কি কুমারী ও বিধবা মহিলাদের নাম-পরিচয় এ উক্ত রেজিস্টার বহির্ভূত ছিল না। তারা তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাচ্ছিল। এভাবেই তিনি আসফান নামক স্থানে গিয়ে এমত ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রতি বছর এভাবেই তিনি দায়িত্ব পালন করতেন।'

দুগ্ধপোষ্য শিশু ও বিধবাদের জন্য ভাতা

হযরত 'উমর (রা)-এর খিলাফতকালে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য দশ দিরহাম হারে ভাতা নির্দিষ্ট করেছিলেন। এরপর কিছু বড় হলে দু'শ' দিরহাম ভাতা পেত এবং পূর্ণবয়স্ক হওয়ার সাথে ভাতাও বৃদ্ধি পেত।

ইমাম আবূ দাউদ স্বীয় হাদীছ গ্রন্থে باب ارزاق الذرية শিশুদের খোরপোষ সম্পর্কিত অধ্যায়ে বলেন :

كان رسول الله ص يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا او ضياعا فالى وعلى -

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) বলতেন—যদি কেউ সম্পদ রেখে মারা যায় তবে তা তার উত্তরাধিকারীর। কিন্তু কেউ যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় অথবা অসহায় শিশু রেখে মারা যায় তবে সে ব্যাপারে সার্বিক দায়িত্ব আমার। অর্থাৎ শিশু, বিধবা, অসহায় ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের লালন-পালনসহ সার্বিক

ভরণপোষণের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের এবং বায়তুল-মাল এর যিম্মাদারী হবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ হাদীছঃ

تؤخذ من اغنياءهم فترد فى فقرائهم -

অর্থাৎ ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ কর আর দরিদ্রের ভিতর তা বিতরণ কর। ধনীদের নিকট থেকে সাদাকাহ্ গ্রহণ করে গরীব ও অভাবী লোকদের মধ্যে বিতরণ করার অনুকূলে এ একটা মস্ত বড় দলীল। মোট কথা, জীবিকার্জনে যারাই অক্ষম ও বঞ্চিত যেমনঃ পঙ্গু, দুর্বল, বৃদ্ধ, রোগী, বিকলাঙ্গ, এতিম শিশু ও বিধবা কিংবা যারা অন্যবিধ কারণে জীবিকার্জনে অক্ষম ও অসহায়—তাদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের সামগ্রিক দায়-দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের। কিতাবুল খারাজে হযরত 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

اما والله لئن بقيت لارامل اهل العراق لا دعهن لا يفتقرن الى امير بعدى -

"জেনে রেখ,—আল্লাহ্‌র কসম! তিনি যদি আমাকে কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখেন তবে ইরাকের বিধবাদের এমন অবস্থায় রেখে যাব যেন আমার পরে তাদের অপর কোন আমীরের মুখাপেক্ষী না হতে হয়।"

অসহায় অভাবী জনগণের ভাতা ও বৃত্তি নির্ধারণে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মুসলিম ও অমুসলিমের মাঝে কোন ভেদরেখা টানে নি। বরং ইসলাম স্বীয় ন্যায়ানুগ ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবস্থাধীনে কোন একজন অভাবীকেও অভাবগ্রস্ত ও জীবিকা থেকে বঞ্চিত রাখা জায়েয মনে করে না। হযরত 'উমর (রা) বলতেনঃ

ايما رجل شاب وضعف عن العمل و صار اهل دينه يتصدقون عليه طرح عنه جزيته وعيل من بيت المسلمين -

'কোন বেকার ও অক্ষম যুবক যদি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়—তবে তাকে সাহায্য করা হবে—জিয্য়া থেকে মুক্ত করা

হবে এবং মুসলমানদের সাধারণ ধনভাণ্ডার থেকে তাকে লালন-পালনের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি এও বলতেন ঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ -

আয়াতটিতে বর্ণিত 'ফকীর' শব্দটি মুসলমানদের ক্ষেত্রে এবং 'মিসকীন' বলতে অমুসলিমদের বুঝাবে। ইতিহাস গ্রন্থ তাবারী ও কিতাবুল খারাজ পাঠে জানা যায়—শত শত অমুসলিম অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি বায়তুল-মাল থেকে ভাতা পেত। 'জিযয়া' শীর্ষক অধ্যায়ে এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে; আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে ভবিষ্যতে যিম্মীদের অধিকার সম্পর্কে আরও কিছু লিখবো।

লা-ওয়ারিছ শিশুদের ভাতা

ধর্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের মতে লা-ওয়ারিছ শিশুদের لقيط বলা হয়ে থাকে। এদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের সার্বিক দায়দায়িত্ব বায়তুল-মালের উপর গিয়ে বর্তাবে। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। হযরত 'উমর (রা) অষ্টাদশ হিজরীতে ফরমান জারী করেন,—যে সমস্ত লা-ওয়ারিছ শিশু-বাচ্চা রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যাবে—তাদের দুধপানসহ যাবতীয় ব্যয় বায়তুল-মাল থেকে নির্বাহ করা হবে। এদের ভাতা একশত দিরহাম থেকে শুরু হতো এবং প্রতি বছরই তা বৃদ্ধি পেত। গ্রন্থকার আবদুর রায্যাক, মুসনাদে ইমাম শাফে'য়ী ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক নামক হাদীস গ্রন্থে বলা হয়েছে—বনু সলীম গোত্রের এক ব্যক্তি এ ধরনের একটি বাচ্চা নিয়ে এসে উপস্থিত হলে হযরত 'উমর (রা) বললেন ঃ وعلينا من بيت المال—অর্থাৎ একে নিয়ে যাও। এর লালন-পালনসহ সব কিছুর সার্বিক যিম্মাদার হবে বায়তুল-মাল। والله الهادى

দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা

ইমাম জাস্সাস্ রাযী আহকামুল কুরআন নামক গ্রন্থে সূরা ইউসুফের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন ঃ দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রে সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি কর্ণধার হবেন তাঁর। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত

এলাকার জনগণের দুঃখ-কষ্ট নিবারণে ও তাদের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করণে সম্ভাব্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালানো তাঁর জন্য ফরয। দুর্ভিক্ষ জনগণের জন্য এক দুঃসহ মুসীবত। হযরত 'উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালে একবার যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন তিনি কসম খেয়েছিলেন —যতদিন না এর সম্পূর্ণ নিরসন হয় তিনি ঘি খাবেন না ও দুধ পান করবেন না। সমস্ত গভর্ণর ও প্রশাসকদের নিকট তিনি লিখে পাঠান যেন তারা এই মুহূর্তে মদীনাবাসীদের সাহায্য এগিয়ে আসেন। এরপর হযরত আবূ 'উবায়দা (রা) চার হাজার খাদ্যশস্য ভর্তি উট নিয়ে খলীফার দরবারে হাযির হন। হযরত 'আমর বিন 'আস (রা) যিনি ছিলেন মিসরের গভর্ণর জেনারেল—বিশটি জাহাজ ভর্তি খাদ্য শস্য পাঠিয়ে দেন। হযরত 'উমর (রা) প্রবীণতম সাহাবাদের নিয়ে স্বয়ং স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণের জন্য 'জার' নামক বন্দরে গিয়ে হাযির হন। খাদ্য শস্য রাখবার জন্য তিনি দুটি গুদাম ঘর নির্মাণ করেন এবং হযরত যায়দ বিন ছাবিত (রা)-কে নির্দেশ দেন যেন তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের তালিকা প্রস্তুত করেন। তালিকাভুক্ত লোকদের নামে চেক পাঠানো হতো যার উপর খলীফার সীলমোহর অংকিত থাকতো।

হিংস্র ও ক্ষতিকর জন্তু-জানোয়ার হত্যা

ইমামকুল শিরোমণি শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রা) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক গ্রন্থের سياسة المدن বা শহুরে রাজনীতি শীর্ষক অধ্যায়ে ক্ষতিকর হিংস্র জীবজন্তু হত্যা ও ধ্বংস করাকে এর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হাল আমলের দুনিয়ার সভ্য রাষ্ট্রগুলি নিজ নাগরিকবৃন্দের কল্যাণ ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ক্ষতিকর জীবজন্তু হত্যা ও বিনাশের প্রয়াস চালিয়ে থাকে। ইসলামী খিলাফতে হযরত 'উছমান (রা)-এর যমানায় সর্বপ্রথম এ কাজ শুরু হয়। অতঃপর নাসীবাঈন নামক স্থানে যখন বিছার উৎপাত ও অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়, জনগণের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে—তখন বিছা ধরবার জন্য লোক নিযুক্ত করা হয়। 'মু'জামুল বুলদান' নামক পুস্তকেও এ কথাই বলা হয়েছে। সিজিস্তান নামক স্থানে

গের আধিক্য ছিল। 'উছমান (রা) খিলাফতকালে হযরত 'আবদুর রহমান বিন সামুরা সন্ধিসূত্রে যখন সিজিস্তান জয় করেন—তখন সন্ধিচুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল খারপাশ্ত ও বেজী যারা সাপ খায় কেউ মারতে পারবে না। তিরমিযী শরীফে হুযূর আকরাম (সা)-এর নির্দেশ এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

জন উন্নয়নমূলক কাজ

এ প্রসঙ্গে আলোচনার শুরুতেই 'আল্লামা শামীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে কথাটিকে আরও পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, সমস্ত প্রকার জনকল্যাণমূলক কাজের যিম্মাদার রাষ্ট্র, জনগণের যখনই যা প্রয়োজন হবে তার ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে। এখানে কতকগুলি অপরিহার্য বিষয়ের অবতারণাকেই যথেষ্ট মনে করছি।

১. ফাঁড়ি ও সরাইখানা :

এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। মুসাফির ও পথিকদের সুখ-সুবিধার দিকে হযরত 'উমর (রা)-এর তীক্ষ্ম নজর ছিল। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে ঘর-বাড়ী নির্মাণের জন্য যখন জনগণ খলীফার নিকট অনুমতি লাভের আবেদন জানায় তখন তিনি এই শর্তে অনুমতি দিয়েছিলেন যে, মুসাফির ছায়া ও পানির বেশী হকদার। মাকরিযী নামক গ্রন্থে বর্ণিত যে, তিনি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এমন অনেক লোক নিযুক্ত করেছিলেন—যাদের একমাত্র কাজ ছিল পথহারা লোক ও পথভ্রষ্ট কাফেলাকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়া।

২. মেহমানখানা :

'ফতুহুল বুলদান' গ্রন্থে বলা হয়েছে :

امر عمر رض ان يتخذ لمن يرد من الافاق دارا فكانوا ينزلونها -

অর্থাৎ হযরত 'উমর (রা) মুসাফিরদের জন্য কুফায় মেহমানখানা নির্মাণের আদেশ দিয়াছিলেন—যেখানে তারা অবস্থান করতে পারে। পরে ক্রমে ক্রমে এ বিষয়ে আরও অনেক উন্নতি সাধিত হয়।

৩. পুকুর ও খাল বিল :

হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদীনায় বহু কূপ ও চৌবাচ্চা নির্মাণ করান। 'বীরে রুমা' নামক কূপ সম্পর্কিত ঘটনা এবং এ সম্পর্কে রসূলে করীম (সা)-এর ফরমান, কুকুরকে পানি পান করানোর কাহিনী ও এ সম্পর্কিত ফরমান এবং এ জাতীয় বহুবিধ জনহিতকর কার্যাদির জন্য উৎসাহব্যঞ্জক নির্দেশাদি ও বাণী বুখারী মুসলিমসহ সমস্ত হাদীছ গ্রন্থে বর্তমান। হযরত 'উছমান (রা) কর্তৃক নিযুক্ত বসরার গভর্নর হযরত 'আবদুল্লাহ্ বিন 'উমায়ের (রা) সর্বাগ্রে আরাফাত ময়দানে অনেকগুলি চৌবাচ্চা নির্মাণ করেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) মক্কা ও মদীনা ব্যতীত অন্যান্য শহরগুলিতেও অনেক নদী-নালা খনন করান। সরকারী ব্যবস্থাপনায় যে সমস্ত নদী-নালা খনন করা হয়েছিল তন্মধ্যে নহরে আবু মূসা, নহরে আবু মা'কাল, নহরে আমীরুল মু'মিনীন প্রভৃতি বিখ্যাত। বিস্তারিত ফতুহুল বুলদান, ওয়াফাউল ওয়াফা ইত্যাদিতে দেখুন।

৪. কৃষি সেচ খাল :

যেহেতু কৃষির উন্নতি ও অবনতির উপর জাতির সামগ্রিক অস্তিত্ব নির্ভরশীল সেহেতু গোটা দেশে কৃষির সার্বিক উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো ইমামের উপর ফরয। ইমাম আবু ইউসুফ (র) কিতাবুল খারাজে বলেন :

وإذا احتاج أهل السواد الى كرى أنهارهم العظام التى تأخذ من دجلة والفرات كريت لهم وكانت النفقة من بيت المال وأما المثقوب والمسنيات والبريدات التى تكون على شط دجلة والفرات وغيرها من الانهار العظام فان النفقة على هذا كله من بيت المال الخ -

"অতঃপর (ইরাক-অন্তর্ভুক্ত) 'সওয়াদ'বাসী যখন দজলা ফোরাতের পানি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সৃষ্টির মাধ্যমে ভাড়া প্রদানের ভিত্তিতে সরবরাহের আবেদন জানায় তাদের সে আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং বায়তুল মাল থেকে তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা হয়। ঠিক তেমনি নদী ও সমুদ্রোপকূলের ভগ্নাংশ, সেচ ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী জমি, ডাকঘর যা কিছু, দজলা ও ফোরাত প্রভৃতি নদীনালার মুখাপেক্ষী সব কিছুর জন্য পানি সরবরাহের যাবতীয় ব্যয়ভার বায়তুল মাল থেকে নির্বাহ করা হতো।"

'আল্লামা শিবলী নু'মানী প্রণীত ঐতিহাসিক 'আল-ফারূক' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, হযরত 'উমর (রা) সমগ্র বিজিত এলাকায় নদী-নালা প্রবাহিত করেন—বাঁধ তৈরী করেন, পুষ্করিণী খনন করান, পানি সরবরাহের জন্য জলাধার সৃষ্টি করান, নদ-নদীর শাখা-প্রশাখা বের করেন এবং এ জাতীয় কাজ সম্পাদনের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগের পত্তন করেন। 'আল্লামা মাকরিযী বলেন: একমাত্র মিসরেই এক লাখ বিশ হাজার শ্রমিক বছর কাল অবধি প্রত্যহ অনুরূপ কাজে লিপ্ত থাকতো।

৪. শেফাখানা : হাসপাতাল

শেফাখানা বা হাসপাতাল স্থাপন খিলাফতের অপরিহার্য মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এটাও জনকল্যাণমূলক কাজেরই একটা প্রধানতম অংশ। মুকাদ্দমা ইবনে খলদুনে এ সম্পর্কে বিশদভাবে বলা হয়েছে। 'আল্লামা শামী المرضى শব্দটি থেকে অনুরূপ মর্মার্থই গ্রহণ করেছেন। ফিকাহ্র কিতাবাদি থেকেও এমত ধারণাই লাভ করা যায়। 'আল্লামা আয়নী এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন—ইসলামী হুকুমতের জন্য কুষ্ঠ হাসপাতাল স্থাপন করা অবশ্যকরণীয়। আর এর আনুষঙ্গিক ব্যয়াদি নির্বাহের জন্য রাষ্ট্রই একমাত্র যিম্মাদার। এমনিভাবেই মানসিক রোগী, পাগলদের জন্য 'মানসিক হাসপাতাল' স্থাপন করাও অত্যন্ত জরুরী যা তাদের সামগ্রিক প্রয়োজন পূরণের যিম্মাদার হবে।

৬. জেলখানা :

হাদীছ ও ফিকাহ্‌র কিতাবাদিতে এতদ্‌সম্পর্কে বিস্তারিত লিখিত আছে। হযরত ফারুক-ই-আ'জম (রা) কতিপয় জেলখানা নির্মাণ করেন। কাযী আবু ইউসুফ (র) কিতাবুল খারাজে বলেন : জেলখানার সকল কয়েদীর খানা-পিনা ও পোষাক-পরিচ্ছদ বায়তুল মাল থেকে সরবরাহ করতে হবে। তিনি আরও বলেন : সকল কয়েদীর একটি রেজিস্টার তৈরী করে প্রত্যেককে বছরে দু'বার কাপড় দিতে হবে। এদের ভেতর কেউ যদি মারা যায়—তবে সরকারী ব্যবস্থাপনায় তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা হবে।

৭. ব্রীজ, রাস্তা, কালভার্ট, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ :

হাদীছ ও ফিকাহ্‌র কিতাবাদিতে এ সম্পর্কে বিশদভাবে বলা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে হলে বাহরুর্‌রায়েক, ফতহুল কাদীর, 'ইনায়া ইত্যাদি দেখুন। এগুলি নির্মাণ ও মেরামতকে সাদাকাহ্‌ ও যাকাতে ব্যয় খাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৮. ঘর-গৃহ নির্মাণ :

যে সমস্ত ঘর-গৃহ জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার সাথে জড়িত সেগুলির নির্মাণ, মেরামত ও হিফাজতের সার্বিক দায়-দায়িত্ব খলীফার। দেখুন 'হুজ্জতুল্লাহিল বালিগা'। সেহেতু সর্বাগ্রে হযরত 'উমর (রা) এদিকে দৃষ্টি দেন এবং সরকারী কাজ-কর্মের জন্য যে সংখ্যক গৃহাদির প্রয়োজন পড়ে তার অধিকাংশই তাঁর আমলে নির্মিত হয়েছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও জেলা প্রশাসকদের সরকারী বাসভবন তিনিই নির্মাণ করান। বায়তুল মালের কয়েকটি শাখা তিনিই কায়েম করেছিলেন। মদীনায় একটি কেন্দ্রীয় রাজস্বভাণ্ডার (ট্রেজারী) নির্মাণ করেন। কেন্দ্রীয় বায়তুল মালের বিস্তৃতির ধারণা ও অনুমান এ থেকে করা যায় যে, রাজধানীর সকল অধিবাসীর জন্য যে পরিমাণ ভাতা নির্দিষ্ট ছিল তার পরিমাণ ছিল বছরে তিন কোটি দিরহাম। এর সবটাই উক্ত কেন্দ্রীয় বায়তুল মালেই রক্ষিত থাকতো। হযরত 'উমর (রা) নির্মাণ ক্ষেত্রে যদিও অত্যন্ত ব্যয়-সংকোচনের পক্ষপাতী ছিলেন

কিন্তু বায়তুল মালের জন্য নির্মিত ইমারত-গৃহাদি সাধারণত জাঁকজমকপূর্ণ, মজবুত ও সুদৃঢ় ভিত্তিতেই তৈরী করতেন। কুফার বায়তুল মাল রোজবা নামক একজন অগ্নি-উপাসক রাজমিস্ত্রী তৈরী করেছিলেন। এতে পারস্য সম্রাটের প্রাসাদে ব্যবহৃত মাল-মশলা ব্যবহার করেছিলেন। তিনি মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত প্রতিটি মনযিলে ফাঁড়ি, সরাইখানা ও চৌবাচ্চা তৈরী করেছিলেন।

৯. শহর নির্মাণ :

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, শহর নির্মাণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংগ। শহরে বসতি স্থাপনের পর বিশাল মসজিদ, বিরাটায়তন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিয়ে সুসজ্জিত করা ধর্মীয় সুরুচি ও উন্নতির পরিচয়বাহী। নানা ধরনের মিল, কল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, পূর্ণ সজ্জিত শহর পার্থিব ও বস্তুগত কল্যাণের নিশানবাহী। পবিত্র কুরআনুল করীম সূরা সাবার মধ্যে যা হযরত দাউদ (আ), হযরত সুলায়মান (আ)-এর সাবা কওমের ঘটনা ও অবস্থাদি একত্রিত করে অত্যন্ত বিস্তৃত অথচ সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতের সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। বিজ্ঞজনের জন্যে তা একটি স্থায়ী ও বিস্তৃত শিক্ষণীয় বিষয় বটে। মুসলমানেরা এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বুঝতে কতদূর সক্ষম ও সমর্থ হয়েছিল এবং তাকে বাস্তবায়িত ও কার্যকরী করতে কতদূর কামিয়াব হয়েছিলেন—তার জবাব আপনারা দামেশক, বাগদাদ, সমর-কন্দ, বোখারা, নিশাপুর, হলব (আলেপ্পো), কুফা, বসরা, কর্ডোভা, গ্রানাডা, কায়রোয়ান, ফুস্তাত, দিল্লী, আগ্রা ও অন্যান্য মুসলিম রাজধানী ও শহরগুলির ইতিহাস যা ইসলামের ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে—পাবেন। শুধু দামেশক শহর এবং তথা ইসলামের স্মৃতিচিহ্নগুলির ইতিহাস একত্রিত করতে হাফিজ ইবনে 'আসাকিরকে একশ' খণ্ডেরও বেশী লিখতে হয়েছিলো। খতীব বাগদাদীকে বাগদাদের ইতিহাস লিখতে গিয়ে বিরাটকৃতির ২২টি খণ্ড তৈরী হওয়ার পর তাঁর জীবন প্রদীপ তাকে আর বেশী সময় দিতে রাজী হয় নি। ইসলামী খিলাফতের প্রাক্কালে হযরত 'উমর (রা) বসরা, কুফা, ফুস্তাত, মুসিল, জিজা প্রভৃতি পৃথিবী বিখ্যাত শহরগুলির

বুনিয়াদ পত্তন করেন যার বিস্তারিত বিবরণ সকল সীরত ও ইতিহাস পুস্তকে মিলবে। কুফা শহর পত্তনের মুহূর্তে এর নকশা সম্পর্কে তিনি যে মূল্যবান ভূমিকা লিখে পাঠিয়েছিলেন তা মুসলিম জনগণের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয় বিষয়। বিস্তারিত লেখা সম্ভব নয় বিধায় সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করছি। প্রেরিত ভূমিকা লিপিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল—শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি যেন চল্লিশ হাত প্রশস্ত করা হয়। এর কমে ত্রিশ হাত এবং কোন রাস্তা কোন ক্রমেই বিশ হাত প্রস্থের কমে হতে না পারে। শহরের জামে' মসজিদের ইমারত এত বিশাল ও প্রশস্ত করে নির্মাণ করা হয়েছিল যেন চল্লিশ হাজার লোক একই সাথে অত্যন্ত আরাম আয়েশের সাথে সালাত আদায়ে সমর্থ হয়। মসজিদের সামনে ২০০ হাত প্রশস্ত আঙ্গিনা—যা মার্বেল পাথরের খুঁটির উপর স্থাপন করা হয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে উন্নতি ও প্রগতি সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম নখ্'য়ী, ইমাম হাম্মাদ এবং ইমাম শা'বীর ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধ ও বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিবর্গ এই শহরের ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

অর্থনীতির উদ্দেশ্য

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

যেহেতু ইসলাম জগতের খলীফা আইনানুগ সরকারের অধীনস্থ নাগরিকবৃন্দের রাখাল, রক্ষক ও সর্বোচ্চ প্রশাসক—সেহেতু খলীফার জন্য এটা ফরয যে, তিনি রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে বিশুদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে পরিচালিত করবেন এবং ভ্রান্ত ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎসাদন ও মূলোৎপাটন করবেন। যে ব্যবস্থাপনায় মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশুদ্ধতা ও বিপর্যয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়—তাকে অর্থনীতি বলে। বর্তমান যুগে এটা জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটা স্থায়ী শাখায় পরিণত হয়েছে। হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব দেহলভীর এ সম্পর্কিত একটি পুস্তক রয়েছে- সমগ্র উর্দু সাহিত্যে যার কোন নজীর নেই।

গ্রন্থকারকে যেহেতু সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ করতে হবে সেহেতু হাতে গোনা কতিপয় নিয়মাবলী বর্ণনার উপর এই বিশালায়তন বিভাগের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত আলোচনা সমাপ্ত করবো।

নিয়ম : ১

অর্থনীতি দু'ধরনের : একটি ব্যক্তিগত,—অপরটি সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয়।

নিয়ম : ২

হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রবর্তিত ইসলামী জীবনদর্শনের অনুসরণের ভেতর দিয়েই কেবল বিশুদ্ধ অর্থনীতি লাভ করা যায় এবং একে বর্জনের ভেতর দিয়ে অর্থনীতি ক্ষেত্রে একমাত্র বিপর্যয়ই সৃষ্টি হয়।

নিয়ম : ৩

ইসলাম সমগ্র সৃষ্টি জগতের সামনে অর্থনীতির যে উত্তম ব্যবস্থা পেশ করেছে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। এতে সংস্কার ও পরিমার্জন মূর্খতা ও বোকামী এবং এরূপ প্রচেষ্টাকারী মুলহিদ ও যিন্দীক।

নিয়ম : ৪

যদিও হুযূর (সা)-কে দুনিয়ায় পাঠাবার উদ্দেশ্য সরাসরিভাবে আল্লাহর ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত—তথাপি 'ইবাদতের সাথে সাথেই সকল ভ্রান্ত নিয়ম-নীতি ও রসম-রেওয়াজের অবসান ঘটিয়ে একটি বিশুদ্ধ ও সুস্থ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন কায়েম করাও ছিলো এরই লক্ষ্য ও উদ্দেশের অন্তর্গত। রসূল (সা)-এর আগমনের শত শত বছর পূর্ব থেকেই পারসিক ও রোমানরা রাজত্ব করে আসছিলো। পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসকেই তারা জীবনের ধ্রুবতারা বানিয়ে নিয়েছিলো। প্রতিটি ব্যক্তিই পুঁজিবাদ ও অর্থবিত্ত সঞ্চয়ের উদগ্র লালসা-কামনার ভেতর ডুবে গিয়েছিলো। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নাজায়েয ট্যাক্স ইত্যাদির প্রচলন ঘটে। জনসাধারণের ভেতর চরিত্র ও নৈতিকতা বিধ্বংসী কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে

থাকে। শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী মানুষের অভাব ও দারিদ্র এক সঙ্গীন অবস্থা সীমা ছাড়িয়ে যায়। তাদের এতটুকু সামর্থ ছিলো না যে, তারা নিজেদের অভাব ও চাহিদা মাফিক কিছু উৎপন্ন করবে। মোট কথা, সর্বত্র জুলুম, নীতি ও চরিত্র বিরোধী কার্যকলাপ বিস্তারি শেষ সীমায় গিয়ে পেঁছে। শেষ অবধি রোগ যখন আরোগ্য লাভের পর্যায় অতিক্রম করতে উপক্রম করে—ঠিক তেমনি মুহূর্তে আল্লাহ্ পাকের ক্রোধবহ্নি জ্বলে ওঠে এবং আল্লাহ্র মর্যাদাবোধের দাবী এমনি সক্রিয় হয়ে ওঠে যে, তিনি উল্লিখিত সব রোগের এরূপ চিকিৎসা করলেন যেন ভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের বুনিয়াদ মুলশুদ্ধ উপড়ে ফেলা যায় এবং চিরদিনের জন্যে তার পথও বন্ধ হয়ে যায়।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক স্বীয় অপার করুণা ও বদান্যতার কারণে একজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে নবী ও রসূল করে পাঠান। তিনি আসলেন এবং রোম ও পারস্যের ঐ সমস্ত ভ্রান্ত ও বিপর্যয়মূলক প্রথা-পদ্ধতি ধ্বংস করে দেন এবং আজম (আরব বহির্ভূত এলাকা) ও রোম সাম্রাজ্যের বাতিল ও গোমরাহ প্রথা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে সুস্থ ও সঠিক বিশুদ্ধ নীতির উপর একটি নতুন ব্যবস্থাপনার বুনিয়াদ স্থাপন করেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে ইমামশ্রেষ্ঠ ইসলামের বিজ্ঞ দার্শনিক হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রা)-এর গ্রন্থাদি পাঠ করুন। এখানে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'র ১ম খণ্ডের—

اقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم

নামক অধ্যায় থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

فان كنت فقد احطت علما بما هذا لك فاعلم - ان اصل بعثة الانبياء وان كان لتعليم وجوه العبادات اولا . . . ما اعتاده الاعاجم وتبا هوا بها . انتهى ملخصا —।

টীকা ১ ঃ—উদ্ধৃত আরবী অংশটুকু ৪নং নিয়মের পুরা বক্তব্যের মূল আরবী ভাগ। কাজেই পুনরায় অনুবাদ থেকে বিরত রইলাম। অনুবাদক

নিয়ম ৫ :

ইসলাম ব্যক্তিগত মালিকানা সমর্থন করে কিন্তু পুঁজিবাদের শয়তানী ও পাপপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলিকে নাজায়েয ও হারাম ঘোষণা করে। শরীয়তের বিভিন্ন দলীল প্রমাণ ও আল্লাহ্‌র ঘোষণা—

كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔

এবং এর পক্ষে হুজ্জতুল্লাহির বালিগার বিভিন্ন অধ্যায় এর অনুকূলে সমর্থন ঘোষণা করে।

নিয়ম ৬ :

ইসলাম যেহেতু ন্যায়, ইনসাফ, ভারসাম্যমূলক, সুদৃঢ় ও পূর্ণাঙ্গ কার্যকর জীবনব্যবস্থা, সেহেতু ইসলাম অর্থনীতি ব্যবস্থায় ওয়াজ-নসীহত, নৈতিক ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এবং ক্ষমতার সাহায্য-সহায়তায় অর্থনীতির সেই উৎসগুলি—যার সাহায্যে পুঁজিবাদের শয়তানী ও ভীতিকর প্রক্রিয়াগুলি জন্মলাভ করে এবং সাধারণ জনসমাজে নীতি ও চরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে—অত্যন্ত শক্ত হাতে প্রতিরোধ করে এবং অর্থনীতির যে সমস্ত উৎসমূল এর হাত থেকে মুক্ত ও পবিত্র তাকে প্রতিপালন করে থাকে। ওয়াজ-নসীহতের দ্বারা তাতে উৎসাহ যোগান হয় এবং তাকে রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্য সর্বোচ্চ ধাপে উন্নীত করা হয়। আর এটা এজন্য করা হয় যেন ইসলামী আইনানুগ সরকারের অধীনে কোন লোকই জীবিকার্জনে বঞ্চিত এবং কাঙাল না থাকে। ঠিক তেমনি অপর দিকে সম্পদ-বিত্তের পাহাড় জমিয়ে কেউ কারূনও যেন হতে না পারে। এবার আমরা অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে সে সবের একটা খসড়া চিত্র এখানে পেশ করছি।

১ম ভাগ :

অর্থনীতির সে সমস্ত মাধ্যম ও উৎস যার সাহায্যে অবৈধ পুঁজিবাদ বর্ধিত হয়—নীতি ও চরিত্র বিধ্বংসী কার্যকলাপ বিস্তার লাভ করে—সেগুলি বন্ধ

ভাগে বিভক্ত। এ সবের মধ্যে প্রসিদ্ধ বিভাগগুলির সংক্ষিপ্ত খসড়া পেশ করা হলো।

১ম প্রকার জুয়া :

জুয়াকে আরবীতে مخاطره ، قمار ও ميسر বলা হয়ে থাকে—যা অকাট্য হারাম। কুরআনুল করীমের ভাষায় :

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ

مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ

وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝

“—মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর—যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চাহে! তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না?” ইসলামকুল শিরোমণি হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রা) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় বলেন: জুয়া বিলকুল হারাম এবং বাতিল। এর প্রচলনের ফলে সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং সামাজিক জীবন একদম ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যায় এবং এরই সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার অশ্লীল ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ সমাজ ও রাষ্ট্রের বুকে বিস্তার লাভ করে থাকে। মোটকথা قمار বা জুয়া যত প্রকারের আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এর যত প্রকার উদ্ভাবন আবিষ্কার সম্ভব সবগুলিই সম্পূর্ণ হারাম। এখন আমরা এর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা ও পরিচিতি লিখব।

القمار—: জুয়া।

قمر থেকে উদ্ভূত যার অর্থ চাঁদ। যেহেতু চাঁদ বাড়ে এবং কমে—সেহেতু শরীয়তের পরিভাষায় সকল প্রকার কার্যকলাপ যার ভেতর হার-জিত বর্তমান এবং যার একপক্ষ হারবার আশংকা ও অপরপক্ষ জিতবার আশা পোষণ করে। বিজিতপক্ষ হেরে যাবার ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়—আরবী ভাষায় একেই قمار - میسر ও خطار বলা হয়।

الميسر—: জুয়া।

يسر শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ সহজ। শরীয়তের পরিভাষায় قمار এবং خطار কে এজন্যেই ميسر বলা হয়ে থাকে যেহেতু তা বিনা মেহনতের ফসল। আরবে জুয়ার প্রচলন ছিলো অত্যন্ত বেশী আর তা ছিলো বিভিন্ন ধরনের। বিখ্যাত তফসীরে খাযেনের ১ম খণ্ডে জুয়ার একটি ছবি আঁকা হয়েছে। যেমনঃ ধরুন, একটি উট জবাই করে সমস্ত গোশ্‌ত ত্রিশভাগে বিভক্ত করে প্রতি ভাগ গোশ্‌তের দাম এক টাকা নির্দিষ্ট করা হলো। এরপর ত্রিশজন লোকের নিকট থেকে ত্রিশ টাকা আদায় করে জুয়াড়ীর নিকট রেখে দেওয়া হলো; জুয়াড়ীর নিকট কয়েকটি তীর রক্ষিত। কতকগুলি খালি,—কতকগুলিতে দশ, কোনটিতে পনের ও পাঁচ লিখিত। এরপর যার নামে পনের লিখিত তীর বের হতো সে ১৫টি ভাগ পেত। ঠিক অনুরূপভাবে যার নামে দশ সংখ্যা লিখিত তীর বের হতো—তার ১০টি ভাগ; পাঁচ লিখিত তীরের ক্ষেত্রে পাঁচটি ভাগ মিলতো। বাকী লোকদের ভাগে কোন কিছুই মিলতো না। শরীয়তে মুহাম্মদী এ ধরনের সকল প্রকার কার্যকলাপই নিষিদ্ধ তথা হারাম ঘোষণা করেছে। চাই কি এ ধরনের কার্যকলাপ দু'ব্যক্তির মধ্যেই হোক অথবা একদল লোকের মধ্যেই হোক, চাই কি তা টাকা-পয়সা সংক্রান্তই হোক—কিংবা তা খেলাধূলার আকারেই হোক অথবা কেনাবেচারূপেই হোক। এর মধ্যে সাধারণে প্রচলিত টাকা-পয়সা সংক্রান্ত জুয়াও শামিল। আধুনিক কালের শব্দ-পূরণ প্রতি-যোগিতা, লটারী, বীমা, রেস, সিট্টা, লটারী জাতীয় খেলা, ঘোড়ার উপর

টাকা-পয়সার বাজী ধরা ইত্যাদি সবই জুয়ার অন্তর্গত। আর তা সবই অকাট্য হারাম। মুহ্‌তামিদ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

القمر كل لعب يشترط فيه ان ياخذ الغالب من المغلوب شيا سوا كان بالورق او غيره-

অর্থাৎ জুয়া তাকেই বলা হয় যেখানে বিজয়ী বিজিতের নিকট থেকে বিজয়ের এনামস্বরূপ কিছু গ্রহণ করে—তা একটা রৌপ্যপাত কেন না হোক কিংবা অন্য কিছু—সব সমান।

ইমাম জাস্‌সাস রাযী আহকামুল কুরআনের ২য় খণ্ডের সূরা মায়েদায় লিখেছেন ঃ الميسر মায়সির এর অর্থ হলো শর্তসাপেক্ষে বা বিপজ্জনকভাবে সম্পদের মালিক হওয়া, মূল মালিক হওয়ার ব্যবস্থা বা বিপদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন ঃ হেবা, সাদাকা, ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত ইত্যাদি যখন বিপদের সাথে সম্পৃক্ত হয়।

তফসীরে খাযেনে বলা হয়েছে—উল্লিখিত আয়াতের হুকুমের আওতায় সে সব কিছুই আসবে যার মধ্যে হার-জিত বর্তমান—এবং তাই জুয়া। ইবনে সীরীন, মুজাহিদ, 'আতা প্রমুখ বলেন ঃ প্রতিটি বস্তু যার ভেতর প্রতারণা ও জোচ্চুরি আছে—সেটাই মায়সির। এমন কি ছোট বালকদের খেলাধুলো, জায়ফল ও আখরোট দ্বারা এবং পাশা খেলা ইত্যাদিও জুয়ার শামিল।

—এক কথায় প্রতিটি কাজ যার ভেতর হারজিত বর্তমান এবং বিজিতকে হেরে যাবার খেসারতস্বরূপ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়—সেটাই জুয়া আর এ খেলা দুজনের ভেতর হোক কিংবা একদলের ভেতর এবং সেটা জুয়া নামেই চলুক কিংবা অন্য কোন নামেই—তা সবই অকাট্য হারাম। এর হারাম হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারীর ঈমানদার ও মুসলমান থাকা সম্পর্কেই সন্দেহ পোষণ করা চলে।

২য় প্রকার ঃ যে সমস্ত কার্যকলাপ জুয়ার অনুরূপ

জুয়া যেহেতু বিনা মেহনতের ফসল আর এর দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রে চরিত্র-বিধ্বংসী কার্যকলাপ বিস্তার লাভ করে এবং এর দ্বারাই প্রধানত

...অসন্তোষ ও ধ্বংসাত্মক পুঁজিবাদ জন্ম নেয়—সেহেতু ইসলাম জুয়া এবং ...র অনুরূপ প্রতিটি কার্যকলাপকে হারাম ঘোষণা করে। ইসলাম ...র শাসকদের উপর ফরয করে দিয়েছে যেন তারা নিজ শাসিত এলাকা ...কে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক রোগ-ব্যাধির জীবাণুগুলো মেরে ফেলে। ইসলামী ...মতের চতুঃসীমায় যেন জুয়ার অস্তিত্ব না থাকে এবং এমন কোন খেলাধুলাও ...ন না থাকে যার ভেতর জুয়ার অস্তিত্ব বর্তমান;—এমন কোন কোম্পানী না ...কে যার ভেতর জুয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। কেননা এরই সাহায্যে ও সহায়তায় ...শের সমগ্র ধন-সম্পদ বিশেষ একটি শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ...রই অনিবার্য পরিণতিতে দেশবাসী দরিদ্র কাঙাল শ্রেণীতে পরিণত হয়। ...ন প্রকার জুয়ার মধ্যে যার বর্ণনা কিছু আগেই দেয়া হয়েছে, যেমনঃ ...টারী, বীমা, রেস, ঘোড়ার দৌড়ের উপর টাকা-পয়সার বাজী ধরা—এবং ...মাদের সিলেট অঞ্চলে জুয়ার অনুরূপ—প্রচলিত খেলাধুলা সবই এর ...ন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার কার্যকলাপের ভেতর ঐ সমস্ত বিষয় বর্ণিত হয়েছে যা ...হ্যত বেচা-কেনার মতই যার অন্তরালে জুয়া প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান। যেমনঃ ...স্পর্শের মাধ্যমে ছুড়ে দেয়া ও কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে বেচা-কেনা যে ...সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ...ত্যাদি হাদীছ গ্রন্থে বর্তমান। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু ...হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছেঃ

ان رسول الله صلعم نهى عن الملامسة والمنابذة وزاد المسلم اما الملامسة فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تامل والمنابذة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الاخر ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه ـ

অর্থাৎ 'রসূলুল্লাহ (সা)-এর স্পর্শের ও নিক্ষেপ করার মাধ্যমে কেনা-বেচাকে নিষেধ করেছেন।—ইমাম মুসলিম স্পর্শের মাধ্যমে কেনা-বেচার ব্যাখ্যায় বলেনঃ এটা এ ধরনের যেমন, কেউ বিক্রয়ের জন্য রাখা বহু

জিনিষের মধ্য হতে বিনা চিন্তা-ভাবনায় প্রথম স্পর্শিত বস্তু লাভ করলো আর নিক্ষেপের মাধ্যমে বিক্রয় অর্থ—ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট কিংবা বিক্রেতা ক্রেতার নিকট না দেখে যে কাপড়খানই ছুঁড়ে দেবে—তাই সে পাবে।

এ ধরনের আবার বহু প্রকারের আছে। প্রতিটি প্রকার আবার বিভিন্ন ধরনে ও আকারে প্রচলিত। উদাহরণত, এখানে একটি ধরন সম্পর্কে আলোচনা করছি। মনে করুন, একটি ঘর। এতে বিভিন্ন দামের কাপড় রাখা হয়েছে। ক্রেতার নিকট থেকে পূর্বেই এই শর্তে টাকা নেয়া হয়েছে যে, তার (ক্রেতার) গুলী যে কাপড়ের উপর পড়বে অথবা ঘরে প্রবেশ মাত্রই যে কাপড় স্পর্শ করবে সে সেই কাপড়খানাই পাবে। মোটকথা এ ধরনের কেনা-বেচা যে ধরনেরই হোক না কেন তা সবই হারাম ও বাতিল। কেননা এর অন্তরালে ও ছায়ায় জুয়া ও প্রতারণার বীজ লুকিয়ে রয়েছে। 'আল্লামা বদরুদ্দীন 'আয়নী 'উমদাতুল কারীর ৫ম খণ্ড بيع الملامسة এবং بيع المنابذة শীর্ষক অধ্যায়ের অধীনে এর বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে আলোচনার পর বলেন :

والبيع على التأويلات كلها باطل وهذان البيعان اعنى الملامسة والمنابذة عند جماعة العلماء من بيع الغرر والقمار الخ-

বাহানাবাজীর মাধ্যমে যে ক্রয়-বিক্রয় সবগুলিই বাতিল ও ভ্রান্ত। আর এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পারস্পরিক স্পর্শ ও পরস্পরের কোন একজনের অপরের দিকে বিক্রিতব্য দ্রব্য নিক্ষেপ করা 'উলামায়ে কিরামের মতে ধোকাবাজী, প্রতারণাপূর্ণ ব্যবসা ও জুয়ার পর্যায়ভুক্ত।"

ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকদের পক্ষে গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্যে এ ধরনের সমস্ত কার্যকলাপের অবসান ঘটানো অত্যন্ত জরুরী।

৩য় প্রকার : যে সমস্ত কার্যকলাপের মধ্যে ধোকা ও প্রতারণা বিদ্যমান। এটাও এক ধরনের জুয়া। ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ গ্রন্থে [illegible] বর্ণনা করেছেন : قال النبى صلعم الخدع يعة فى النار অর্থাৎ "ধোকাবাজ ও প্রতারক

অংশী হবে।" এরপর তিনি باب بيع الغرر এবং حبل الحبل এ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তাকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করার পর লিখেন :

باب النهى عن تلقى الركبان وان بيعه مردود لان صاحبه عاص اثم اذا كان به عالما وهو خداع فى البيع والخداع لا يجوز۔

"সওয়ারীর (ঘোড়া, উট, গাধা, এমনকি বোঝা বহনরত মানুষ ইত্যাদি) পিঠ থেকে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত অধ্যায়; আর এর ধরনের বিক্রয়কারী মরদূদ, আল্লাহদ্রোহী ও পাপী যদি—এটা জেনে করা হয়। বিক্রয় ক্ষেত্রে এটা ধোকাবাজী ও প্রতারণা আর (ব্যবসা) প্রতারণা জায়েয নয়।"

'আল্লামা বদরুদ্দীন 'আয়নী শরাহ বুখারীর ৫ম খণ্ডে বলেন :

ان الشرع ينظر فى مثل هذه المسائل الى مصلحة الناس والمصلحة تقتضى ان ينظر للجماعة على الواحد۔

অর্থাৎ "শরীয়ত সামাজিক কল্যাণ ও জনকল্যাণকে ব্যক্তিগত কল্যাণের উপর স্থান দেয়।" উক্ত খণ্ডেরই ৫০৩ ও ৫০৪ পৃষ্ঠায় কতিপয় হাদীছ ও কার্যকরী মসলামাসায়েল সন্নিবেশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে অধিকতর জানতে হলে 'উমদাতুল কারী ও ফতহুল বারী দ্রষ্টব্য। মোট কথা, ধোকা ও প্রতারণা স্পষ্টতই হারাম এবং এর বৈশিষ্ট্য কেনাবেচার সাথেই শুধু নয়। আর এটা এমনই এক নৈতিকতা বিরোধী কাজ যা একবার বিস্তার লাভ করলে তা দেশ ও জাতিকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্যে একে মূলোৎপাটিত করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালানো ইমামের জন্য ফরয।

চতুর্থ প্রকার : সুদ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে বিপর্যস্ত ও বরবাদ করার জন্য সুদ সবচেয়ে কার্যকর, অভিশপ্ত ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধি। সুদ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে ধ্বংস ও একদম বরবাদ করে দেয় এবং কোটি কোটি মানব সন্তানকে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত বানিয়ে ছাড়ে। সমগ্র দেশের বিত্ত-সম্পদ একটি

বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে দেয় এবং তাদেরকেই সকল সম্পদের একমাত্র ইজারাদার বানিয়ে দেয়। কুরআন, হাদীছ, ফিকাহ ও অন্যান্য ধর্মীয় কিতাবাদি এর নিন্দায় ও অভিশাপ বর্ণনায় মুখর। হুযূর (সা) নাজরান প্রদেশের খৃষ্টানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে তাদের সকল প্রকার ধর্মীয় আযাদী দিয়েছিলেন কিন্তু সুদের লেন-দেন নিষিদ্ধ করে দেন......"ان لا یاكل الربا"......তারা যেন সুদ না খায়।" আবু দাউদ কিতাবুল খারাজ থেকে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। রসূলে মকবুল (সা) ان لا یاكل الربا বাক্যাংশের মধ্যে অর্থনৈতিক কল্যাণের মহান লক্ষ্যকেই সামনে রেখেছিলেন। হায়! যদি কোন একটি রাষ্ট্রও এর দিকে নজর দিতো তবে দুনিয়া আজ সাক্ষাৎ জাহান্নামে পরিণত হতো না। সুদের হারাম হওয়া সম্পর্কে অসংখ্য দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে এর বর্ণনা সম্ভব হবে না। এখানে এতটুকু পেশ করছি যে, সুদ দু'প্রকার। প্রথমত, الربا فى الديون অর্থাৎ কর্জের উপর নেয়া সুদ আর এটাই প্রকৃত সুদ এবং কুরআনুল করীম একেই হারাম ঘোষণা করেছেন। বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন বর্ণনা ও বাচনভঙ্গির মাধ্যমে মাধ্যমে এর কঠোর নিন্দা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ربا الفضل و النسيئة অর্থাৎ কেনা-বেচার ক্ষেত্রে সুদ। সহীহ্ হাদীছে একেও হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে। হাদীছ পুস্তকে এজন্য স্বতন্ত্র অধ্যায় বর্তমান রয়েছে।

قال الامام الكبير فى الحجة :- اعلم ان الربا على وجهين على حقيقى ومحمول عليه - اما الحقيقى فهو فى الديون وقد ذكرنا ان فيه قلبا لموضوع المعاملات وان الناس كانوا منهمكين فيه فى الجاهلية اشد انهماك وكان حدث لاجله محاربات مستطيرة وكان قليله يدعو الى كثيره فوجب ان يسد بابه بالكلية ولذالك نزل فى القران فى شانه ما نزل - والثانى ربا الفضل :- والاصل فيه الحدث المستفيض الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر

والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وهو مسمى ربا تغليظا وتشبيها له بالربا الحقيقي -

"শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রা) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় বলেন: "সুদ দুই প্রকার: ১. প্রকৃত সুদ: ২. প্রকৃত সুদেরই অনুরূপ। প্রথম প্রকারের সুদ অর্থাৎ প্রকৃত সুদ যা করজ লেন-দেনের ক্ষেত্রে যে সুদী কারবার হয় তা। আরবের লোকেরা অজ্ঞ যুগে এরূপ সুদী কারবারে সাংঘাতিকভাবে লিপ্ত ছিলো এবং এর পরিণতিতে ব্যাপক যুদ্ধ-বিগ্রহেও তারা জড়িয়ে পড়তো। কেননা প্রাথমিক অবস্থার স্বল্প পরিমাণের সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে বাড়তে আধিক্যের রূপ নিতো। সে কারণেই সামগ্রিক ভাবে এটা নিষিদ্ধ করবার এবং চিরতরে এরূপ সুদী কারবারের দরজা বন্ধ করে দেবার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল করেন এবং চিরদিনের জন্য সুদকে নিষিদ্ধ করে দেন।—দ্বিতীয় প্রকারের সুদকে রিবাল ফযল বলা হয় যার অর্থ এক জাতীয় দু'টি বস্তু নগদ আদান-প্রদান কালে একটি বস্তু অপরটি অপেক্ষা পরিমাণে অধিক নেয়া এবং দেওয়া। এ সম্পর্কিত বিখ্যাত হাদীছ: (রসূল (সা) বলেন: "সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর লবণের বদলে লবণ—এরূপ হওয়া চাই যে একটি বস্তু যেমন অপরটিও তেমন সমান সমান ও হাতে হাতে (নগদ) হবে; অবশ্য যদি বিভিন্ন জাতীয় বস্তু একটি অপরটির সাথে বিনিময় হয় তাহলে যে ভাবে ইচ্ছা কেনা-বেচা করা চলে। তবে শর্ত যে, বিনিময় নগদ হবে। একে এজন্যই সুদ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যেহেতু এতে বেশী নেয়ার দরজা খোলা হয়। এরূপ মানসিকতার শেষ পরিণতি সুদখোরীতে গিয়ে পৌঁছায়। সেহেতু রিবাল ফযলকেও প্রকৃত সুদের ন্যায় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।"

অনুরূপভাবে ব্যাংক, হুণ্ডীর সাহায্যে লেন-দেন এবং কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলো এরূপ কারবারেরই অন্তর্গত। কেননা এরূপ পথ ও পন্থার প্রবর্তন ও প্রচলনের ফলে সমগ্র দেশের সকল ধন-দৌলত ব্যক্তি বিশেষ

ও ব্যক্তি সমষ্টির হাতে গিয়ে পড়ে এবং অগণিত সাধারণ মানুষ দারিদ্র ও নিঃসম্বল অবস্থার শিকার হয়। ইসলামী সংবিধান সর্বদাই সাধারণ ও সমষ্টিগত কল্যাণকে ব্যক্তিগত কল্যাণের উপর অধিকতর গুরুত্ব সহকারে স্থান দেয়।

৫ম প্রকার : সুদের অনুরূপ বিষয়াদি

ফিকাহ্‌বেত্তাগণ সকল ভ্রান্ত ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কেনা-বেচাকে সুদের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। এতদ্‌সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ্‌র গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাবে। কতিপয় ক্ষেত্রে ধোকা ও প্রতারণা বিদ্যমান যার দ্বারা নৈতিকতা বিরোধী ও চরিত্র হননকারী কার্যকলাপ বিস্তার লাভ করে। কতক ক্ষেত্রে নিন্দিত ও ঘৃণিত পুঁজিবাদ এবং কতিপয় ক্ষেত্রে বিনা মেহনতের অর্জিত ফসল সবই এর আওতাভুক্ত এবং সবগুলিই শরীয়তের দৃষ্টিকে নিন্দিত ও ঘৃণিত। মোটকথা, অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে এমন সকল কার্যকলাপকেই ইসলামী শরীয়ত নাজায়েয ও অবৈধ বলে অভিহিত করে। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকদের উপর ফরয পুলিশ বিভাগের সাহায্যে এর মূল শুদ্ধ উপড়ে ফেলা।

৬ষ্ঠ প্রকার : নেশা জাতীয় পানীয়-দ্রব্যাদির ব্যবসা

নেশা জাতীয় পানীয়-দ্রব্যাদিকে ইসলামী সংবিধান ام الخبائث । বা পাপের জননী হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। কেননা নেশাকর পানীয় দ্রব্যাদি সকল প্রকার অশ্লীলতা ও চরিত্র হননের উৎসমূল। সেজন্য ইসলাম নেশা জাতীয় পানীয়-দ্রব্যাদি পান ও ভক্ষণকারীদের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান দিয়েছে যে সম্পর্কে বর্ণনা ফৌজদারী শাস্তিবিধি প্রসঙ্গে আগেই করা হয়েছে। এর উৎখাত ও উৎসাদনের জন্য এসবের ব্যবসা-বাণিজ্যকেও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। বুখারী শরীফে বলা হয়েছে :

عن عائشة رض لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلعم فقال حرمت التجارة في الخمر-

---

(নোট) দারুল হারবের সাথে অনুরূপ লেন-দেন (অর্থাৎ সুদী কারবারে) যদি ইসলাম লাভবান হয় তবে ইমাম আবু হানীফা (রা)-এর মতে তা জায়েয হবে।

অর্থাৎ "হযরত 'আয়েশা (রা) বলেন : মদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার আয়াত যখন শেষ দিকে নাযিল হলো—রসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে ঘোষণা দিলেন—'আমি মদের ব্যবসাকে হারাম করলাম।" মুসলিম শরীফের অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে :

ان الذى حرم شربها حرم بيعها -

অর্থাৎ "যিনি মদপান হারাম ঘোষণা করেছেন—তিনিই এর কেনাবেচাকেও হারাম করেছেন।"

...ম প্রকার : মজুদদারী ও গুদামজাত করণ : (ইহ্‌তিকার)

ইসলামী বিধান শাস্ত্রে (ফিকাহ্) ইহ্‌তিকার বলতে বুঝায় কোন ব্যক্তি খাদ্য-শস্যজাত দ্রব্যাদি বহুল পরিমাণে এজন্য খরিদ করে যেন বাজারে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং জনগণের নিত্য-প্রয়োজনীয় উক্ত দ্রব্যাদির অভাব ও চাহিদা পূরণের জন্য সেই কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় এবং জনসাধারণ নিতান্ত বাধ্য হয়ে তারই নির্দ্ধারিত মূল্যে উক্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করতে বাধ্য হয়। এ ধরনের মজুদদারী ও গুদামজাতকরণের উদাহরণ খুঁজতে যাওয়ার প্রয়োজন আজ মোটেই নেই। মহাজনদের সেই চক্রটি যারা কৃষকদের কর্জ দেওয়ার নামে সুদের উপর টাকা ধার দিয়ে তাদের অর্জিত ফসল অত্যন্ত সস্তায় নিজের ঘরে তোলে এবং গোলাজাত ও গুদাম ভর্তি করে। আর এভাবেই প্রাচুর্যে ও দুর্ভিক্ষে তারাই খাদ্য-শস্যের একমাত্র জিম্মাদার হয়ে দাঁড়ায়। এটাই মজুদদারী ও গুদামজাতকরণের—শরীয়তের পরিভাষায় 'ইহ্‌-তিকার'-এর উজ্জ্বল ও জীবন্ত ছবি। এই পাপচক্রের এহেন কার্যকলাপের ফলে কৃষক ও জনসাধারণ যে পরিমাণে হয়রান ও পেরেশান হয় এবং কতক মৌসুমে আর্থিক দূরবস্থার শিকারে পরিণত হয়—উপমহাদেশের অধিবাসীদের সামনে তার পরিসংখ্যান জ্বলন্তরূপে ভাস্বর। সুদী লেন দেনের পর যদি কোন কার্যকলাপ ও কায়-কারবার জনগণের সাধারণ দূরবস্থার কারণ ঘটে তবে তা এ ধরনের তেজারতী কারবার যা বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির

আকৃতিতে সামনে আসে। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর নিকট كل ما اضر بالعامة حبسه فهو احتكار - 'প্রতিটি জিনিষ যা আটকে রাখলে সাধারণ মানুষ কষ্ট পায় ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই ইহ্‌তিকার।' রসূলে (সা) এ ধরনের মজুদদারকে পাপী ও অভিশপ্ত বলেছেন। তিনি এও বলেছেন, যদি কোন শহর ও জনপদের কোন একটি লোকও ক্ষুধার্ত থাকে—অথচ উক্ত শহর ও জনপদে এমন লোকও বর্তমান যার নিকট খাদ্য আছে তবে ঐ শহর ও জনপদবাসীর সাথে আল্লাহ্‌র আর কোন সম্পর্ক থাকলো না। হাফিজ যায়লা'য়ী বলেন: আহমদ, ইবনে আবী শায়বা, বাজ্জাজ, আবু ইয়ালী মুসিলী তাঁদের মুসনাদ গ্রন্থে এবং হাকেম মুস্তাদরাকে, দারকুৎনী, তিবরানী আওসাত গ্রন্থে; আর নু'ঈম হুলিয়া গ্রন্থে ইবনে 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন.—রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন:

من احتكر طعاما اربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه وايما اهل عرصة بات فيهم امرئ جائع فقد برئت منهم ذمة الله -

"যে ব্যক্তি চল্লিশ দিবারাত্রি খাদ্যশস্য মজুদ রাখে সে ব্যক্তি যেমন আল্লাহ্‌র দায়িত্ব থেকে মুক্ত এবং কোন জনপদে কোন এক ব্যক্তিও যদি ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটায় তবে তারাও আল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও যিম্মা থেকে মুক্ত হয়ে গেল।" 'আল্লামা শামী রদ্দুল মুহতারের ৫ম খণ্ডে ব্যাখ্যা করেন: দুর্ভিক্ষের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই কাযী (বিচারক) মজুদদারকে খাদ্যশস্য বিক্রী করার নির্দেশ দেবেন। মজুদদার যদি হুকুম তামিল না করে তবে কাযীর জন্য ওয়াজিব হবে মজুদদারের নিজস্ব খোরাক পরিমাণ রেখে বাদবাকী খাদ্যশস্য জনসাধারণের ভেতর বিক্রি করে দেয়া। যদি জনসাধারণ উক্ত খাদ্যশস্যের মূল্য পরিশোধে অসমর্থ হয় তবে কাযী খাদ্যশস্য বণ্টন করে দেবেন। দুর্ভিক্ষ নিরসনের পর জনসাধারণ সামর্থ ফিরে পেলে কাযী সাহেব মজুদদারকে সমস্ত খাদ্যশস্য জনসাধারণের নিকট থেকে নিয়ে ফেরত দেবেন। নিজস্ব জমির খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রেও একইরূপ নির্দেশ।

ويجب ان يأمره القاضى ببيع ما فضل عن قوته وقوة اهله بان لم يبع عزره وباع عليه طعامه وفاقا على الصحيح وفى السراج لوخاف الامام على اهل البلد الهلاك اخذ الطعام عن المحتكرين وفرق عليهم فاذا وجدوا سعة ردوا مثله ولو حبس غلة ارضه لايكون محتكرا الا انه يجبر على بيعه ان اضطر الناس اليه۔

৮ম প্রকার : বাতিল ও ভ্রান্ত প্রথা-পদ্ধতি

বাতিল ও ভ্রান্ত প্রথা-পদ্ধতি যথা রসমরেওয়াজের অনুসরণে হয় সম্পদের অপচয় হয়—অর্থাৎ বিনা ফায়দায় সম্পদ নষ্ট করা হয় অথবা নিন্দিত ও ঘৃণিত পুঁজিবাদের পোষকতা করা হয় নতুবা এতে সাধারণ জনসমাজে নৈতিকতা বিরোধী ও চরিত্র ভ্রষ্টকারী কার্যকলাপ বিস্তার লাভ করে। এ সমস্ত কারণে শরীয়তে মুহাম্মদী সকল ভ্রান্ত ও বাতিল রসম-রেওয়াজ ও প্রথা-পদ্ধতিকে হারাম ঘোষণা করেছে এবং নেতার উপর ফরয করে দিয়েছে যে, তিনি পুলিশ বিভাগের সাহায্যে এসবের খোজ-খবর ও তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন এবং এর অবসান ও উৎসাদনের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করবেন। এ ধরনের রসম-রেওয়াজের সংখ্যা বহু। এখানে নমুনা-স্বরূপ মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করছি।

১. প্রথমত, সিনেমা, নাটক, বাজীকরের তামাশা, থিয়েটার সার্কাস, বাদ্যসহ সকল প্রকার নাচ-গান ইত্যাদি। শাসকের জন্য ফরয এ সকল কার্যকলাপের উৎসাদন ও উৎপাটনের জন্য সম্ভাব্য সকল কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা। কেননা এর দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রে অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ প্রসার লাভ করে। ধিকৃত পুঁজিবাদের বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। জনসাধারণের সামনে নিঃস্বতা ও দারিদ্র্যের দরজা খুলে যায়। যদি যথাসম্ভব সত্বর এর উৎসাদন ও উৎপাটনের জন্য হুকুমতের তরফ থেকে কোন প্রচেষ্টা চালানো না হয় তবে সাধারণ গণ-মানুষের জীবিকার পথ

সাথে রূঢ় ব্যবহার ও আচরণ করা উচিত যেন ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে জড়-মূলসুদ্ধ উপড়ে ফেলা যায় এবং বিশুদ্ধ ও সুস্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পক্ষে অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ হাদীছ দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, গান-বাজনার প্রচলন আদতেই হারাম। তা সে গান-বাজনা বিয়েশাদী উপলক্ষেই হোক—কিংবা বিয়ের ওলীমা ভোজ উপলক্ষেই হোক—অথবা তা পীর সাহেবের মাজারেই হোক। গান-বাজনা প্রেসিডেন্ট কিংবা শাহানশাহের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষেই হোক—অথবা তা স্বাধীনতা দিবস ও বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষেই হোক—সর্বাবস্থায় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তা হারাম। বাহরুররায়েক প্রণেতা একে সাধারণ অর্থেই হারাম বলেছেন। অবশ্য ঈদ ও বিয়ে-শাদী উপলক্ষে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকারা যদি বিনা পারিশ্রমিকে এবং বিনা আহবানে নিছক আমোদ-আহ্লাদের উদ্দেশ্যে কিছু গায়—কিংবা তার সাথে দফ বাজায় এবং একে যথেষ্ট মনে করে খুশী থাকে—তবে কতিপয় হাদীছে তার সমর্থন মেলে।

আমাদের যুগে সমস্যাটি ব্যাপকতর রূপলাভ করেছে। শত শত পীর সাহেবানরা অবধি এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। এ দিকে জাতীয় নেতৃবৃন্দ এর ব্যাপকভিত্তিক প্রচলনের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সচেষ্ট। মুফাসসিরকুল শিরোমণি শেখুল ইমাম 'আল্লামা আলূসী বাগদাদী (র)-এর গবেষণালব্ধ ফল থেকে কিছু অংশ পেশ করছি। তিনি তফসীরে রূহুল মা'আনীতে বলেন: ইবনে আবী শায়বা, ইবনে আবীদ্দুনইয়া, ইবনে জরীর, ইবনুল মুনযির, হাকেম তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী শু'আবুল ঈমান নামক গ্রন্থে আবু সাহবা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি 'আবদুল্লাহ্ বিন মাস'উদ (রা) কে আল্লাহ্‌র বাণী—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ

عَنْ سَبِيلِ اللهِ الخ-

অর্থাৎ "মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞ লোকদিগকে আল্লাহের পথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অসার বাক্য বাছিয়া লয়" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আল্লাহর কসম খেয়ে বললেন—'লাহওয়াল হাদীছ' অর্থ গান-বাজনা ও অনুরূপ বিষয়াদি। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত মকহুল বলেনঃ 'লাহওয়াল হাদীছ' ক্রয় করার অর্থ গায়িকা দাসী-বাঁদী ক্রয়। মুজাহিদ বলেনঃ 'লাহওয়াল হাদীছ' অর্থ গায়ক-গায়িকা ক্রয়, গান-বাজনা মনোনিবেশ সহকারে শোনা, কিংবা অনুরূপ বাহুল্য বিষয় ও কথা-বার্তা; এগুলি নাজ ও বাতিল। তাতারখানিয়া গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ তোমরা জেনে রাখ,—গান-বাজনা সমস্ত ধর্মেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। গান-বাজনার ওসীয়ত আমাদের মযহাবে পাপ ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি আহলে কিতাবদের নিকটও গান-বাজনা হারাম। দেহায়ী ও যখীরা প্রণেতা একে গোনাহ কবীরা বলেছেন। আমাদের যুগেও কতক সুফীদের মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কবিতা পাঠ ও যিক্‌র-আযকারও এগুলির অন্তর্ভুক্ত। এমনকি তা এর থেকেও খারাপ। কেননা এগুলি ছওয়াবের আশায় 'ইবাদত মনে করে করা হয়। যাখীর প্রণেতা বলেনঃ যারা গান শোনে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না এবং যারা গানের মজলিসে বসে তাদেরও। ইমাম মালিক (রা) গান করা ও শোনাকে নিষেধ করেছেন। হাম্বলী মযহাবে একে হারাম বলা হয়েছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রা)-কে এসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ এতে অন্তরে কপটতা সৃষ্টি হয়। ইমাম মুহাসিবী বলেনঃ মৃত বস্তুর ন্যায় গান-বাজনাও হারাম। —শাফেয়ী মযহাবেও একে হারাম বলা হয়েছে এবং তা হালাল করা হয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হয় তারা তা অস্বীকার করেছে। কাতরীব গ্রন্থে গান-বাজনা শোনা ও করাকে হারাম বলা হয়েছে। ১

টীকাঃ ১ গ্রন্থকার মওলানা মরহুম গান-বাজনা হারাম হওয়ার স্বপক্ষে দীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনা অবতারণা করেছেন এবং আরও বহু দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন। যেহেতু গ্রন্থকারের মৌলিক উদ্দেশ্য ইসলামী রাষ্ট্রনীতির অস্তিত্ব, এর যথার্থতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করা এবং এতদসঙ্গে (প.পৃ.দ্র.)

৩. তৃতীয়তঃ আতশবাজী ও তার প্রকারভেদ

সকল প্রকার আতশবাজীই হারাম। কোনভাবেই তা হালাল হতে পারে না—। কেননা এর দ্বারা সে সমস্ত বিত্ত-সম্পদ যা আল্লাহ্ পাক মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য একক মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করেছেন—তাকে অযথা ও বিনা প্রয়োজনে অপচয় করা হয়। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

অর্থাৎ "তোমাদের সম্পদ আল্লাহ্ যাহা উপজীবিকা করিয়াছেন তাহা তোমরা নির্বোধদিগের হস্তে সমর্পণ করিও না।" উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক ধন-সম্পদকে সুস্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا - إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ

الشَّيَاطِينِ - وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا -

অর্থাৎ "তোমরা অপচয় করিও না। কেননা অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান তো স্বীয় প্রতিপালকের সহিত কুফরী করিয়াছিল।" হাদীস শরীফে উক্ত হয়েছে ঃ

نهى النبى صلعم عن اضاعة المال -

"রসূল করীম (সা) সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন।" বর্ণিত হাদীছটি অত্যন্ত মশহুর ও বিশুদ্ধ। ইমাম বুখারী, মুসলিম, আহমদ এবং হাদীছ শাস্ত্রের অন্যান্য ইমামগণ হাদীছটি তাদের নিজ নিজ হাদীস গ্রন্থে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন সূত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন—। হাদীসের

(পূ.পৃ. পর) অর্থনীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা পেশ করা ও এর মূলনীতির বর্ণনা—সেহেতু উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে বাকী অংশের উদ্ধৃতি থেকে বিরত রইলাম।—অনুবাদক।

বিষয়বস্তুর উপর মুসলিম বিদ্বানমণ্ডলীর সম্মিলিত সিদ্ধান্ত (ইজমা') রয়েছে। ইসলাম স্বীয় অর্থনীতি ব্যবস্থা অব্যাহত ও স্থায়ী রেখে আতশবাজীকে কোনভাবেই এবং কোন অবস্থাতেই অনুমতি দিতে পারে না। হায়! মুসলমানরা যদি বুঝতো! আফসোস হয় এজন্যে যে, আজ কোটি কোটি টাকা আগুনে পোড়ানো হচ্ছে। আল্লাহ! তুমি মুসলমানদের বুঝবার শক্তি দাও। তাদের তুমি ইসলামের সত্যিকার অনুসারী বানাও। হে আল্লাহ্! তুমি এই নগণ্য পুস্তককে কবুল কর! আপন যমীনের বুকে একে কবুল করে নাও।

انك على ما تشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله كما تحب وترضى وعد وما تحب وترضى يا كريم-

৪. চতুর্থতঃ বিয়ে-শাদী, খতনা, 'আকীকা ইত্যাদি উপলক্ষে প্রচলিত কুপ্রথা।

যেহেতু এ সমস্ত কার্যকলাপ অর্থনীতি ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর সেহেতু ইসলাম ঐ সমস্ত কার্যকলাপকে নাজায়েয ঘোষণা করে। ইসলাম বিয়ে-শাদীকে অত্যন্ত সহজ, সাদা-সিধে ও অনাড়ম্বরপূর্ণ রাখতে চায় যেন—প্রতিটি ব্যক্তি এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা মাত্রই তার জন্য বিয়ে-শাদী করা সহজসাধ্য হয়। আর এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, যে সমস্ত দেশে বিয়ে-শাদী উপলক্ষে অযথা বদ-রসম-রেওয়াজ তথা কুপ্রথা পদ্ধতির আধিক্য ও বাড়াবাড়ি ঘটে সেখানে বিয়ে-শাদী করাটাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে এবং যৌন চাহিদা পূরণের নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত পন্থাগুলির বিস্তৃতি ঘটে যার ফলে তাদের সমাজ বন্য পশু জীবন থেকেও নিকৃষ্টতর হয়ে উঠে। যিনা, পুং-মৈথুন, পশু-মৈথুন ইত্যাদি ধরনের এমন সব পাপাচার ও পাপক্রিয়ার উদ্ভব হয় সাধারণ পশুও যা থেকে লজ্জা পায়। নির্লজ্জ মানুষ এই পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা বরবাদ করে থাকে। এজন্যে আল্লাহ্‌র পছন্দকৃত ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা—বিয়ে-শাদীকে সকল প্রকার বদ-রসম ও কুপ্রথার হাত থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে অত্যন্ত সহজ ও আয়াসসাধ্য বানিয়েছে।

ইসলামের বিয়ে-শাদীতে না টাকা-পয়সার দরকার আছে—আর না আছে এতে কোন কুপ্রথা ও আনুষ্ঠানিকতা। ব্যস! জুমার সালাত সম্পাদনের পর বসে যান—সঙ্গে সঙ্গে বিয়েও সম্পন্ন। আল্লাহ্ পাক বলেন:

وَاَنْكِحُوْا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ

عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ۔

অর্থাৎ "তোমাদিগের মধ্যে যাহারা 'আইয়িম' (অবিবাহিত, বিপত্নীক ও বিধবা) তাহাদিগকে বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদিগের দাস ও দাসীদিগের মধ্যে যাহারা সৎ তাহাদিগেরও।" সূরা নূর, ৩২ আয়াত;

হাদীছ শরীফে তিনটি কাজের ক্ষেত্রে কোনরূপ বিলম্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো—

والايم اذا وجدت لها كفوا۔

অর্থাৎ অবিবহিত মেয়েদের কফু (সমরূপ ও সমশ্রেণীর পাত্র) পাওয়া মাত্রই বিয়ে দেবে। —তিরমিযী। অন্য এক হাদীছে বলা হয়েছে:

واذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد عريض۔

অর্থাৎ "যখন তোমাদের নিকট এমন কোন ব্যক্তি বিয়ের পয়গাম নিয়ে এসে উপস্থিত হয়—যার দীনদারী ও স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে তোমরা নির্ভর করতে পার তবে বিনা দ্বিধায় বিয়ে দিয়ে দাও। দেরী হলে দুনিয়াতে ফিতনা-ফাসাদ জাহান্নাম সমরূপ ধারণ করবে।" বিয়েশাদীর ক্ষেত্রে একমাত্র দেনমোহরকেই অবশ্যকীয় করা হয়েছে। সুন্নত তরীকা এটাই—যেন দেনমোহর কোন অবস্থাতেই ৫০০ টাকার বেশী না হয় যা আমাদের দেশের একশত একত্রিশ তোলা রৌপ্যের সমতুল্য।[১] কেননা যাকাতের নেসাব

টীকা: ১ ত্রিশ বছর আগে গ্রন্থকার বর্তমানে পুস্তক যখন লিখেছিলেন পুস্তকের প্রদত্ত হিসাব তখন হয়তো ঠিক ছিলো। বর্তমানে রূপা, দিরহাম ও টাকার আনুপাতিক তারতম্য অনেক বেশী হবে। অনুবাদক।

শত দিরহাম—বা সাড়ে বাহান্ন (৫২॥) তোলা রৌপ্যের সমতুল্য।

عن ابی سلمة قال سالت عائشة رض کم کان صداق رسول الله صلعم قالت کان صداقه لازواجه اثنتی عشرة اوقیة و نشا قالت اندری ما النش قلت لا - قالت نصف اوقیة فذلك خمس مائة دراهم فهذا صداق رسول الله صلعم لازواجه -

اخرجه مسلم وعن عمر رض بن الخطاب قال لا تغالوا صدق النساء فانها لو كانت مكرمة فی الدنیا و تقوی عند الله لكان اولاكم بها النبی صلعم ما علمت رسول الله صلعم نكح شیئاً من نسائه ولا انكح شیئاً من بناته علی اكثر من اثنتی عشرة اوقیة اخرجه والترمذی وابوداؤد وغیرهم -

"হযরত আবু সালমা বলেন: আমি হযরত 'আয়েশা-কে জিজ্ঞাসা করলাম—রসূলুল্লাহ (সা)-এর বিয়ের দেনমোহর কত ছিল? উত্তরে হযরত 'আয়েশা (রা) বললেন: সাড়ে বার আওকিয়া (১২॥) যা ৫০০ দিরহাম সমতুল্য প্রায়। এইটাই ছিলো রসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীদের দেনমোহর।

হযরত 'উমর (রা) বলেন: স্ত্রীদের দেনমোহরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করো না। বেশী দেনমোহর ধার্য করাটাই যদি সম্মান, মর্যাদা ও তাকওয়া অর্জনের মাপকাঠি হতো—তবে অবশ্যই এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সা) বেশী হকদার ছিলেন। অথচ আমি জানি না রসূলুল্লাহ (সা) কোন স্ত্রীর কিংবা নিজের মেয়েদের বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে কখনও বার আওকিয়ার বেশী দেনমোহর ধার্য করেছেন।"[২] মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ,

---

টীকা: ২ রসূলুল্লাহ (সা) স্ত্রী উম্মে হাবিবা (রা)-এর দেনমোহরই একমাত্র চার হাজার দিরহাম ছিলো। বাদশাহ নাজ্জাশী উক্ত দেনমোহর ধার্য এবং নিজ থেকে তা পরিশোধ করেন। অনুবাদক।

নাসায়ী।

৫. পঞ্চম : সমস্ত কুপ্রথা যা বুজর্গ ও মহান ব্যক্তিদের ওরস ও শবেবরাত উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়

ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে এটাও নাজায়েয ও অর্থহীন। কেননা —এতেও লাখ লাখ টাকার অপচয় হয়। অথচ রসূলে করীম (সা) সম্পদের অপচয় ঘটাতে নিষেধ করেছেন। বুখারী, মুসলিম।

نهى النبى صلعم عن اضاعة المال - اخرجه الشيخان وغيرهما -

৬. ষষ্ঠ : নির্বুদ্ধিতা

যে ব্যক্তি বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়তের খেলাফ সম্পদ ব্যয় করে, যেমন। নাটক, সিনেমা, লটারী, জুয়া, বেশ্যাগমন, তিতিরপক্ষীবাজী, কবুতর বাজী ইত্যাদিতে সম্পদের অপচয় করে অথবা মহল্লার গুণ্ডা বদমাশদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তাদের জন্য টাকা-পয়সা ব্যয় করে, মদপানসহ নেশা জাতীয় পানীয় দ্রব্যাদিতে আসক্ত, এ ধরনের লোককে শরীয়তের পরিভাষায় سفيه বা নির্বোধ বলা হয়। এ ধরনের লোকের সম্পদের দেখাশুনা ইসলামী হুকুমতের উপর ফরয। তার স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি তার অভিভাবক অথবা ইসলামী হুকুমত নিজস্ব তত্ত্বাবধানে রাখবে এবং তাকে শুধু মাসিক ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ভাতা দেবে। আফসোস! আজ যদি দুনিয়াবাসী এই নীতিকে কার্যকরী করতো তবে দুনিয়া বেহেশতে পরিণত হ'তো। কুরআনুল করীম বলেন :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

وَّارْزُقُوهُمْ وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (سورة نساء)

"তোমাদের সম্পদ, যাহা আল্লাহ্ তোমাদের উপজীবিকা করিয়াছেন তাহা নির্বোধদিগের হস্তে সমর্পণ করিও না; উহা হইতে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাদের সহিত সদালাপ করিবে।" 'আল্লামা শামী রদ্দুল মুহতার গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের ১২৬ পৃষ্ঠায় বলেন:

السفه - هو تبذيرا المال وتضييعه على خلاف مقتضى العقل الشرع كالتبذير والاسراف فى النفقة وان يتصرف تصرفات لا لغرض اولغرض لا يعده العقلاء من اهل الديانة غرضا كدفع المال الى المغنيين وشراء الحمامة الطيارة بثمن غال والغبن فى التجارات من غير محمدة الى ان قال - وعندهما يحجرعلى الحربا لسفه والغفلة ويدفع اليه المال حتى يونس منه الرشد ولقولهما يفتى - كما صرح به قاضيخان فى كتاب الحيطان وقد صرح فى كثير من المعتبرات بان الفتوى على قولهما قلت وهو قول الجمهور الائمة المجتهدين وهو نص القران الحكيم كما مر قال الشامى والرشد عندنا ان ينفق فيما يحل ويمسك عما يحرم ولا ينفقه البطالة والمعصية ولا يعمل فيه بالتبذير والاسراف والله الهادى -

'আল্লামা শামী নির্বোধের সংজ্ঞা এবং তার নির্বুদ্ধিতার প্রকৃতি বর্ণনার পর বলেন: এদের নিকট সত্যপথে ফিরে না আসা পর্যন্ত বিত্ত-সম্পদ অর্পণ করা যাবে না এবং তাদের নির্বুদ্ধিতা ও অলসতা-গাফলতীর কারণে স্বাধীন শক্তিকে বাধ্য ও চাপ প্রদান করা হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ এরই উপর ফতওয়া দিয়েছেন। সমগ্র বিদ্বানমন্ডলীও এরূপ মত প্রকাশ করেছেন, কাযীখান এরূপ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন—কুরআনুল করীমের সুস্পষ্ট নির্দেশই উক্তরূপ ফতওয়ার ভিত্তি। 'আল্লামা শামীর মতে الرشد 'আররুশদ' বা সত্য পথে ফিরে আসার অর্থ হালাল পথে সম্পদ ব্যয় করা, হারাম পথ থেকে বিরত থাকা, বাতিল ও ভ্রান্ত এবং পাপ পথে অর্থ-সম্পদ খরচ না করা, অপচয় ও অপব্যয় না করা।

মোট কথা, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কের উপর উল্লিখিত বদরসম ও কুপ্রথার উৎসাদন ও উৎপাটন করা ফরয। ইসলামী রাষ্ট্রে যেমন সুদী লেন দেনের প্রচলন থাকবে না ঠিক তেমনি জুয়ার অস্তিত্বও থাকবে না। কোন ব্যক্তি লটারী কিংবা বীমার দালালীও যেমন করতে পারবে না ঠিক তেমনি গান বাজনা, সিনেমা-থিয়েটার ইত্যাদির মাধ্যমে টাকা-পয়সা উপার্জনও করতে পারবে না। কোন স্ত্রীলোক ব্যভিচার কিংবা গানকে জীবিকার্জনের পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে না। বরং উপরউক্ত রূপ সকল প্রকার কুপ্রথা ও বদ রসম যার মাধ্যমে ঘৃণিত ও ধিকৃত পুঁজিবাদ বাড়তিপ্রাপ্ত হয়, সাধারণ দৈন্য ও দারিদ্র্য বিস্তার লাভ করে অথবা সাধারণ জনসমাজে নৈতিকতা বিরোধী ও চরিত্র হননকারী বিষয় ও কর্ম জন্মলাভ করে—তার সব কিছুর মূলোচ্ছেদ ও বিনাশ সাধন করা ইসলামী রাষ্ট্রনায়কের সর্বপ্রধান এবং সর্বপ্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

قال في رد المحتار واذا سمع صوت المزامير في داره
اد خل عليه جاز لانه لما اسمع الصوت فقد اسقط حرمة
داره وذكر الصدر الشهيد عن اصحابنا انه يهدم البيت
على من اعتاد الفسق انواع الفساد في داره حتى لا باس
بالهجوم على بيت المفسدين وهجم عمر رض على نائحة
في منزلها وضربها لدرة حتى سقط خمارها فقيل له فيه
قال لا حرمة لها بعد اشتغالها بالمحرم والتحقت بالاماء
وعن عمر رض ايضا انه احرق بيت الخمار وعن الصفار
الزاهد الامر بتخريب دار الفاسق - من باب التعزير -

রদ্দুল মুহতার গ্রন্থে বলা হয়েছে, কোন ঘর থেকে বাদ্য-যন্ত্রের আওয়াজ শোনার পর উক্ত ঘরে প্রবেশ করা জায়েয। কেননা বাদ্য-যন্ত্রের আওয়াজ শোনা যেহেতু হারাম—সেহেতু বাদ্য-যন্ত্রের আওয়াজ শোনামাত্রই সে ঘরে প্রবেশের হারাম থেকে রেহাই পেয়েছে। অতএব, সে শুধু প্রথমোক্ত হারামেই জড়িত। ফকীহ সদরউস-শহীদ বর্ণনা করেন, আমাদের ইমামগণের মতে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকের ঘর-বাড়ী এবং যে সমস্ত ঘর-বাড়ী নানাবিধ ফিৎনা-ফাসাদ

ও পাপাচারের আড্ডা তা ভেঙ্গে দিতে হবে। আর এতে কোন অন্যায় হবে না। হযরত 'উমর (রা) চীৎকার করে কান্নারতা জনৈকা মহিলাকে তার ঘরে গিয়ে বেত্রাঘাত করেন। এতে তার মাথার ওড়না পড়ে যায়। এ ব্যাপারে কেউ অভিযোগ উঠালে হযরত 'উমর (রা) বলেছিলেন, "এতে কোন অন্যায় হয়নি। কেননা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার ফলে মহিলা বাঁদীর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল।" হযরত 'উমর (রা) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি মদখোর লোকদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ ফকীহ্ সিফার্যাহিদ পাপাচারী ও দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিদের ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।"

দ্বিতীয় বিভাগ

জীবিকার্জনের উপায় উপকরণ

প্রথম : কৃষি

কৃষির উন্নতি বিধান করা ইসলামী হুকুমতের উপর ফরয। কেননা কৃষির উন্নতি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের নাগরিকদের হিফাজত অসম্ভব। হযরত রসূলে মকবুল (সা) কৃষি কাজকে অত্যন্ত উৎসাহিত করেছেন।

عن انس رض بن مالك قال قال رسول الله ص ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيا كل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له به صدقة . اخرجه البخاري

"হযরত আনাস বিন মালিক (রা) বর্ণনা করেন,—রসূল (সা) বলেছেন : কোন মুসলমান যদি গাছ রোপণ করে কিংবা খাদ্যশস্য বপণ করে,—অতঃপর তা থেকে কোন মানুষ, পাখী অথবা পশু কিছু অংশ খায় তবে তার জন্য সাদাকাহ্ স্বরূপ হবে।" বর্ণিত হাদীছ থেকে আমরা কতিপয় জিনিষ জানতে পাই।

১. কৃষি কাজ করা কিংবা গাছ লাগানো জীবিকার একটি সাধারণ মাধ্যম—যার উপকারিতা ও কল্যাণ মানুষ ও পশু-পাখীর প্রতি সকলের উপর সমভাবে পেঁছে থাকে।

২. যেহেতু সাধারণ মানুষ কৃষির মাধ্যমে জীবন বাঁচিয়ে থাকে সেজন্য হুযূর আকরাম (সা) বলেন : তোমাদের কৃষি ক্ষেত থেকে মানুষ, পশু, অথবা পাখী যারই উপকার ও কল্যাণ লাভ ঘটুক না কেন তোমরা তার বিনিময়ে অবশ্যই দান-খয়রাতের ছওয়াব পাবে।

৩. কৃষির উন্নতি বিধান করা অবশ্যই জরুরী। কেননা কৃষি ব্যতিরেকে মানুষ কিংবা পশু-পাখী সবারই জীবন-জীবিকা সংকীর্ণ ও রুদ্ধ হয়ে থাকে। কোন যমিনই যেন কৃষি ব্যতিরেকে পতিত কিংবা অনাবাদী না থাকে। ইসলামের রাষ্ট্রনায়ক প্রকাশ্যে ঘোষণা দেবেন—যে জমি যে আবাদ করবে সে সেই জমির মালিক হবে।

عن عائشة رض عن النبى صلعم قال من اعمر ارضا ليست لاحد احق اخرجه البخارى و قال قال عروة قضى به عمر رض فى خلافته و راى ذالك على رض فى ارض الخراب بالكوفة -

"হযরত 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত,—রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তির এমন অনাবাদী জমি আবাদ করে যা অন্যের নয়—সেই ব্যক্তি সে জমির মালিক হবে। বুখারী হাদীছটি বর্ণনা করেন। অন্যতম রাবী হযরত 'উরওয়া বলেন : হযরত 'উমর (রা) স্বীয় খিলাফত আমলে এরই উপর ফয়সালা পেশ করেছিলেন এবং হযরত 'আলী (রা) কুফার অনাবাদী জমির ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থাই নিয়েছিলেন। আবাদী জমির পরিমাণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে যাকে সমীচীন জায়গীর দেয়া যেতে পারে। স্বয়ং রসূলে করীম (সা) কতিপয় ব্যক্তিকে পতিত জমির জায়গীর দান করেছিলেন যে সম্পর্কে একটু এগিয়েই অল্প বিস্তর আলোচনা করা হবে। সহীহ্ বুখারীতে উক্ত হয়েছে :

باب كتابة القطائع - عن انس رض قال دعا النبى صلعم الانصار ليقطع لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله صلعم ان فعلت فاكتب لاخواننا من قريش بمثلها - الحديث

القطائع নামক অধ্যায়ে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত,—তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সা) আনসারদের ডেকে বাহরায়নের জমি জায়গীর দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অতঃপর তারা বললোঃ আপনি যদি আমাদের দিতে ইচ্ছুক হন তবে আমাদের কুরায়শী ভাইদেরও অনুরূপ-ভাবে দিন। কৃষির উন্নতি বিধানের স্বার্থে কৃষি ক্ষেত্রে সেচের সুবিধার্থে খাল প্রবাহিত করা, বাঁধ নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, নদ-নদীর শাখা-প্রশাখা বের করা এবং প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করা ইসলামী হুকুমতের উপর ফরয। কেননা কৃষির উন্নতি ব্যতিরেকে জাতির সার্বিক ও সামগ্রিক হিফাজত তথা রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব নয়। আধুনিক যুগে কৃষি উন্নয়নের যতবিধ উপায়, উপকরণ ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে—সেসবের সাহায্যে কৃষির উন্নতি বিধান করা এবং আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি কৃষকের ব্যবহারের জন্য তার দরজা পর্যন্ত সহজভাবে ও সহজ শর্তে পৌঁছে দেয়া হুকুমতের জন্য বাধ্যতামূলক। ইমাম আবু ইউসুফ (র) কিতাবুল খারাজে বলেনঃ

فاذا احتاج اهل السواد الى كرى انهارهم العظام التى تأخذ من دجلة وفرات كريت لهم وكانت النفقة من بيت المال واما البثوق والمسنيات والبريد التى تكون فى دجلة والفرات وغيرها من الانهار العظام فان النفقة على هذا كله من بيت المال.

অতঃপর (ইরাক অন্তর্ভুক্ত) 'সওয়াদ'বাসী যখন দজলা ও ফোরাত নদীর পানি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সৃষ্টির মাধ্যমে ভাড়া প্রদানের ভিত্তিতে সরবরাহের প্রার্থনা জানায় তাদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয় এবং বায়তুল-মাল থেকে এর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা হয়। ঠিক তেমনি সমুদ্র ও নদীর পার্শ্বস্থিত জমির ভগ্নাংশ সেচ ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী জমি, ডাকঘর বা

কিছুই দজলা, ফোরাত প্রভৃতি বড় বড় নদী-নালার মুখাপেক্ষী সব কিছুর জন্য পানি সরবরাহের ব্যয়ভার বায়তুল-মাল থেকে নির্বাহ করা হতো।

'আল্লামা শিবলী নু'মানীর 'আল-ফারুক' গ্রন্থে বলা হয়েছে: হযরত 'উমর (রা) সমগ্র বিজিত এলাকায় নদী-নালা প্রবাহিত করেন,—বাঁধ নির্মাণ করেন, পুকুর খনন করেন, পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে জলাধার তৈরী করেন, নদ-নদী থেকে শাখা-প্রশাখা বের করেন এবং এ জাতীয় কাজ সম্পাদনের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। 'আল্লামা মাকরিযী লিখেছেন: শুধু মিসরেই প্রত্যহ এক লাখ বিশ হাজার শ্রমিক বাৎসরিক ভিত্তিতে কাজে নিযুক্ত ছিলো।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য

القطائع جمع قطيعة - قال العلامة العينى من اقطعه الامام ارضا والاقطاع يكون تمليكا وغير تمليك الخ -

القطائع শব্দটি قطيعة শব্দের বহুবচন যার অর্থ চিরস্থায়ী ও মেয়াদী বন্দোবস্ত দেয়া। 'আল্লামা আ'য়নী বলেন: ইমাম কাউকে জমি দেন আর তা মালিকানা প্রদানের শর্তেও হতে পারে আবার মালিকানা দেয়া নাও যেতে পারে।

মোট কথা: সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীছ ও সীরত বিষয়ক গ্রন্থে জায়গীর ও বন্দোবস্ত দেয়া সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা দু'ধরনের-যথা: ক. জায়গীর,—অর্থাৎ পতিত ও অনাবাদী জমি চিরস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত

(নোট: জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা করা ইসলামী হুকুমতের জন্য অপরিহার্য। কেননা এ থেকেই ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট পুঁজিবাদ বৃদ্ধি পায়। পরিণতিতে বিভিন্ন প্রকার জুলুম-অত্যাচার ও শোষণ অস্তিত্ব লাভ করে। যখন কোন সরকার জমিদারী প্রথাকে লালন-পালন করতে থাকে তখন এক একজন জমিদার এক একটি ক্ষুদে ফিরাউনে পরিণত হয়।—গ্রন্থকার।)

দেয়া। এর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত রসূলে মকবুল (সা) থেকে বর্ণিত আছে।

مثل حديث اسماء ان رسول الله ص اقطع الزبير نخيلا اخرجه ابوداؤد واحمد ومثل حديث علقمة بن وائل عن ابيه ان النبى ص اقطعه ارضا بحضرموت الحديث اخرجه ابوداؤد والبيهقى وابن حبان وصححاه والترمذى وصححه ايضا والطبرانى وغيرهم ومثل حديث ابيض بن حمال رضانه وفد النبى ص فاستقطعه الملح الذى بمارب فاقطعه اياه الحديث اخرجه الترمذى وحسنه والحاكم فى المستدرك وصححه وابن حبان وصححه ايضا وابوداؤد والنسائى وغيرهم.

অর্থাৎ 'আবু দাউদ, আহমদ প্রভৃতি হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হযরত আসমা (রা)-এর হাদীছে বলা হয়েছে যে, 'রসূলুল্লাহ (সা) জুবায়র (রা)-কে একটি খেজুর বাগান বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। 'আলকামা বিন ওয়ায়েল তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেন: নবী করীম সা) তাকে হাদরামাউতে এক খণ্ড জমি বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন।' হাদীছটি আবু দাউদ বর্ণনা করেন; বায়হাকী, ইবনে হাব্বান, তিরমিযী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। তিবরানী-তেও হাদীছটি বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবইয়াদ বিন হাম্মাল (রা) বলেন: একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে মা'আরেব নামক স্থানে লবণভূমি বন্দোবস্ত প্রার্থনা করে। রসূলুল্লাহ (সা) তাদের প্রার্থনা পূরণ করেন। হাদীছটি বর্ণনার পর তিরমিযী একে 'হাসান' (উত্তম) বলেছেন। হাকেম মুসতাদরাক গ্রন্থে এবং ইবনে হাব্বান তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনার পর হাদীছটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। আবু দাউদ, নাসায়ীও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।" ১

টীকা: ১ পতিত ও অনাবাদী জমি চাষাবাদের অধীনে আনবার তাগিদেই প্রধানত: মালিকবিহীন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বিভিন্ন সাহাবীকে তাদের কৃতিত্বপূর্ণ ইসলামী অবদান ও বৃহত্তর জাতীয় খিদমতের পুরস্কারস্বরূপ (পৃ.পৃ.দ্র.)

খ. ঠিকা: অর্থাৎ পতিত ও অনাবাদী জমি নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে বন্দোবস্ত দেয়া। এর উদাহরণও হুযুরে (সা)-এর পবিত্র জীবনেই পাওয়া যায়। জনাব রসূলে মকবুল (সা) কখনও কাউকে জমির বন্দোবস্ত দিলে তার সঙ্গে একটি লিখিত সনদও দিতেন। ইমাম বুখারী باب القطائع নামে অধ্যায় সংযোজিত করে এ ধরনের সনদের প্রতিই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

দ্বিতীয়: ব্যবসা-বাণিজ্য

যেহেতু জনগণের হিফাজত ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধারের উপর ফরয—সেহেতু নিজ রাষ্ট্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং এর সকল প্রকার জায়েয কলা-কৌশল ও প্রক্রিয়া প্রচলনের চেষ্টা করা তাঁর জন্য অপরিহার্য। স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যই হোক কিংবা জলপথে ও সমুদ্র পথে অথবা বিমানপথে বাণিজ্যই হোক এ ব্যাপারে সকল প্রকার আয়াস ও আনুকূল্য প্রদর্শন করা ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর (শাসক)-এর জন্য অত্যন্ত জরুরী। অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে যে, কুরআনুল করীম এবং রসূল (সা)-এর হাদীসের মধ্যে যদিও সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করা হয়েছে—তথাপি সামুদ্রিক তথা জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। এর কল্যাণ ও উপকারিতার দিক বিভিন্নভাবে এবং ভঙ্গীতে

(পূ.পৃ. পর) রসূল করীম (সা) বন্দোবস্ত প্রদান করেছিলেন। ইসলামী অর্থনীতির প্রাচীন পরিভাষায় একেই 'জায়গীর দান' বলা হয়। বলাবাহুল্য বর্তমান জায়গীরদারী ও সামন্তবাদী ভূমি নীতির সাথে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

অবশ্য এরূপ প্রদত্ত জমি আবাদযোগ্য করে তুলতে ব্যর্থ হলে তা পুনরায় ফেরত নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমর (রা) হযরত বিলাল (রা)-এর রসূল (সা) কর্তৃক প্রাপ্ত খয়বরের জমি আবাদ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরিণতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত করে সাধারণ মুসলমানদের ভেতর পুনর্বন্টন করে দেন। দেখুন, কিতাবুল খারাজ, ৯০ পৃষ্ঠা।—অনুবাদক।

সাধারণ লোকদের সামনে পেশ করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (রা) باب التجارة فى البحر বা 'সমুদ্র পথে বাণিজ্য সম্পর্কিত অধ্যায়' নামে একটি আলাদা অধ্যায় খাড়া করেছেন এবং এর অধীনে কুরআনুল করীমের আয়াত—

قوله تعالى وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله

অর্থাৎ "তোমরা দেখ সমুদ্রের বুক চিরিয়া জাহাজগুলি চলাচল করে যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার" এনে সে সমস্ত الفلك العظام বা বিরাটকায় জাহাজের দিকে ইশারা করেছেন—একমাত্র যার সাহায্যেই পশ্চিমা জাতিগোষ্ঠীকে লাভবান হতে দেখা যাচ্ছে। হায়! মুসলমানদের এখনও যদি হুঁশ ফিরতো। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে গিয়ে নিম্নোক্ত কতিপয় নীতি অবশ্যই মনে রাখতে হবে ঃ

১. ঐ সমস্ত পন্থাগুলি উচ্ছেদ করতে হবে যা ইসলামের পবিত্র শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েব।

২. ব্যবসা-বাণিজ্য এমনভাবে লালন-পালন করতে হবে যেন তা ইসলামের উত্তম চরিত্র বৈশিষ্ট্যের ও উত্তম গুণাবলীর উঁচু দরের শিক্ষক হিসাবে প্রমাণিত হয় যার সাহায্যে ইসলামের প্রভাব ও মর্যাদা অমুসলিম জাতি গোষ্ঠীর অন্তরমূলে গিয়ে পৌঁছায়। প্রথম যুগের মুসলিম ব্যবসায়ীদের সততা ও আমানতদারী দেশের পর দেশকে মুসলমান বানিয়ে ছেড়েছে। মালয় উপদ্বীপ, ফিলিপাইন, জাভা, সিংহল (স্মরণদ্বীপ), ইন্দোনেশিয়ার সাহিত্য-কার ইতিহাস দেখুন,—আপনি জানতে পারবেন ঐ সমস্ত দেশ এবং ঐ সমস্ত দেশের ন্যায় আরও বহু দেশে শুধু মুসলিম ব্যবসায়ী-বণিকদের সাহায্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছিল। ব্যবসায়ীকে কি ধরনের উত্তম গুণাবলী ও চরিত্রে বিভূষিত হওয়া দরকার তার বিস্তারিত বিবরণ হাদীছ গ্রন্থে মিলবে। এক্ষেত্রে শুধু দু'টি হাদীছ পেশ করাকেই যথেষ্ট মনে করছি।

باب اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء بن الخالد كتب الى النبى ص هذا ما اشترى محمد رسول

هذا ما اشترى محمد رسول الله ص من العداء بن الخالد بيع المسلم لا داء ولا
خبثة ولا غائلة.....

وعن الحكيم بن حزام عن النبي ص قال
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما
في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي كنز
العمال عن النبي ص قال التاجر الصدوق الامين مع النبيين
والصديقين والشهداء. اخرجه الترمذي والبيهقي و
الحاكم وصححه والدارقطني والدارمي وغيرهم.

'ক্রেতা-বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ে যখন সুস্পষ্টতার আশ্রয় নেয়—কোনরূপ অস্পষ্টতা ও গোপনীয়তার আশ্রয় নেয় না, পরস্পর পরস্পরকে প্রতারণা করে না। 'আদ্দা বিন খালিদের বর্ণনা, রসূলুল্লাহ (সা) আমাকে লিখেছিলেন—এটাই সে জিনিস যা আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ (সা) 'আদ্দা বিন খালিদ থেকে কিনেছেন—দুজন মুসলমানের ক্রয়-বিক্রয় যার ভেতর অন্যায় পাপ ত্রুটি কিংবা চুরি বা প্রতারণা নেই।

এবং হযরত হাকীম বিন হিযাম থেকে বর্ণিত,—তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকে। যদি উভয়েই সততা ও সুস্পষ্টতার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে এবং কোনরূপ লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ না করে তবে উভয়ের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর উভয়েই যদি মিথ্যা ও কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ করে তবে বরকত বিনষ্ট হবে। 'কানযুল 'উম্মাল' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে—রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী (বেহেশতে) নবী, সিদ্দীক এবং শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত হবে।" তিরমিযী, বায়হাকী, হাকেম, দারকুৎনী, দারমী ইত্যাদি।

৩০. এমন সব কোম্পানী থেকে দূরে থাকতে হবে যার মাধ্যমে ব্যাংক, বীমা, লটারী ইত্যাদির ন্যায় ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট পুঁজিবাদের জীবাণু জন্মলাভ করে কিংবা যা শেষ পর্যন্ত মজুদদারীর ন্যায় ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট এবং জনগণ-শোষণমূলক ব্যবস্থার রূপ ধারণ করতে পারে।

৪. দেশের কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পের পরস্পরের মধ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়াস চালাতে হবে। এ সম্পর্কে আরও জানতে হলে হযরত শাহ্ উয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রা)-এর রচনাবলী পড়ুন। এখানে শুধুমাত্র 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'র 'শহরের রাষ্ট্রনীতি" শীর্ষক অধ্যায় থেকে কতিপয় অংশের অনুবাদ পেশ করা হলো। হযরত শাহ্ সাহেব (রা) শহরগামী নাগরিকদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

ومنه ان يبدو اهل المدينة ويكتفوا بالارتفاق الاول
او يتمدنوا فى غير هذه المدينة او يكون توزعهم فى الاقبال
على الاكتساب بحيث يضر بالمدينة مثل ان يقبل اكثرهم
على التجارة ويدعوا المزارعة الى اخر ما اطال رحمه الله ـ

"নাগরিকদের বনবাস জীবন তথা সন্ন্যাস জীবন, এক শহর ছেড়ে গিয়ে অন্য কোন শহরে গিয়ে বসতি স্থাপন, কিংবা নিজস্ব পেশা পরিত্যাগ করে একযোগে বিশেষ কোন পেশার প্রতি ঝুঁকে পড়া ইত্যাদি মুসলিম জাতির সাংস্কৃতিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য ক্ষতিকর। এতে সভ্যতা ও সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত ও বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। উদাহরণত, সবাই কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করলো, অথবা অধিকাংশ লোকই সৈনিক বৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলো। অতএব এটাই সমীচীন হবে যে, কৃষিজীবীদের খাদ্যরূপে মর্যাদা দিলে হস্তশিল্পী, ব্যবসায়ী, সৈনিকদের লবণরূপে স্থান দেয়া যায় যদ্দ্বারা খাদ্য সুস্বাদু ও পরিপূর্ণ রূপে লাভ করে। ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক জীবজন্তু কিংবা পশুপক্ষীর বিস্তৃতি ঘটতে দেয়া নাগরিকদের দুঃখ-কষ্টের কারণ। এদের উৎখাত ও বিনাশের চেষ্টা করা উচিত। শহরের পূর্ণ হিফাজত সেই সমস্ত ইমারত ও প্রাসাদ নির্মাণের সাহায্যে হয়ে থাকে যার উপকার ও কল্যাণ সবাই সমভাবে লাভ করে। যেমন—শহরকে চতুর্দিক দিয়ে প্রাচীর বেষ্টিত করা, সরাই, দুর্গ, সীমান্ত এলাকাগুলোর হিফাজত, বাজার, পুল, ইত্যাদি নির্মাণ। অনুরূপভাবে কুয়ো-খনন, ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করা, নদী পারাপারে নৌকা সরবরাহ করা,

ব্যবসায়ীদের বুঝিয়ে-সমঝিয়ে ভালবেসে বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য আমদানী করতে উৎসাহিত করা এবং শহরবাসীদের বুঝিয়ে দেয়া যেন তারা মুসাফির ও পর্যটকদের সাথে ভাল ব্যবহার করে। কেননা এদের কারণেই বিদেশী সওদাগরদের বেশী আনাগোনা ঘটে। কৃষকদের ভালভাবে বুঝান উচিত যেন কোন জমিই পতিত ও অনাবাদী না থাকে। হস্তশিল্পীদের গুরুত্বের সাথে স্মরণ করিয়ে দেয়া যেন তারা অতি উত্তম ও মযবুত দ্রব্যাদি তৈরী করে। শহরবাসীদের উৎসাহিত করতে হবে যেন তারা উত্তম স্বভাব, চরিত্র ও ব্যবহার আয়ত্তে আনতে সচেষ্ট হয়। চিঠি-পত্র, অংক, ইতিহাস, চিকিৎসা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন কলা-কৌশল ও পন্থা-পদ্ধতিগুলি পূর্ণতায় পৌঁছুতে সাহায্য করে। আর এটাও প্রয়োজন যেন শহরের প্রতিটি খবর ও প্রতি মুহূর্তের অবস্থা সম্পর্কে দরকারী তথ্য সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়। গোলমাল, হৈ হট্টগোল, বিপর্যয় ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী এবং অপর দিকে শান্তিপ্রিয় ও সৎস্বভাববিশিষ্ট ও উত্তম চরিত্র গুণবৈশিষ্টে মণ্ডিত লোকদের প্রতি মুহূর্তের খোঁজ-খবর রাখা ও হাল-হাকীকত জানা থাকা আবশ্যক যেন দুঃখী ও অভাবী লোকের সাক্ষাত পাওয়া মাত্রই তাকে সাহায্য করা যায়। আর যদি কোন উত্তম ও সুদক্ষ হস্তশিল্পীর সন্ধান মিলে তবে প্রয়োজনবোধে তার সাহায্য ও সহায়তাও যেন গ্রহণ করা যায়।

অতীত যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের পেছনে দুটো কারণ রয়েছে। **প্রথমত,** জনগণের জন্য বায়তুলমাল তথা সরকারী কোষাগারের দরজা বন্ধ করে দেয়া, যুদ্ধ-জয়ী বীর ও সৈনিক এবং ঐ সমস্ত 'উলামায়ে কিরাম ও জ্ঞানী-গুণীদের বঞ্চিত করা বায়তুলমাল তথা সরকারী কোষাগারের উপর যাদের ন্যায্য হক রয়েছে, তাদের নিজস্ব প্রাপ্য তাদের না দেয়া এবং চাটুকার ও তোষামোদপ্রিয় লোকদের শাসকদের সঙ্গে যারা বিশেষভাবে সম্পর্কিত, বায়তুলমালকে নিজেদের জীবিকার উপায়-উপকরণ মনে করাকেই যারা নিজেদের স্বভাবে পরিণত করেছে, তাদের জনগণের আমানতরূপ ধনভাণ্ডারের অধিকারী বানিয়ে দেয়া এবং এর থেকেই তাদের সার্বিক রুজী-রোজগারের ব্যবস্থা করা, অথচ যাদের দ্বারা রাষ্ট্রের কোনরূপ খিদমত

হয় না। এর ফলেই একের পর এক এ ধরনের লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। শেষাবধি এরা শহরবাসীদের জন্য বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত, কৃষক, সওদাগর এবং পেশাজীবি ও বৃত্তিজীবী লোকদের উপর বিরাট ও বড় রকমের ট্যাক্স বসানো কোন এলাকা ও দেশ বিরান হওয়ার কারণ। ফলে যারা শক্তিশালী এরই পরিণতিতে তারা বারংবার বিদ্রোহের আশ্রয় নেয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির সচ্ছলতা ও বিশুদ্ধতা স্বল্প-হারে খাজনা নির্দ্ধারণ এবং প্রয়োজনানুপাতে রাষ্ট্রীয় রক্ষীদের নিযুক্ত করার ফলেই হয়ে থাকে। যুগের অধিবাসীদের পক্ষে এ সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া উচিত।

মোট কথা, রাষ্ট্রীয় আমলা ও কর্মচারী সীমিত সংখ্যার মধ্যে হলে ভাল হয়। বিরাট অংকের বেতন হ্রাস করা উচিত এবং কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-পণ্যের উপর ট্যাক্সের বোঝা কমানো উচিত।

তৃতীয়ঃ শিল্প

শিল্পক্ষেত্রে অনেকগুলি বিভাগ রয়েছে। যেহেতু ইসলামী হুকুমতের উপর তার নাগরিকদের হিফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা ওয়াজিব-সেহেতু শিল্পোন্নয়ন সরকারের জন্য অপরিহার্য। শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান ও কলা-কৌশল সম্পর্কে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এতদ্‌সম্পর্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করা, শিল্পালয় স্থাপন করা এবং বিভিন্ন প্রকার শিল্পের জন্য রকমারী কল-কারখানার সাহায্যে হস্তশিল্প এবং উত্তম গুণবিশিষ্ট শিল্পদ্রব্য জনসাধারণের ভেতর প্রচলন করা অত্যন্ত দরকার। হযরত দাউদ (আ) স্বীয় হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। হযরত সুলায়মান (আ) খলীফা নির্বাচিত হয়ে উত্তম শিল্প নৈপুণ্য দ্বারা সমগ্র দেশকে বেহেশ্‌তে সদৃশ বানিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ পাক বলেন ঃ

"হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সংগে আমার পবিত্রতা-ঘোষণা কর এবং হে পক্ষীকুল তোমরাও" ,এই আদেশ দান, করিয়া আমিই দাউদের প্রতি

অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং লৌহ করিয়াছিলাম তাহার জন্য নমনীয়। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী কর এবং ঐগুলির কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকর্ম কর; তোমরা যাহা কর আমি উহার সম্যক দ্রষ্টা।"

'আমি সুলায়মানের অধীন করিয়াছিলাম বায়ুকে যাহা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করিত এবং সন্ধ্যায় একমাসের পথ অতিক্রম করিত। আমি তাহার জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছিলাম। আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে জিনদিগের কতক তাহার সম্মুখে কাজ করিত। উহাদিগের মধ্যে যাহারা আমার নির্দেশ অমান্য করে তাহাদিগকে আমি জ্বলন্ত অগ্নি-শাস্তি আস্বাদন করাইব।"

'উহারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, মূর্তি, বৃহদাকার হাউজ-সদৃশ পাত্র এবং চুল্লীর উপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করিত। আমি বলিয়াছিলাম, "হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ করিতে থাক। আমার দাসদিগের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।"

'আল্লামা শামী এবং অন্যান্য প্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধ বিদ্বানমণ্ডলীর মতে—মুসলমানদের পক্ষে সকল প্রকার শিল্প নৈপুণ্যে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ হওয়া ফরযে কিফায়া। রদ্দুল মুহতার ১ম খণ্ড দেখুন। নবী করীম (সা) থেকেও এতদ্সম্পর্কিত বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে মশহুর একটি হাদীছ এরূপ ঃ

ان النبی صـ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل
من عمل یده و ان نبی الله داؤد کان یاکل من عمل یده -
اخرجه البخاری وغیره -

রসূল করীম (সা) বলেন ঃ যে কোন উপার্জন অপেক্ষা নিজ হাতের উপার্জন উত্তম। আর আল্লাহ্র নবী দাউদ (আ) নিজ হাতে উপার্জিত অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন।"

সতর্কতা

মিল কিংবা কল-কারখানা সম্পর্কে একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যেন তার শতাংশ নির্ধারিত গুটি কয়েক লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে না যায়। অন্যথায় নিকৃষ্ট পুঁজিবাদ বৃদ্ধি পাবে এবং অধিকাংশ আল্লাহ্র বান্দাদের জীবন ও জীবিকার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। সমগ্র দেশ দুঃখ-দৈন্য, দারিদ্র ও বেকারত্বের অভিশাপে ছেয়ে যাবে। এমন সব বিভিন্ন নৈতিকতা-বিরোধী ও চরিত্র বিধ্বংসী কার্যকলাপ জন্ম নেবে—যার বিস্তারিত বর্ণনার সুযোগ বর্তমান পুস্তকে নেই।

দেশরক্ষা বিভাগের উদ্দেশ্য

দেশকে ও দেশের অধিবাসীদেরকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা ইসলামের খলীফার উপর ফরয। এর অধীনে এত সব শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান যার সংক্ষিপ্ত খসড়া পেশ করাও এ পুস্তকে সম্ভব নয়। ফকীহ্ ও মুহাদ্দিছ-গণ শত শত পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তক-পুস্তিকা লিখে গেছেন। কুরআনুল করীম ও হাদীছ শরীফে এ সম্পর্কিত আলোচনা বহুল ও বিস্তারিত। স্বয়ং নবী করীম (সা) নিজের কাজের দ্বারা বিষয়টিকে এতবেশী উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট করে তুলেছেন যে, এজন্য আমাকে অধিকতর অবগতি ও অবহিতির জন্যে ইউরোপ কিংবা আমেরিকার দ্বারস্থ হবার দরকার হবে না। এর সাথে সাথে যদি আমরা ফারূকী খেলাফতকেও শামিল করে নি-ই তবে এতদ্সম্পর্কিত সকল বিষয় ও সমস্যাদি এবং সংলগ্ন শাখা-প্রশাখাগুলি প্রভাত সূর্যের ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়ে ফুটবে। এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে এর কতিপয় শাখা সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম : ফৌজী রেজিস্টার বা সৈন্যদের তালিকা

এ বিষয়টি স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর যমানায় তাঁরই নির্দেশে বাস্তব অস্তিত্ব লাভ করে।

عن ابن عباس رض قال جاء رجل النبى ص فقال يا رسول الله ص اكتتبت فى غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتى حاجة

الحديث - اخرجه البخاری قال الکرمانی اکتتب الرجل اذا کتب نفسه فی دیوان السلطان -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি অমুক অমুক যুদ্ধের তালিকায় নিজের নাম লিপিবদ্ধ করেছি এবং মৃত্যুর মুখোমুখী পৌঁছেছি।" বুখারী; কিরমানী বলেন: লোকটি নিজ থেকেই রাষ্ট্রীয় রেজিষ্টারভুক্ত হয়েছিলো।

হাদীছটি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যমানাতেই ফৌজী রেজিষ্টারের জন্মলাভ ঘটেছিলো। বরং কতিপয় হাদীছ থেকে আরও জানা যায় যে, সমস্ত মুসলমানদের রেজিষ্টার ও দফতর হুযূর (সা)-এর যমানায় বর্তমান ছিলো।

عن حذیفة رض قال قال النبی ص اکتبوا لی من یلفظ بالاسلام من الناس فکتبنا له الفا وخمسمائة رجل - الحدیث اخرجه البخاری -

অর্থাৎ "হুযায়ফা (রা) বলেন: রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন:—'সমস্ত মুসলমানদের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করে আমাকে দাও।" এরপর আমরা পনেরশ' লোকের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করলাম।" বর্ণিত হাদীছ প্রসঙ্গে অনেক কিছু বলার আছে। যদিও তা বলার স্থান এখানে নয়। 'আল্লামা ইবনুত্তীন বলেন: বর্ণিত হাদীছের তালিকা বলতে মুজাহিদীনদের তালিকা বুঝাবে। এরা সবাই খন্দক যুদ্ধে শরীক ছিলেন। হযরত ফারুক-ই-আ'জম (রা)-এর যমানায় ইসলামী খিলাফতের সীমানা রোমান সাম্রাজ্যের তুলনায় অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে এবং পারস্য ও রোমান সম্রাটদের বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্য যখন মুসলমানদের হাতে আসে তখনই বিশাল মুসলিম সেনাবাহিনীকে একটি সুসংবদ্ধ রূপ দেবার প্রয়োজন অনুভূত হয়—ঠিক সেই মুহূর্তে হযরত 'উমর (রা' এর দিকে বিশেষ নজর দেন এবং সমগ্র দেশটাকেই একটি সেনাবাহিনীতে পরিণত করতে চাইলেন। কিন্তু প্রাথমিক মুহূর্তে এ ধরনের একটি বিরাট পরিকল্পনার বাস্তবায়ন মোটেই সহজ ছিলো না। এজন্য

সর্বপ্রথম মুহাজির ও আনসারদের দিয়েই এর উদ্বোধন করেন এবং মাখরামা বিন নওফেল, জুবায়র বিন মুত্‌য়িম ও 'আকীল বিন আবু তালিবকে এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন যেন তারা কুরায়শ ও আনসারদের একটি রেজিষ্টার সর্বপ্রথম তৈরী করেন যার ভেতর প্রতিটি ব্যক্তির নাম, বংশ পরিচয় ইত্যাদি বিস্তারিত ভাবে থাকবে। নির্দেশ মাফিক রেজিষ্টার প্রস্তুত হলো এবং এদের জন্য নিম্নবর্ণিত ছক মুতাবিক ভাতা নির্ধারিত হয় ঃ

সংখ্যা	বিবরণ	বাৎসরিক ভাতা
১.	যাঁরা বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন	৫,০০০ দিরহাম
২.	,, ওহুদ ,, ,, ,, ও তৎসহ যাঁরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন	৪,০০০ ,,
৩.	মক্কা বিজয়ের পূর্বে যাঁরা হিজরত করেন	৩,০০০ দিরহাম
৪.	মক্কা ,, সময় ,, মুসলমান হয়েছিলেন	২০০০ ,,
৫.	যাঁরা ইয়ারমুক ও কাদেসিয়া যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন	২,০০০ ,,
৬.	য়ামনবাসীদের জন্য	৪০০ ,,
৭.	কাদেসিয়া যুদ্ধ পরবর্তী মুজাহিদীন	৩০০ ,,
৮.	সকল শ্রেণীর লোক	২০০ ,,

যে সমস্ত লোকের নাম রেজিষ্টারভুক্ত হয়েছিলো তাদের স্ত্রী, শিশু, কন্যা-পুত্রদেরও ভাতা নির্ধারণ করা হয়। এখানে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, যে ব্যক্তির জন্য যে পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করা হয়েছিলো—তার ক্রীতদাসের জন্যেও ঠিক সমপরিমাণ ভাতাই নির্ধারিত হয়েছিলো। এ থেকে ইসলামী সাম্যের দৃষ্টান্ত আপনি খুঁজে পাবেন। কিছুদিন পর এ ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করে আনসার ও কুরায়শদের মুকাবিলায় সমগ্র আরব গোত্র ও উপজাতীয়দেরও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গোটা দেশব্যাপী আদমশুমারী করানো হয় এবং আরব বংশোদ্ভূত প্রতিটি লোকেরই যোগ্যতা ও মর্যাদা অনুযায়ী ভাতা নির্দিষ্ট করা হয়। এমন কি দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্যেও ভাতা নিয়মিতভাবে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

এটা ধরে নেয়া হয়েছিলো যে, আরবের প্রতিটি শিশুই জন্মের পর মুহূর্ত থেকে ইসলামী ফৌজের এক একজন সৈনিক—মর্দে মুজাহিদ। হযরত 'উমর (রা) অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ফরমান জারী করেছিলেন,—আরবের কোন লোকই যেন বিজিত এলাকা ও দেশগুলিতে গিয়ে কৃষি, ব্যবসা কিংবা অন্যবিধ পেশা অবলম্বন না করে। কেননা এতে তাদের পুরুষানুক্রমিক সৈনিকবৃত্তিতে ভাটা দেখা দেবে। ফলে ইসলামী খিলাফত উপযুক্ত ও দক্ষ সৈন্য থেকে বঞ্চিত হবে। 'আল্লামা তানতাবী জওহরী স্বীয় গ্রন্থ নিজামুল 'আলম ওয়াল উমাম-এর ২য় খণ্ডে বলেন :

"হযরত 'উমর (রা)-এর খিলাফতকালে যখন সারা ইসলাম জাহানে সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিলো এবং আদমশুমারীর রেজিষ্টার প্রস্তুতির কাজ শেষ হলো—তখন তিনি রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও সকল কর্মচারী, গভর্নর, বিচারক প্রমুখের জন্য বেতন-ভাতা নির্ধারিত করেন এবং বিত্ত-সম্পদের পুঞ্জীভূত করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। মুসলমানদের জন্য জমিদারী ও কৃষি কাজকে নিষিদ্ধ করা হলো। কেননা তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তি ও ভাতা বায়তুলমাল থেকে দেয়া হয়েছিলো। শুধু তাই নয় তাদের পরিবারবর্গের জন্যেও ভাতা নির্দিষ্ট হয়েছিলো। এমন কি তাদের ক্রীতদাস ও আযাদকৃত গোলামদের পর্যন্ত ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা বায়তুলমাল থেকেই করা হয়েছিলো। আর এর পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো যেন গোটা জাতিই সৈনিক ও যোদ্ধা জাতি হিসেবে গড়ে ওঠে এবং সদা প্রস্তুত অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে অগ্রসর হওয়ার জন্য তৈরী থাকে। তাদের এ যাত্রাপথে জমিদারী ও কৃষি কাজ যেন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে এবং তারা যেন অলস জীবন ও বিলাসিতায় নিমজ্জিত না হয়।"

দ্বিতীয় : সীমান্ত এলাকার হিফাজত (সীমান্ত রক্ষা)

ইসলামের দৃষ্টিতে দেশের সীমান্ত ও তার সংলগ্ন এলাকাগুলির হিফাজত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাদীছের পরিভাষায় সীমান্ত ছাউনী (ব্যারাক কিংবা ফাঁড়ি) ও দুর্গকে 'রিবাত' (رباط) বলা হয়ে থাকে এবং সেখানকার

সৈন্যদের মুরাবিতীন (مرابطين) বলা হয়। ফতহুল কাদীর এবং বাহরুর রায়েক গ্রন্থে 'রিবাত' শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে :

الرباط هو الاقامة فى موضع يتوقع منهم هجوم العدو ولد فعهم -

অর্থাৎ "রিবাত বলতে এমন অবস্থানকে বুঝায় যেখানে দুশমনের ভীড় লেগে থাকে অর্থাৎ যেখানে দুশমনের আশংকা সদা বিদ্যমান এবং যার প্রতিরক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন।" হুযূর আকরাম (সা) রিবাত (সীমান্ত প্রতিরক্ষা)-কে আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত সব কিছু থেকে অধিকতম মূল্যবান হিসাবে অভিহিত করেছেন। হাদীছ পাকে বলা হয়েছে :

عن سهل بن سعد رض ان رسول الله ص قال رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها -

"হযরত সহল বিন সা'দ (রা) বলেন—রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন সীমান্ত প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকা দুনিয়া এবং দুনিয়ার উপরস্থ সবকিছু অপেক্ষা অধিকতম উত্তম।" —বুখারী।

১৭ হিজরীতে হযরত 'উমর ফারূক (রা) যখন সিরিয়া সফর শুরু করেন তখন তিনি সীমান্ত ছাউনি ও শহরগুলি খুব ঘুরে-ফিরে দেখেন এবং সৈন্যদের শান্তি-শৃংখলা তৎসহ তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করেন। যে সমস্ত শহর ও এলাকা সমুদ্রের ধারে অবস্থিত আরবী ভাষায় তাকে سواحل বলা হয়,—যেমন : 'আসকালান, ইয়াফা, কায়সারিয়া ইত্যাদি শহরগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কেননা রোমানদের নৌবহর ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। একবার হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) হযরত 'উমর (রা)-কে লিখে পাঠান সিরিয়ার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলির জন্য অধিকতর প্রস্তুতির প্রয়োজন। হযরত 'উমর তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পাঠান যেন সমস্ত দুর্গগুলো নতুনভাবে মেরামত করা হয় এবং তাতে স্থায়ীভাবে সৈন্য প্রস্তুত রাখা হোক—আর এরই সাথে সাথে সমস্ত সামুদ্রিক দর্শনীয় স্থানগুলিতে পাহারাদার নিযুক্ত করা হোক ও সদা-সর্বদা আগুন

জ্বালিয়ে রাখা হোক। ১৯ হিজরীতে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস যখন সমুদ্র পথে মিসর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন হযরত 'উমর (রা) তৎক্ষণাৎ সমুদ্র উপকূলবর্তী সমগ্র এলাকায় ফৌজী ছাউনী কায়েম করেন।

তৃতীয় : জিহাদে ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্রের সংখ্যা

জিহাদ-যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবস্থা করা বিশেষভাবে ইসলামী হুকুমতের উপর এবং সাধারণভাবে সমগ্র মুসলিম জনসাধারণের উপর অত্যন্ত জরুরী। কুরআনুল করীম বলেন :

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ -

"তোমরা তাহাদিগের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব প্রস্তুত রাখিবে; এতদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করিবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদিগের শত্রুকে।"

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা মুসলমানদের উপর সকল রকমের অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ এবং আবশ্যকীয় অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়াকে ফরয করে দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে অশ্বারোহী বাহিনীর উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এমন প্রস্তুতি গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছে—যেন দুশমন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তার বুক কেঁপে ওঠে। কুরআন শরীফ ارهاب শব্দের ব্যবহারকে সাধারণ অর্থ রেখে সেদিকের ইঙ্গিত প্রদান করেছে যে, যে যুগে যে ধরনের প্রস্তুতি প্রয়োজন সে যুগে সেই ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য ফরয। এর ভেতর বর্তমান যুগের প্রচলিত ও ব্যবহৃত যুদ্ধের নিয়মাবলী ও কলা-কৌশল প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সামরিক একাডেমী, নৌ-একাডেমী, বিমান বাহিনী স্টাফ কলেজ, নৌ-যুদ্ধ জাহাজ, দুর্ভেদ্য দুর্গ, বিভিন্ন রকম সামরিক পোশাকাদি, যুদ্ধ বিমান, বোমারু বিমান,—ফ্রিগেট, সাবমেরিন, টর্পেডো রেডিও, টেলিফোন, ট্যাংক, রকেট,

মিসাইল ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। এ সবেরই ব্যবস্থা ও সরবরাহ করা ইসলামী হুকুমতের উপর ফরয। তদুপরি নতুন নতুন যুদ্ধাস্ত্রের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনও অত্যন্ত জরুরী। কুরআনুল করীম من قوة (মিন কুওয়াতিন) শব্দ ব্যবহার করে قوة তথা শক্তিকে সাধারণ-অর্থ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন যেন এ দ্বারা বুঝা যায়—যুদ্ধ শক্তিতে যুগে যুগে তারতম্য ঘটবে। যুগের পরিবর্তনের সাথে যুদ্ধ শক্তিতেও পরিবর্তন সংঘটিত হতে থাকবে। বর্তমানে যুদ্ধ শক্তি বলতে রাইফেল, মেশিনগান, কামান, বিভিন্ন প্রকার বোমা ও মিসাইল ইত্যাদি বুঝাবে। ইসলামী হুকুমতের পক্ষে নিজ দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষায়, আপন নাগরিকদের জান-মাল রক্ষায় এসব যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবস্থা ও এর সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতির সবরকম প্রয়াস অব্যাহত রাখা অবশ্য কর্তব্য। রসূলে মকবুল (সা) বলেছেন :

الا ان القوة الرمى الا ان القوة الرمى الا ان القوة الرمى - اخرجه مسلم فى صحيحه -

"জেনে রেখো—নিক্ষেপ করার মধ্যেই শক্তি নিহিত, নিক্ষেপের মধ্যেই শক্তি নিহিত—নিক্ষেপের ভেতরই শক্তি নিহিত।" মুসলিম বর্ণিত হাদীছের মধ্যে الرمى তথা নিক্ষেপ শব্দটিকেও পূর্বের ন্যায় সাধারণ অর্থে রাখা হয়েছে। বর্তমান যুগের নিক্ষেপক অস্ত্র রাইফেল, মেশিনগান, কামানের মর্টারের শেল, বোমা, টর্পেডো, রকেট ইত্যাদি সবই উক্ত শব্দের অন্তর্গত। এ সমস্ত বিষয়ের সার্বিক ও সামগ্রিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ দানের জন্য স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী একাডেমী স্থাপন এবং এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে গবেষকদের পরিপোষণ হুকুমতের জন্য বাধ্যতামূলক।

চতুর্থ : বিবিধ

নতুন সৈন্য ভর্তির ব্যবস্থা, খোরাক ও রসদ-পত্রের ব্যবস্থা, পোষাকাদি, হিসাব-পত্রের ব্যবস্থা, সৈন্যদের প্রশিক্ষণ, নৈতিক ও চারিত্রিক মান উন্নয়ন, তদারকীর ব্যবস্থা, ছাউনী ও ব্যারাক নির্মাণ, গোয়েন্দা নিযুক্তি, ট্রেঞ্চ ও

রাংকার খনন ব্যবস্থা সবই রসূল করীম (সা)-এর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এবং হযরত ফারুক-ই-আ'জম (রা)-এর সকলটি সম্পর্কে স্বতন্ত্র বিভাগ ও দফতর কায়েম করেছিলেন এবং সব ক'টিকে উন্নতির সর্বোচ্চ সীমায় উন্নীত করেছিলেন।

যিম্মী প্রজাদের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রের বসবাসরত অমুসলিম নাগরিক (যিম্মী)-দের যে অধিকার ইসলাম দান করেছে—তাতে তারা আর জিম্মি (আশ্রিত বা দায়িত্বভুক্ত) থাকেনি বরং তারা চুক্তিবদ্ধ দুটি সমান পক্ষের একটি পক্ষের মর্যাদা পেয়েছে। এজন্যেই হুযুর (সা) তাদেরকে معاهد বা চুক্তিবদ্ধ খেতাবে ভূষিত করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : الا من ظلم معاهدا الحديث —অর্থাৎ "সাবধান! যারা চুক্তিবদ্ধের উপর জুলুম করে।" ইসলামের পক্ষ থেকে তাদের যে সমস্ত অধিকার দান করা হয়েছে এখানে তার বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভব নয় বিধায় সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করছি।

১. তাদের ধন-সম্পদ ও রক্ত মুসলমানদের ধন-সম্পদ ও রক্তের ন্যায় সমমর্যাদা দান করা হয়েছে।

انما بذلوا الجزية ليكون دمائهم كدمائنا واموالهم كاموالنا كما صرح بذالك الفقهاء ـ

অর্থাৎ "তারা জিযয়া এজন্যেই দিয়ে থাকে যেন তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ আমাদের রক্ত ও ধন-সম্পদের ন্যায় সমান মর্যাদা পায়।" বাহরুর রায়েক, বাদায়ে', মবসূত ইত্যাদি কিতাবগুলি দেখুন। এটা এমনই একটা নজীর দুনিয়ার ইতিহাস যার দ্বিতীয় নজীর পেশ করতে সক্ষম হয়নি।

২. রাজস্ব, ট্যাক্স ইত্যাদির ক্ষেত্রে মুসলমানদের তুলনায় তাদের বোঝা অনেক হাল্কা করা হয়েছে—যে সম্পর্কে পূর্বেই কিছু আলোচনা করা হয়েছে। তাদের জমি থেকে শুধু খাজনাই আদায় করা হয় যা তুলনামূলক-ভাবে আরও কম। তাদের নিরাপত্তা প্রদানের শর্তে ও নিরাপত্তা বিধানের বিনিময়েই শুধু জিযয়া গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাদের এতদসংক্রান্ত ব্যয়

হিসাবে। সাথে সাথে এটাও শর্ত থাকে যে, কোন কোন যিম্মী বৃদ্ধ, অক্ষম, বিকলাঙ্গ ও দরিদ্র হয়ে গেলে জিযয়া থেকে তাকে মুক্ত করে দেয়া হবে। অধিকন্তু বায়তুলমাল তার রুটি-রুজীর যিম্মাদার হবে। দুনিয়া কি অদ্যাবধি অনুরূপ প্রজাপালনের দ্বিতীয় নজীর পেশ করতে পেরেছে? কখনোই না।

৩. ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদের এমন স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে যার নজীরও দুনিয়াতে এর আগে এবং পরে কোন দিন কায়েম হয়নি। এটা ইসলামী জীবন দর্শনের বিশেষ ঔদার্য। আমরা এখানে আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে দু'চারটি চুক্তি সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

ক. রসূল মকবুল (সা) নাজরান প্রদেশের খৃষ্টান অধিবাসীদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন—তার মধ্যে তাদেরকে সকল প্রকার ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদর্শন করেছিলেন। কেবল মাত্র সুদী কায়-কারবার ও লেন-দেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

عن ابن عباس رض قال صالح رسول الله ص اهل نجران
على الفى حلة النصف فى صفر والبقية فى رجب يودونها
الى المسلمين وعارية ثلاثين فرسا وثلاثين بعيدا وثلاثين
من كل صنف من اصناف السلاح يغزون بها والمسلمون
ضامنون لها حتى يردوها عليهم ان كان باليمين كيد او
غدرة على أن لا يهدم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا
عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا او يا كلوا الربا - اخرجه
ابو داؤد -

অর্থাৎ "হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন : রসূল আকরাম (সা) নাজরানবাসীদের সাথে নিম্নোল্লিখিত শর্তে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন :

"নাজরানবাসী মুসলমানদের প্রতি বছর দু'হাজার পোশাক বা হুল্লাল আল-আওয়াকী দান করবে। এর মধ্যে অর্ধেক সফর মাসে বাকী অর্ধেক রযব মাসে দিতে হবে। শুল্ক প্রদানের সময় এক আউন্স প্রতিবার রৌপ্য প্রদান করতে হবে। তারা ত্রিশজন সৈন্যের পোশাক-পরিচ্ছদ, ত্রিশটি ঘোড়া,

ত্রিশটি উট এবং যুদ্ধের ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্রের প্রত্যেক প্রকারের ত্রিশটি করে মুসলমানদের সরবরাহ করবে। এর বিনিময়ে তারা তাদের জীবন, সম্পত্তি, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা লাভ করবে এবং প্রতিশ্রুতিও লাভ করবে যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হবে না আর তা এই যে,- তাদের গীর্জা ও মঠ ধ্বংস করা হবে না—পাদ্রী কিংবা সাধুকে গীর্জা ও মঠ থেকে অপসারণ করা চলবে না—তাদের ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকার জোরজুলুম, হস্তক্ষেপ ও নিপীড়ন করাও চলবে না। যতদিন পর্যন্ত তারা বিশ্বস্ততা সহকারে কর্তব্য পালন করে চলবে এবং কোন প্রকার অত্যাচারমূলক কাজে এবং সুদী কারকারবারে লিপ্ত না হবে, ততদিন পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকবে।" আবু দাউদ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

খ. হীরা প্রদেশের অধিবাসীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি নিম্নরূপ :

لا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة ولا قصر من قصورهم التى كانوا يتحصنون اذا نزل بهم عدو لهم ولا يمنعون من ضرب النواقيس ولا من اخراج الصلبان فى عيدهم من كتاب الخراج ملخصا -

অর্থাৎ "তাদের গীর্জা ও খানকাহ্ ধ্বংস করা হবে না।—এমন কোন প্রাসাদ ভূমিস্মাৎ করা যাবে না দুশমনের মুকাবিলায় প্রয়োজনবোধে যেখানে তারা আশ্রয় নিতে পারে, ঘণ্টা বাজানো থেকে বিরত রাখা যাবে না—উৎসবাদিতে ক্রুশকাষ্ঠ বের করা থেকে নিরত করা যাবে না।" কিতাবুল খারাজ—

গ. বায়তুল মুকাদ্দাসে হযরত 'উমর ফারুক (রা)-এর উপস্থিতিতে এবং তাঁরই ভাষায় যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিলো তা নিম্নরূপ :

هذا ما اعطى عبد الله امير المؤمنين اهل ايلياء من الامان اعطاهم امانا لانفسهم واموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وبريئهم وسائر اهل ملتهم انه لا يسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا

من شيء من اموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار احد منهم الحديث اخرجه الطبري في تاريخه ـ

"এটা সেই নিরাপত্তা-পত্র যা আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌ আমীরুল মু'মিনীন 'উমর ইলিয়ার অধিবাসীদের প্রদান করছেন। এটা তাদের জীবন, সম্পদ, গীর্জা, ক্রুশকাষ্ঠ, রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এবং তাদের সমস্ত ধর্মীয় লোকদের জন্য আর তা এরূপ যে, তাদের গীর্জায় বসবাস করা হবে না—তা ধূলিস্মাৎ করাও হবে না,—তার এবং তার আওতাভুক্ত কোন কিছুরই ক্ষতি করা হবে না,—তাদের ভেতর কারও কোন প্রকার ক্ষতি করা হবে না—!" কিতাবুল খারাজে অন্য আর একটি চুক্তিতে গীর্জার ঘণ্টা বাজানো সম্পর্কে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা বর্তমান :

وان يضربوا نواقيسهم في اى ساعة شاء ومن ليل او نهار الا في اوقات الصلوة ـ

অর্থাৎ "ইসলামী রাষ্ট্রে যিম্মী রাতদিন -যখন ইচ্ছা সালাতের সময় ব্যতিরেকে ঘণ্টা বাজাতে পারে।" মোদ্দা কথা, ইসলাম যিম্মীদের সাথে যেরূপ উদার, বিনয় ও কোমলতাপূর্ণ ব্যবহারের নিশ্চয়তা দেয়—দুনিয়ার ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। হাদীছ শরীফে বলা হয়েছে :

قال قال رسول الله ص الا من ظلم معاهدا او انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة اخرجه ابوداؤد ـ

'কেউ যদি চুক্তিবদ্ধ (যিম্মী, নিরাপত্তাপ্রাপ্ত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ) লোকের উপর জুলুম করে অথবা তাকে কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত করে—তার থেকে সাধ্যাতিরিক্ত কিছু আদায় করে অথবা তার সন্তোষজনক ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন জিনিষ গ্রহণ করে, তবে সাবধান! কিয়ামতের দিন তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র দরবারে মোকদ্দমা দায়ের করবো।" আবু দাউদ,

এরূপ উদার ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার এবং অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রনীতির প্রতিক্রিয়া এই হয়েছিলো যে, হযরত ফারুক-ই-আ'জম (রা)-এর যমানায় লাখো

যিম্মী আনন্দ ও সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছিলো। কতিপয় বিজ্ঞ পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকের মতে একমাত্র হযরত 'উমর (রা)-এর যমানায় প্রায় দু'কোটি লোকের ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিলো। আর যারা মুসলমান হয়নি তারাও স্বধর্মী রাজন্যবর্গের তুলনায় সংকট মুহূর্তে মুসলমানদের সাহায্য ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসতো আর যিম্মীরাই তো ইসলামী সৈনাদের রসদ-পত্র সরবরাহ করতো; সৈন্যদের অবস্থানস্থলে মীনা বাজার বসতো। নিজেদের উদ্যোগে, ব্যবস্থাপনায় ও ব্যয়ে রাস্তা-ঘাট ও পুল তৈরী করতো। এমন কি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিপক্ষ শিবিরে গিয়ে ইসলামী সৈন্যদলের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি এই যিম্মীরাই করতো। ইমাম আবূ ইউসুফ কিতাবুল খারাজ গ্রন্থে উল্লেখ করেন :

فلما رأى اهل الذمة وفاء المسلمين لهم وحسن السيرة فيهم صاروا اشداء على عدو المسلمين وعونا للمسلمين على اعدائهم فبعث اهل كل مدينة ممن جرى الصلح بينهم وبين المسلمين رجالا من قبلهم يتجسسون الاخبار عن الروم وعن ملكهم وما يريدون -

'যখন যিম্মীরা তাদের প্রতি মুসলমানদের ওয়াদা পালনের সততা বিশ্বস্ততা ও উত্তম চরিত্র গুণের পরিচয় পেলো তখন তারা মুসলমানদের সাহায্যকারী হয়ে গেলো। অতঃপর তারা প্রতিটি শহর থেকে লোক পাঠিয়ে মুসলমানদের সাথে নিজেদের সন্ধি স্থাপনে অগ্রসর হ'ল এবং এরাই নিজেদের দেশসহ রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন গোপন-সংবাদ সংগ্রহ করতো এবং মুসলিম শিবিরে তা পৌঁছে দিত।'

মুসলমানদের উদার ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার পরিণতিতে যিম্মীদের অন্তর-মানসকে এতখানি প্রভাবিত করেছিলো যে, ইয়ারমুক যুদ্ধের প্রাক্‌কালে মুসলিম সৈন্যদল যখন হেম্‌স শহর পরিত্যাগ করে চলে আসে তখন য়াহুদীরা তৌরাত হাতে উঠিয়ে বলেছিলো, 'আমরা যতক্ষণ জীবিত আছি—রোমক বাহিনী কখনই এখানে প্রবেশ করতে পারবে না।' খৃষ্টানেরা অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলছিলো,—'আল্লাহর কসম! তোমরা রোমকদের তুলনায় কতই না উত্তম ছিলে—আর তোমরা আমাদের কতই না প্রিয়!'

হযরত 'উমর (রা) ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে ভাবী খলীফার জন্য যে বিস্তারিত ওসিয়ত রেখে যান ইমাম বুখারী (র) তা স্বীয় হাদীছ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। ওসিয়তনামার শেষ বাক্যাংশ নিম্নরূপ :

واوصيه بذم الله ورسوله ان يوفى لهم بعهدهم وان يقاتل من ورائهم وان لا يكلفوا فوق طاقتهم -

"আমি আল্লাহ্ এবং তদীয় রসূল (সা)-এর যিম্মায় রক্ষিত যিম্মীদের সম্পর্কে তোমাকে ওসিয়ত করছি—তোমরা তাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করবে, তাদের পেছনে লড়বে এবং তাদের সাধ্যাতীত কষ্ট দেবে না।"

হে আমার প্রিয় মাহবূবে তা'আলা! আমার এই নগণ্য পুস্তকের উদ্দেশ্য একমাত্র তুমিই। তুমিই একে কবূল করো আর কবূল করো একে আপন যমীনের বুকে আর গ্রন্থকারকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বান্দাহদের শামিল করো। যা ইচ্ছা একমাত্র তুমিই তা করতে পারো।

চতুর্থ : বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

ইসলাম বিচার বিভাগকে নিজের পরিধি ও পরিসীমার ভেতর নিরংকুশ স্বাধীনতা প্রদান করেছে। মোকদ্দমার ক্ষেত্রে তা সে মোকদ্দমা দেওয়ানীই হোক কিংবা ফৌজদারী অথবা বিভিন্ন প্রকার শাস্তি প্রসঙ্গেই হোক—পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছে। ইসলাম বিচার বিভাগ স্থাপন পূর্বক স্বীয় নিযুক্ত বিচারক ও বিচারপতিদের মাধ্যমে বিবাদ-বিসম্বাদ অধ্যায়ে মুখতার মালিকানা ও স্বাধীনতা প্রদানের নজীর স্থাপন করেছে। ইসলামী হুকুমত বিচার-আচারের ক্ষেত্রে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না বরং এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়-বিচারের সর্বোচ্চ মান ও গুণাগুণ বজায় রাখতে বিচার বিভাগকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। আল্লাহ্ বলেন :

فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ -

অর্থাৎ "যদি তাহারা তোমার নিকট যায় তবে তুমি তাহাদের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি করিবে।" আরও বিস্তারিত জানতে হলে ফতহুল কাদীর ও ইমাম জাস্‌সাস রাযীর 'আহকামুল কুরআন' নামক গ্রন্থ দেখুন।

পরিশিষ্ট

আন্তর্জাতিক বিষয়াদি

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

এতদ্সম্পর্কে 'উলামায়ে কিরাম ও মুসলিম পণ্ডিতমণ্ডলী পবিত্র কুরআন ও রসূলে করীম (সা)-এর বাস্তব জীবনাদর্শের আলোকে হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখে গেছেন। শুধু ইমাম মুহাম্মদ (র) ই-যিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অন্যতম সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন বিশেষভাবে এরই উপর দুটি জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করে যান। 'উলামায়ে কিরাম তন্মধ্যে শুধু 'সিয়ারে কবীর'-এরই কতিপয় শরাহ লিখেছেন। এর ভেতর এমন শরাহও আছে যা কয়েকটি খণ্ডে সমাপ্ত। আমার এ পুস্তক তো তার সূচীপত্রের সাথেই মাত্র তুলনা করা করা যায়। এজন্যে আমি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির দিকে ইঙ্গিত প্রদান করাকেই যথেষ্ট মনে করছি। এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে—দুটো অপরিচিত ও অজানা রাষ্ট্রের মাঝে সম্পর্ক হয় সৌহার্দ ও সৌজন্যমূলক হবে কিংবা বিদ্বেষ ও অসৌজন্যমূলক হবে। উভয়ের মাঝে হয় অশান্তি ও যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে—অথবা নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করবে। এজন্য এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করবো।

প্রথম অধ্যায়

সন্ধি সম্পর্কিত

আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ـ

"তাহারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকিবে ও আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করিবে।" সূরা আনফাল।

ইসলামী জীবন দর্শন তামাম সৃষ্টি জগতের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গামবাহী। সেজন্যে সে আন্তর্জাতিক সমস্যা ও বিবয়াদির ক্ষেত্রে শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণের অভিসারী এবং সহযোগী। আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

"আর (হে নবী!) তোমাকে সমগ্র বিশ্বজগতের রহমত ও কল্যাণস্বরূপই পাঠানো হইয়াছে।" রসূলে আকরাম (সা) বলেন :

الراحمون يرحمهما الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ـــ الحديث -

"যারা পরস্পরে একের অপরের প্রতি সদয় ও দয়াপরবশ হয় আল্লাহ্ তাদের উভয়ের প্রতি সদয় ও দয়াপরবশ হন। তোমরা যমীনের বুকের সব কিছুর প্রতি সদয় হও—আসমানের আল্লাহ্ও তাহলে তোমাদের প্রতি সদয় ও দয়াপরবশ হবেন।" তিরমিযী—আর সেজন্যেই হুযূরে আকরাম (সা) হুদায়বিয়া নামক স্থানে বাহ্যত নতি স্বীকার করেও সন্ধি করতে রাযী হয়েছিলেন। কেননা ইসলাম একটি খাঁটি ও সত্য-সুন্দর ধর্ম। সে স্বয়ং প্রচার ব্যাপদেশে তলোয়ার কিংবা সঙ্গীনের মুখাপেক্ষী নয়। সে জনগণের নিকট শুধু এ দাবী জানায় যেন তারা তার দেয়া হেদায়েত ও শিক্ষা মনোযোগ ও অভিনিবেশ সহকারে শোনে। কেননা এটা সম্ভব নয় যে, কোন ব্যক্তি যিদ্দওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের দাওয়াতে মনযোগী হবে, ইসলামের সৌন্দর্যের দিকে সত্যিকার ও আন্তরিক দৃষ্টি দেবে ও চিন্তা করবে এবং এরপরও সে কুফরী অবস্থার উপর সুদৃঢ় ও স্থায়ী থাকবে। এজন্য হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন চারদিকে শান্তি ও নিরাপত্তার আবহাওয়া বইতে শুরু করলো এবং ইসলামের নিবেদিতপ্রাণ মুবাল্লিগ (প্রচারক) বৃন্দ নির্ভীক চিত্তে সমগ্র আরব ভূ-খণ্ডে ছড়িয়ে পড়লো—তখন আরবের ঘরে ঘরে ইসলামের গুঞ্জরণ শুরু হয়ে গেছে। এরপর মাত্র তিন বছরের মধ্যে এমনই এক বিপ্লব ফেটে পড়লো যা হাজার বছর ব্যাপী যুদ্ধের দ্বারাও সম্ভব হবে না। আল্লাহ্র 'উন্মুক্ত তলোয়ার খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা), মশহুর রাজনীতিবিদ 'আমর ইবনুল 'আস (রা) এবং আরব জগতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠতম

সন্তানবৃন্দ এ সময়েই ইসলামের একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হয়। ক্রমে ক্রমে সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলাম বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়লো। ইসলামের মুবাল্লিগবৃন্দ রোমের সম্রাট, পারস্যের শাহানশাহ্, গাস্সান অধিপতি মিসররাজ প্রমুখের দরবারে ইসলামের তবলিগী দাওয়াতনামা নিয়ে পৌঁছে যায়। এজন্যেই হুদাবিয়ার সন্ধিকে আল্লাহ্ পাক فتح مبين বা প্রকাশ্য ও নিশ্চিত বিজয় নামে আখ্যায়িত করেন। আল্লাহ্ পাক বলেন :

إنا فتحنا لك فتحا مبينا -

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তোমার জন্য অবধারিত করিয়াছেন নিশ্চিত বিজয়।" সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে : হুযুরে আকরাম (সা) হুদায়বিয়া থেকে ফেরার পথে হযরত 'উমর (রা)-কে ডেকে বলেন :

لقد انزلت على الليلة سورة هى احب الى مما طلعت عليه الشمس ثم قرء انا فتحنا لك فتحا مبينا - واخرج البخارى عن انس رض انا فتحنا لك فتحا مبينا ؛ قال الحديبية -

"আজ রাত্রে আমার উপর এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে যা দুনিয়া জাহানের তুলনায় আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। অতঃপর তিনি সূরা ফাত্হের আয়াত পড়ে শুনিয়ে দিলেন।" হযরত আনাস (রা) সূরা ফাত্হের فتح مبين বা সুস্পষ্ট, প্রকাশ্য ও অবধারিত বিজয় কোনটি সম্পর্কে বলেছিলেন, এটা ছিলো হুদায়বিয়ার সন্ধি।" হাফিজ ইবনে হাজর 'আসকালানী (র) স্বীয় গ্রন্থ ফতহুল বারীর ৭ম খণ্ডের ৩৫০ পৃষ্ঠায় বলেন :

"আল্লাহ্র বাণী 'আমি তোমাকে সুস্পষ্ট ও অবধারিত বিজয় দান করিয়াছি—" এর অর্থ এখানে হুদায়বিয়ার সন্ধি। কেননা হুদায়বিয়ার সন্ধিই মুসলমানদের নিশ্চিত বিজয়ের দরজা খুলে দিয়েছিল—সন্ধি ছিলো যার প্রারম্ভিক পর্যায়। কেননা সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে যুদ্ধ-বিরতি ঘটে ও শান্তি স্থাপিত হয়। মদীনায় পৌঁছা এবং ইসলামে প্রবেশ করতে যারা ভয় পেত তাদের পক্ষে এ ভয় বিদূরিত হয়। এরই পরিণতিতে খালিদ বিন

ওয়ালীদ এবং 'আমর বিন 'আসের ইসলাম গ্রহণসহ এমন সব ঘটনাবলী ও কার্যকারণ ক্রমিকহারে ঘটতে থাকে যা মক্কা বিজয়ে গিয়ে শেষ হয়। ইবনে ইসহাক 'মাগাযী' গ্রন্থে যুহ্‌রী থেকে বর্ণনা করেন,—হুদায়বিয়ার বিজয় অপেক্ষা বৃহত্তর বিজয় ইসলামের ইতিহাসে আর ইতিপূর্বে সম্ভব হয়নি। পূর্ববর্তী যুদ্ধাবস্থা থেকে শান্তির অবস্থায় ফিরে আসা মাত্রই আরব ভূখণ্ডের জনগণ নির্ভয়ে পরস্পরের সাথে পরস্পর মেলা-মেশা শুরু করে। কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। প্রতিটি দূরদর্শী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। এরই ফলে আমরা দেখতে পাই সন্ধি পরবর্তী দু'বছর ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা পূর্ববর্তী সময়ের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। ইবনে হিশাম তার প্রমাণ হিসেবে পরিসংখ্যান পেশ করে বলেনঃ নবী করীম (সা) মাত্র চৌদ্দশত সাহাবী নিয়ে হুদায়বিয়ার দিকে বের হয়েছিলেন;—কিন্তু মাত্র দু'বছর পরই মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর সাথে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো দশ হাজার। ইবনুল হুমাম বলেনঃ হুদায়বিয়ার সন্ধি নিশ্চিতভাবেই মুসলমানদের জন্য একটি বিরাট কল্যাণ বয়ে নিয়ে এসেছিলো। কেননা মুসলমানদের সাথে মেলা-মেশার ফলেই ইসলামের মহৎ সৌন্দর্য আরবের জাতিগোষ্ঠীর সামনে উজ্জ্বলতররূপে ধরা দেয়। মুসলমানদেরর সাথে মেলা-মেশার পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা উপলব্ধি করা থেকে তারা বহু দূরে অবস্থান করছিলো।"

এখানে পারস্পরিক সন্ধিচুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হচ্ছে।

১মঃ রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপনে পারস্পরিক সমঝোতামূলক চুক্তি (عقد الموادعة)

এরূপ ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিমদের একটি জাতি হিসেবে অভিহিত করা হয়। পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসা, একে অপরের দুশমনের আক্রমণ প্রতিরোধে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি অঙ্গীকার ও চুক্তির ভিত্তিতে অন্যাবিধ পার্থক্য বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। এমতাবস্থায় অমুসলিমদের

নিকট থেকে কোন প্রকার জিয্য়াও নেয়া হয় না কিংবা তাদের জমি থেকে কোন প্রকার খাজনাও নেয়া হয় না। এটা اهون البليتين বা 'দুটি বিপদের ভেতর সহজতর' বিপদটিকে স্বীকার করে নেয়ার ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়। হুযুর আকরাম (সা) হিজরতের পরপরই মদীনা মুনাওয়ারার মুসলিম ও অমুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। প্রথম হিজরীতে কতিপয় রাষ্ট্রনৈতিক লক্ষ্যের অধীনে এ চুক্তি অস্তিত্ব লাভ করে এবং একটি বিস্তারিত দলীলও সম্পাদিত হয় যা সীরতে ইবনে হিশাম, আবু 'উবায়দাহর কিতাবুল আমওয়াল, ইবনে কাছীরের আল-বিদায়া ওয়ান নেহায়া, সীরতে ইবনে সাইয়েদিন্নাস, ইমাম সুহায়লের রওযুল আনফ ইত্যাদি গ্রন্থে উক্ত সম্পাদিত দলীলের বিস্তারিত বিবরণ লিখিত আছে। রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত দলীলটি এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে, তার ব্যাখ্যার জন্য একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনার প্রয়োজন। এখানে কতিপয় বাক্যাংশের উদ্ধৃতি দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি। ইমাম সুহায়লী রওযুল আনফ গ্রন্থে বলেন :

"আল্লাহর রসূল (সা) মুহাজির আনসারদের নিয়ে য়াহূদীদের সাথে সন্ধির উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত সনদটি লিপিবদ্ধ করেন। এই সনদের শর্তের ভিত্তিতে য়াহূদীদের সাথে মুসলমানদের যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—তার ভিত্তিতে য়াহূদিগণকে তাদের ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের অবাধ অধিকার দেয়া হয়; আর তাদের নিজেদের সম্পদের ভোগ-দখলের অধিকার এবং এর রক্ষা কবচেরও নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। একই সাথে এতে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে কতকগুলি বাধ্য-বাধকতাও আরোপ করা হয়।" চুক্তিটি নিম্নরূপ :

'পরম করুণাময় ও কৃপানিধান মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি। একদিকে কুরায়শ বংশীয় ও য়াছরিবের (মদীনার) মুমিন-মুসলমানগণ, তাদের অনুসরণকারী ও সহ-সংগ্রামী আর অন্যদিকে মদীনার য়াহূদী সম্প্রদায় এবং যারা তাদের অনুসরণকারী ও সহ-সংগ্রামী তাদের সকলের প্রতি এটা হচ্ছে আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সনদ। নিশ্চয়ই

তারা অন্যান্য সকল থেকে স্বতন্ত্রভাবে একটি সমাজ (রাজনৈতিক দিক থেকে) গঠন করবে।

"কুরায়শ বংশীয় মদীনার বিশ্বাসী মুসলমানগণ এবং অন্য যারা তাদের অনুসরণ করে—তাদের সাথে যোগ দেয়, তাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে সংগ্রাম করে, এটা হচ্ছে তাদের সবার প্রতি তাদের নবী আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ হতে সনদ। নিশ্চয়ই তারা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে পৃথকভাবে একটি (উম্মা) সমাজ গঠন করবে।

"কুরায়শ বংশীয় মুহাজিরগণ একই সঙ্গে সম্মিলিতভাবে বসবাস করবে এবং বর্তমানে তারা যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায়ই থাকবে। আর তারা ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার তাগিদে তাদের স্বগোত্রীয় বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থার জন্য মুক্তিপণ প্রদান করবে।

"আউফ বংশীয়গণ পূর্বের মত একইরূপে সম্মিলিতভাবে বসবাস করবে— ......আলহারিছ বংশীয়গণ...........সা'য়েদাহ বংশীয়গণও বর্তমানের ন্যায় একই অবস্থায় থাকবে। আর তাদের প্রত্যেক গোত্রই ইনসাফ ও ন্যায়-পরায়ণতার তাগিদে তাদের স্বগোত্রীয় বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থার জন্য মুক্তিপণ প্রদান করবে। অনুরূপভাবেই জুসম...'আমর বিন 'আউফ...আল-নজর... ...আল-নাবিত,...আল-'আস বংশীয়গণও বর্তমানের মতো একই অবস্থায় থাকবে আর তাদের প্রত্যেক গোত্রই ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার তাগিদে স্বগোত্রীয় বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থার জন্য মুক্তিপণ প্রদান করবে।

"য়াহুদীদের মধ্যে যারা আমাদের অনুসরণ করে, তারা সমভাবে আমাদের সমর্থন এবং সর্বপ্রকার আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করবে; তাদের প্রতি কোন উৎপীড়ন কিংবা অন্যায় ব্যবহার করা হবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোন অভিপ্রায় পোষণ করবো না—অথবা তাদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে সাহায্য করবো না। সবার জন্যই সমভাবে রয়েছে বিশ্বাসীদের শান্তির নিশ্চয়তা।..........................

"এই চুক্তির দলীলে যা কিছু লিখিত রয়েছে বিশ্বাসী তা স্বীকার করেছেন—এবং যিনি আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনে (কেয়ামত) বিশ্বাস স্থাপন করেছেন,—তার পক্ষে কোন অপরাধীকে সাহায্য দান করা কিংবা তাকে

আশ্রয় দেয়া বৈধ হবে না, এবং যারা তাকে আশ্রয় ও সাহায্য দান করবে, শেষ বিচারের দিন নিশ্চয়ই তাদের ওপর আল্লাহ্‌র গযব ও অভিশাপ এসে পড়বে। আর তাঁর (আল্লাহ্‌) অভিসম্পাৎ গ্রহণ নিশ্চয়ই উচিত হবে না—; তোমরা কোন বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করলে, তার মীমাংসার জন্য অবশ্যই তোমরা সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত আল্লাহ্‌ ও তদীয় রসূলের নির্দেশ অনুসরণ করবে।

"যে পর্যন্ত য়াহূদিগণ মুসলমানদের সাথে থেকে যুদ্ধ করবে, সে পর্যন্ত তাদের যুদ্ধের ব্যয়-ভার বহনে শরীক হতে হবে এবং যে পর্যন্ত মুসলমানগণ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকবেন,—সে পর্যন্ত য়াহূদিগণও তাদের সাথে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করে যাবেন।

"আউফ গোত্রের য়াহূদিগণ মুসলমানদের সাথে এই একই (রাজনৈতিক দিক থেকে) জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকবে। য়াহূদীদের জন্য রয়েছে তাদের নিজস্ব ধর্মমত; আর বিশ্বাসীদের জন্যও রয়েছে তাদের নিজস্ব ধর্মমত, তাদের মাওয়ালীদের (আশ্রিত বা দাসদের) এবং পরিবারের অন্যান্য লোকজনেরও এই একই অধিকার থাকবে। তবে অপরাধী, জালিম ও পাপাচারী ব্যক্তিগণ এই অধিকার লাভ করবে না; নিশ্চয়ই তারা তাদের এবং তাদের পরিজনদের ক্ষতি ও ধ্বংস সাধন ছাড়া অন্য কারও ক্ষতি করতে পারে না।

"সাউদ গোত্রের য়াহূদীরা যে সব অধিকার লাভ করেছে, আল-নাজ্জার গোত্রের য়াহূদীরাও সে সব অধিকার লাভ করবে;...—।"[১]

ইমাম সুহায়লী বলেন: আবু 'উবায়েদ কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে বলেছেন, সনদটি জিযয়া ধার্যের পূর্বে লিখিত হয়েছিলো এবং ইসলাম সে মুহূর্তে অত্যন্ত দুর্বল ও নাযুক ছিলো। তিনি আরও বলেন: তখন য়াহূদীরা মুসলমানদের জন্য লড়াই করলে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে (মালে গণীমতে) অংশ পেতো।"

টীকা: ১ উল্লিখিত চুক্তিটি বিস্তারিতভাবে সাবেক ইসলামী একাডেমী প্রকাশিত মজীদ কাদ্দুরী রচিত এবং ডঃ হাসান জামান অনূদিত 'ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও যুদ্ধ' নামক বইয়ের ১৪৫ পৃষ্ঠা থেকে ১৫২ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে। পাঠক ইচ্ছা করলে বইটি পড়ে দেখতে পারেন। —অনুবাদক।

দ্বিতীয়ঃ দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র-সত্তার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ, শান্তি স্থাপন, পারস্পরিক লেন-দেন ও চলাচল সম্পর্কে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি ঃ

দু'টি স্থায়ী, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র-সত্তার মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে ধরনের সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে—হযরত রসূল মকবুল (সা) ৬ষ্ঠ হিজরীতে মক্কাবাসীদের সাথে অনুরূপ সন্ধিচুক্তিই সম্পাদন করেছিলেন—যা হাদীছ ও সীরত গ্রন্থে হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। এর কতিপয় কল্যাণময় দিক সম্পর্কে কিছু আগে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

اخرج ابوداؤد من حديث المسور بن مخرمة انهم اصطلحوا (فى الحديبية) على وضع الحرب عشر سنين يامن فيها الناس وعلى ان بيننا عيبة مكفوفة وانه لا اسلال ولا اغلال واخرجه احمد فى مسنده مطولا وفيه على وضع الحرب عشر سنين يامن فيها الناس ويكون بعضهم بعضا.

আবু দাউদ মাসূদ বিন মাখরামার হাদীছ থেকে বর্ণনা করেন,—হুদায়বিয়াতে মদীনার মুসলিম ও মক্কার কুরায়শদের মধ্যে এই শর্তে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে,—উভয়পক্ষ দশ বছর কালের জন্য যুদ্ধ বিরতির শর্ত মেনে নিয়েছেন; পরস্পরের আক্রমণ থেকে উভয়পক্ষের জনসাধারণ নিরাপদ থাকবে, উভয় দলের পক্ষেই অসদাচরণ ও অবৈধ কার্যকলাপ নিষিদ্ধ এবং তাদের মধ্যে স্বপক্ষ ত্যাগ ও বিশ্বাসঘাতকতার কোনরূপ অপরাধ অনুষ্ঠিত হতে পারবে না।

"মুসনাদে আহমদ আরও দীর্ঘ বিস্তৃতি সহকারে বর্ণনা করেন, যার ভেতর

(নোট)ঃ হযরত কা'ব বিন মালিক (রা) থেকে কা'ব বিন আশরাফ সম্পর্কে যে বর্ণনা আবু দাউদ শরীফের কিতাবুল খারাজ অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে তা থেকে অবগত হওয়া যায় যে, উল্লিখিত চুক্তি হিজরী তৃতীয় সনের শেষভাগে সম্পাদিত হয়েছিলো।

দশ বছর কাল যুদ্ধবিরতি, পরস্পরের আক্রমণ থেকে উভয় পক্ষের লোকজনের মেলামেশার কথা রয়েছে।"

তৃতীয়ঃ ইসলামী হুকুমত বাৎসরিক কিছু অর্থ প্রদানের ভিত্তিতে কিংবা অন্যবিধ লাভ প্রদানের শর্তে অপর কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে এবং তাকে স্বীয় হুকুমতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়। অবশ্য এ ধরনের রাষ্ট্রের অবস্থানগত মর্যাদা বর্তমানকালে নব্য উপনিবেশবাদের পর্যায়ে ফেলা যায়। খুলাফায়ে রাশেদীনের যমানায় এ ধরনের কতিপয় দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিলো। নবী করীম (সা)ও কতিপয় ক্ষেত্রে এ ধরনের সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। উদাহরণত ইলা অধিবাসী ('আকাবাবাসী) দের সাথে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো তা এ ধরনের ছিলো।

আবু হুমায়দী আস্‌সায়েদী বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তবুক যুদ্ধে শরীক হয়েছিলাম এবং আয়লার অধিপতি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি সাদা খচ্চর উপঢৌকন হিসাবে পাঠান এবং বিনিময়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে একটি লম্বা আলখাল্লা উপহার দেন এবং তাদের সমুদ্র পথ সম্পর্কে একটি সনদ দেন। ইবনে ইসহাক সীরত গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তবুকে উপস্থিত হন—তখন আয়লা অধিবাসী ইউহান্না বিন রুবা তাঁর খেদমতে এসে হাযির হন এবং বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা শেষে জিযয়া প্রদানসহ নিম্নলিখিত সনদ প্রদানের ভিত্তিতে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ঃ সনদপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

"এটি হলো একটি নিরাপত্তা সনদ—যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা) ইউহান্না বিন রুবা এবং আয়লার অধিবাসীদের প্রদান করছেন। সিরিয়া য়ামন বা সমুদ্র উপকূল থেকে আগত তাদের জাহাজ, পর্যটক এবং সঙ্গীদের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল নিরাপত্তা প্রদান করছেন। ......তাদের ব্যবহৃত জলপথ ও স্থলপথ থেকে তাদের বঞ্চিত করা যাবে না।"...

চতুর্থঃ ইসলামী হুকুমত একটা বাৎসরিক প্রদানের ভিত্তিতে অপরিচিত কোন রাষ্ট্রের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে এবং তাকে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়ে থাকে কিন্তু বৈদেশিক বিষয়াদি নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখবার

উদ্দেশ্যে নিজেদের একজন আমীর তাদের উপর নিযুক্ত করে। অধম গ্রন্থকারের মতে বাহরায়নের অধিবাসীবৃন্দের সাথে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো তা এই পর্যায়ে পড়ে। রসূল করীম (সা) বাহরায়নের অধিবাসী-বৃন্দের সাথে চুক্তি সম্পাদনের পর হযরত 'আলা বিন আল-হাদরামী (রা) কে সেখানকার প্রতিনিধি করে এতদুদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছিলেন। আবু দাউদ, কানযুল 'উম্মাল ইত্যাদি গ্রন্থে নাজরানের অধিবাসীদের সাথে রসূল (সা)-এর চুক্তির যে বিবরণ পাওয়া যায় গভীর বিশ্লেষণে অধমের মতে তাও এই পর্যায়ে পড়ে।

ওয়াদা পালন করা ওয়াজিব এবং খেলাফ করা হারাম এবং এতদ্‌সম্পর্কিত অধ্যায়

অঙ্গীকার পত্রের লিখিত অক্ষরগুলি যতই স্বচ্ছ ও ঝকঝকে হোক, তার শব্দসমষ্টি যতই অলংকারপূর্ণ হোক তা বিলকুল অর্থহীন যদি না বিবদমান পক্ষ দু'টির ভেতর শান্তি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে, সন্ধির শর্তাদি পালনে নিয়মানুবর্তিতাকে আবশ্যকীয় মনে করে এবং যদি না অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকে হারাম মনে করে। ইসলাম এক্ষেত্রে যা কিছু করেছে তা তার সত্যতা ও রাহমাতুল্লিল 'আলামীন হওয়ার অনুকূলে একটি বড় প্রমাণ বটে। কুরআনুল করীম এবং সহীহ্ হাদীছ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বারবার কঠোরতার সাথে ওয়াদা ও অঙ্গীকার পালন করাকে ফরয এবং অত্যন্ত জরুরী বলে অভিহিত করেছে ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে। আল্লাহ্ পাক বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ -

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে।' সূরা মায়িদার অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ - إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا -

অর্থাৎ 'প্রতিশ্রুতি পালন করিও, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে' কৈফিয়ত তলব করা হইবে।' সূরা ইসরা ৩৪ আয়াত। অন্যত্র বলা হয়েছে :

'তবে অংশীবাদীদিগের মধ্যে যাহাদের মধ্যে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যাহারা তোমাদিগের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করে নাই এবং বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য করে নাই, তাহাদিগের সহিত নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করিবে; আল্লাহ্ মুত্তাকীদিগকে পসন্দ করেন।' সূরা তওবা ৪ আয়াত। অন্য আয়াতেই বলা হয়েছে :

'যাবত তাহারা তোমাদিগের চুক্তিতে স্থির থাকিবে—তোমরাও তাহাদিগের চুক্তিতে স্থির থাকিবে; আল্লাহ্ সাবধানীদিগকে পসন্দ করেন।' সূরা তওবা ৭ম আয়াত।

উল্লিখিত আয়াতগুলি দ্বারা আন্তর্জাতিক সন্ধি-চুক্তিগুলির শর্তাবলী অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালনের উপর কত বেশী জোর ও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে—কিরূপ আবশ্যকীয় ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ওয়াদা পালনকে এবং দুশমনের সঙ্গে কৃত ওয়াদা রক্ষা করা ও যথাসম্ভব যুদ্ধ পরিহার করাকে 'তাকওয়া' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাকে হারাম এবং মুনাফিকের আলামত বলে অভিহিত করেছেন। রসূলে করীম (সা) বলেন :

لكل غادر لواء يوم القيامة ينصب عند استه اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وفى رواية عند مسلم ولا غدر اعظم من غدر امام عامة - وعن عبد الله بن عمرو ان النبى صلعم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا ائتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر - اخرجه البخاري -

মুহাদ্দিছকুল শিরোমণি ইমাম বুখারী, বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন প্রতিটি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীর জন্য এক একটি ঝাণ্ডা স্থাপন করা হবে তারই নিতম্বের গুহ্যতম স্থানে। ইমাম মুসলিমও হাদীছটি বর্ণনা

করেছেন। মুসলিম শরীফেরই অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে: সাধারণের ইমাম (নেতা) এর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা অপেক্ষা বড় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ আর কিছুই হতে পারে না। হযরত 'আবদুল্লাহ্ বিন 'আমর (রা) থেকে ইমাম বুখারী আরও বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেন: চারটি স্বভাব যার ভেতর থাকবে সে সুস্পষ্ট মুনাফিক এবং এর ভেতর কোন একটিও পাওয়া গেলে তার ভেতর মুনাফিকের আলামত বিদ্যমান যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। স্বভাব চারিটি এই: ১. আমানতের খেয়ানত করে; ২. কথা বললে মিথ্যা বলে; ৩. প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে এবং ৪. ঝগড়া-বিবাদে গালিগালাজ করে।

যদি ইসলামের দুশমনদের গোপন ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের কারণে কখনও প্রতিজ্ঞাপত্রের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন অনুভূত হয় তবে এমতাবস্থাও অঙ্গীকারাবদ্ধ দুশমনের বিরুদ্ধে বিনা নোটিশে অতর্কিতে বিরুদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা জায়েয নয়। নোটিশ প্রাপ্তির পর দুশমন সতর্ক ও প্রস্তুত হলেই শুধু তার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক তৎপরতা চালাতে পারবে। আল্লাহ্ পাক বলেন:

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ

অর্থাৎ 'যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসভঙ্গের আশংকা কর তবে তোমার চুক্তিও যথাযথভাবে বাতিল করিবে।" ইমাম ইবনুল হুমাম 'ফাত্‌হ' ১ গ্রন্থে বলেন: على سواء অর্থাৎ 'যথাযথভাবে' বলতে চুক্তি বাতিলের সংবাদ উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে ও যথাযথভাবে জানা বুঝাবে। অর্থাৎ তোমাদের তরফ থেকে চুক্তি বাতিলের ঘোষণা তোমাদের মতই তারাও যেন জানতে পায়। এর ফলে তোমরা চুক্তি ভঙ্গের দরুন সৃষ্ট পাপের হাত থেকে রক্ষা পাবে। কেননা সবার মতেই এটা হারাম। চুক্তি বাতিলের ঘোষণা পৌঁছার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকা ভাল। আর এই সময়সীমা এমন হবে যেন প্রতিপক্ষের শাসক কিংবা বাদশাহ্‌র নিকট

টীকা: ১ ফাতহ বলতে ফত্‌হুল কাদীর বুঝাবে। অনুবাদক।

ঘোষণা পৌঁছবার পর তিনি রাষ্ট্রের প্রতিটি এলাকা ও অঞ্চলের সর্বস্তরের জনসাধারণের নিকট তা পৌঁছে দিতে পারেন। এতে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায় থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেন,—হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) এবং রোম সম্রাটের মধ্যে চুক্তি ছিলো। হযরত মু'আবিয়া (রা) প্রায়ই রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্ত শহরগুলির প্রান্তদেশ সফর করতেন এবং চুক্তির মিয়াদ শেষ হওয়া মাত্রই তাদের আক্রমণ করতেন। একদিন একটি লোক ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসে উপস্থিত। তিনি বলে ছিলেন : আল্লাহু আকবার! প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গো না—বরং তা পূরণ করো। দেখা গেল লোকটি হযরত 'আমর বিন 'আমবাসা (রা)। হযরত মু'আবিয়া (রা) লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার কথার অর্থ কি? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি,—কোন ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের ভেতর চুক্তি থাকলে তা পালন করতে হবে যতক্ষণ চুক্তির জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যায় কিংবা তা পূর্বাহ্নেই সমভাবে এবং যথাযথরূপে বাতিল ঘোষণা করা হয়। এর পর লোকজনসহ হযরত মু'আবিয়া ফিরে যান।"

نبذ-কে আজকের পরিভাষায় 'এ্যালটিম্যাটাম' বলা হয়। কিন্তু ইসলাম এক্ষেত্রে উদারতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের যে শিক্ষা দিয়েছে—বর্তমান দুনিয়া আজ তা থেকে বঞ্চিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়
দারুল-হারবের অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ প্রসঙ্গে

আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ـ

অর্থাৎ "ঐ সমস্ত কাফিরদের সহিত লড়াই কর যতক্ষণ পর্যন্ত না দুনিয়া হইতে ফিৎনা-ফাসাদ উৎখাত হইয়া যায় এবং দীন একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।"

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ - قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ -

অর্থাৎ "দীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নাই। গোমরাহী ও বিভ্রান্তি হইতে আলোক ও হিদায়াত উজ্জ্বলতররূপে তুলিয়া ধরা হইয়াছে।" কেননা ধর্ম কোন জোর-জবরদস্তির বিষয় নয়। ইসলাম ধর্মের জন্য প্রাথমিক শর্ত—ঈমান তথা আন্তরিক বিশ্বাস। আর ঈমানের] প্রারম্ভ য়াকীন থেকে এবং দুনিয়ার কোন শক্তিই কারও অন্তররাজ্যে জোরপূর্বক য়াকীন জন্মিয়ে দিতে পারে না। বরং সুতীক্ষ্ম ও ধারাল থেকে ধারালোতর তলোয়ারের ও সঙ্গীনের ফলাও কোন মানুষের অন্তর ফলকে য়াকীনের একটি বর্ণাক্ষরও উৎকীর্ণ ও খোদাই করতে পারে না। এটাই প্রকৃত ও বাস্তব সত্য,—যে শিক্ষা মানবতা হুযূর (সা)-এর মাধ্যমেই পেয়েছে।

প্রথম প্রকার জিহাদ ঃ জিহাদ বিল 'ইল্‌ম বা জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ; 'জিহাদ বিল 'ইল্‌ম' বা জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদকে 'জিহাদ বিল কুরআন' বা কুরআনের সাহায্যে জিহাদও বলা হয়। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا -

"তুমি কাফিরদের অনুসরণ করিও না আর কুরআনের সাহায্যে তাহাদের

নোট ঃ এক্ষেত্রে কতক ফকীহ্ 'জিহাদ' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। কারও কারও মনে এরূপ সন্দেহ দেখা দিয়েছে—যে قتال ও جهاد সম্ভবত একই। অথচ প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। কেননা 'জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ্' (جهاد فى سبيل الله) অর্থাৎ আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা এবং 'কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ্' (قتال فى سبيل الله) আল্লাহ্র পথে লড়াই করা—দুটি শব্দ একই অর্থ বহন করে না। বরং এদের মধ্যে সাধারণ ও বিশেষের পার্থক্য বিদ্যমান অর্থাৎ সব জিহাদই قتال (লড়াই ও যুদ্ধ) নয় বরং জিহাদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে قتال (লড়াই ও যুদ্ধ) ও অন্যতম।

বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ কর।" এরূপে কুরআনী জিহাদকে আল্লাহ্ পাক 'জিহাদে কবীর' বা বড় জিহাদ হিসাবে অধ্যায়িত করেছেন। এথেকে অনুমান করা যাবে যে, 'জিহাদ বিল 'ইল্‌ম' বা জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ কুরআনুল করীমের দৃষ্টিতে কতখানি গুরুত্ব লাভ করেছে। 'উলামায়ে কিরামও এর গুরুত্ব অনুভব করেছেন এবং অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ধরনের জেহাদকে তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা দান করেছেন। ইমাম জাস্‌সাস রাযী 'আহকামুল কুরআন' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে সুন্দর আলোচনার অবতারণা করেছেন এবং লিখেছেন :

"সকল প্রকার জিহাদের মধ্যে জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইসলামের প্রকৃত প্রাণশক্তি এই জিহাদের ভেতরই নিহিত। এরই সাহায্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে—ইসলাম প্রচারিত হয়েছে, দুনিয়াজয়ী ধর্মের মর্যাদা লাভ করেছে। যদি এর পথে ইসলামের দুশমনেরা অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়াতো তবে দুনিয়ার বুকে কোন সত্য সন্ধানী অন্তরাত্মাই ইসলাম কবুল ব্যতিরেকে থাকতে পারতো না। যেহেতু এর সম্পর্ক আন্তর্জাতিক নীতির সাথে এতটুকুও নয়—সেহেতু এতদ্‌সম্পর্কিত আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষেপে শেষ করছি।

মোট কথা, জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদ প্রধানত দু'প্রকার। প্রথমত, 'দীনে হক' বা সত্য-সুন্দর ও কল্যাণাভিসারী জীবন দর্শনের প্রচার, প্রসার, শিক্ষা প্রদান এবং ইসলামের রঙে রঞ্জিত সত্যাশ্রয়ীদের একটি জামাত তৈরী করা; দ্বিতীয়ত, এর বিরোধিতাকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের তরফ থেকে যে সমস্ত অভিযোগ, সন্দেহ ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালানো হয়ে থাকে—অকাট্য ও অখণ্ডনীয় যুক্তি, সন্দেহাতীত প্রমাণপঞ্জী এবং দার্শনিক আলোচনা-সমালোচনার দ্বারা তার মুকাবিলা করা। আল্লাহ্ পাক বলেন :

أُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ

الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ -

অর্থাৎ "তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সৎ উপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর এবং তাহাদের সহিত সদ্ভাবে আলোচনা কর।" সূরা নহল, ১২৫ আয়াত। এর কোনটিই দু'টি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়; হয় ভাষা ও বাকচাতুর্যের দ্বারা নচেৎ কলমের সাহায্যে। অতঃপর এর একটি দু'টি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়; হয়তো এ জিহাদ শরীর মন দ্বারা সম্পন্ন হবে। সেক্ষেত্রে এ জিহাদ জিহাদ বিন্নাফস হবে, নতুবা ধন-সম্পদ দ্বারা হবে এবং সেক্ষেত্রে এরূপ জিহাদকে 'জিহাদ বিল মাল' বলা হয়। যেমন: ইসলামী শিক্ষার শিক্ষার্থী, শিক্ষকমণ্ডলী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, লেখকমণ্ডলী, মুবাল্লিগবৃন্দ ইত্যাদি। এদের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করা এমত শর্তাধীনে যে তাঁরা ইসলামের সাহায্য সমর্থনে প্রচারে ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করবে। মোদ্দা কথা, 'জিহাদ বিল 'ইল্‌ম' ইসলামের সঞ্জীবনী সুধা। এটা আট প্রকার।

দ্বিতীয় প্রকার : খিলাফত বা ইসলামী হুকুমতের সাহায্যে জিহাদ

আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ

لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ -

অর্থাৎ "আল্লাহ্ অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সৎকর্ম করিবে, নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীর আধিপত্য প্রদান করিবেন—যেমন তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন; এবং নিশ্চয় তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন—যাহা তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। সূরা নূর, ৫৫ আয়াত।

অর্থাৎ সত্যাশ্রয়ীদের সংঘবদ্ধ দল এবং তাঁদের আশ্রিত লোকদের প্রশিক্ষণ ও ভরণপোষণের জন্য এমন একটি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ পত্তন করা হোক যা রব্বুল 'আলামীন—যিনি 'রহমান' এবং 'রহীম' ও—তাঁরই রহমত ও রবুবিয়তের গুণে বিভূষিত ও বিকশিত আর যার সমগ্র আইন-কানুন হবে রব্বানী (স্বর্গীয়) আইন-কানুন, যার পরিচালক হবেন রব্বানিগণ এবং সে রাষ্ট্রের শিক্ষা-ব্যবস্থা হবে রব্বানী ব্যবস্থা,—তার সংগঠন রব্বানী আর রাষ্ট্রনীতিও রব্বানী রাষ্ট্রনীতি হবে। এর প্রাসাদ-সৌধ নির্মিত হবে আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের ধ্যান-ধারণার উপর। এ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের পরিচালকদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী হবে—রাষ্ট্র আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের এবং তিনিই এর শাসক, পরিচালক ও সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক। কোন ব্যক্তি, খান্দান কিংবা কোন জাতি এমনকি গোটা মানবতাও সার্বভৌম ক্ষমতা ও অধিকার হাসিল করতে পারে না। ফয়সালার এবং আইন-কানুন রচনার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র—যিনি নিখিল বিশ্বের লালনকর্তা, বিবর্তক ও প্রতিপালক। রাষ্ট্রের প্রকৃত পরিচয় এমন হবে যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহ্‌রই খলীফা হিসেবে কাজ করবে। এমন একটি খিলাফতের পরিচালনায় তাদেরই অংশ থাকবে যারা আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের সামগ্রিক বিধানের উপর ঈমান রাখে এবং তা মেনে চলার জন্যও প্রস্তুত; যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন এমনই একটা অনুভূতি নিয়ে যে, আমাদের ভেতরকার প্রতিটি লোককে ব্যক্তিগতভাবে রব্বুল 'আলামীনের সামনে জবাবদিহি করতে হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয়ই জানেন। আমাদের উপরে খিলাফতের যিম্মাদারী এজন্যে অর্পিত হয়নি যে, আমরা জনগণের উপর নিজেদের খেয়াল-খুশী মাফিক শাসন কর্তৃত্ব চালাবো এবং তাদেরকে গোলামে পরিণত করবো; জনগণের থেকে ট্যাক্স উশুল করে নিজেদের প্রাসাদ নির্মাণ করবো—বরং এ দায়িত্ব ও কর্তব্যের পর্বত-প্রমাণ বোঝা এজন্যেই চাপানো হয়েছে যেন আমরা রব্বুল 'আলামীন প্রদত্ত ন্যায় ও সুবিচার পূর্ণ আইন-কানুন তাঁরই বান্দাহ্‌দের উপর প্রবর্তন করি। এক্ষেত্রে আমরা যদি বিন্দুমাত্র গাফলাতির আশ্রয় গ্রহণ করি কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থবোধে উদ্দীপ্ত হই,-পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় নিই অথবা আমানতের খেয়ানত করে অবিশ্বস্ততার পরিচয় দিই—তবে আমাদের আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের আদালতে

শাস্তি ভোগ করতে হবে। এরূপ একটি ইসলামী হুকুমতের সেনাবাহিনী, পুলিশ বিভাগ, বিচার বিভাগ, অর্থ ও রাজস্ব বিভাগ, ব্যবস্থাপনার নীতি, বৈদেশিক রাজনীতি ও কূটনীতি, সন্ধি ও যুদ্ধ, সার্বিক লেন-দেন ইত্যাদি সব কিছুই পার্থিব অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে স্পষ্টতই আলাদা হবে। পার্থিব তথা সেক্যুলার রাষ্ট্রের বিভাগীয় জজ এমনকি প্রধান বিচারপতি রব্বানী হুকুমতের বিচার বিভাগে কেরানী এমন কি চাপরাশী হবার যোগ্যতাও রাখে না। ঐ সমস্ত রাষ্ট্রের ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশকে এরূপ একটি রাষ্ট্রের সাধারণ একজন কনস্টেবল হিসাবেও যোগ্য মনে করা হয় না। ওদের জেনারেল কিংবা ফিল্ড মার্শাল এখানে একজন সাধারণ সিপাহী হিসাবে ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত-তাও রাখে না। ওদের বৈদেশিক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে কোন পদে নিযুক্ত হতে পারা তো দূরের কথা সম্ভবত তারা নিজের মিথ্যা, প্রতারণা, শঠতা তথা অবিশ্বস্ততার কারণে কারাযন্ত্রণা ভোগের হাত থেকেও রেহাই পায় না।

মোদ্দা কথা, রব্বানী হুকুমতের জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সমগ্র অংশ স্বীয় ব্যবস্থাপক মেশিনের সকল যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ নতুন গঠন-আকৃতির মুখাপেক্ষী। তার জন্য দরকার এমন লোকের যাদের অন্তর-মানসে আল্লাহ্‌র ভয় বিদ্যমান; যারা আল্লাহ্‌র সামনে নিজেদের বিরাট দায়িত্ব ও যিম্মাদারীর অনুভূতি রাখে, যারা দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়, যাদের দৃষ্টিতে নৈতিক ও চারিত্রিক লাভ-লোকসান পার্থিব লাভ-লোকসানের তুলনায় অনেক বেশী; যাদের সকল চেষ্টা ও সাধারণ কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের সন্তুষ্টি। রব্বানী হুকুমতের শিক্ষা ব্যবস্থাও হবে আশ্চর্য ধরনের! এর সকল তা'লীম ও তরবিয়ত (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য শুধুই আল্লাহ্ এবং তার শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সবাই হবেন রব্বানী।

যখন এরূপ একটি নীতি, আদর্শ ও নমুনার ভিত্তিতে হুকুমতে রব্বানীয়া কায়েম হবে—তখন জনগণ পাগলের মত ইসলামের ভক্ত ও অনুরক্তে পরিণত হবে এবং আনন্দ ও সন্তুষ্ট চিত্তে লোকে দলে দলে কলেমায়ে তাইয়িবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' পড়ে মুসলমান হতে থাকবে। এর পরও যারা মুসলমান হবে না তারাও রব্বানী হুকুমত (রবুবিয়তের আদর্শ ও ধ্যান-ধারণাভিত্তিক রাষ্ট্র)-এর স্নেহচ্ছায়ায় বসবাস করাকে অধিক পছন্দ করবে।

এরূপ জিহাদ অর্থাৎ হুকুমতে ইসলামীয়া ও খিলাফতের সাহায্যে যে জিহাদ তা আবার দু'প্রকার : ক. রব্বানী হুকুমতের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর উন্নতি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা ও সাধনা চালিয়ে যাওয়া; খ. রব্বানী হুকুমতের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ অর্থাৎ ফকীহ্‌গণের ভাষায় একে قتال مع اهل الحرب দারুল হারবের অধিবাসীদের সাথে লড়াই বলা হয়। কোন কোন ফিকাহ্‌বেত্তা একে জিহাদও বলেন। বস্তুতঃপক্ষে এটা সেই জিহাদ যা আন্তর্জাতিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

যুদ্ধ

যদি আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটকৌশল রব্বানী হুকুমতকে ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে যুদ্ধে বাধ্য করে তখন বিরুদ্ধ শক্তির সাথে সিংহের ন্যায় লড়াই করতে হবে। কিন্তু সর্বদাই নিম্নোক্ত নীতিগুলোকে সামনে রাখবে :

নীতি ১ : এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য লক্ষ্য শুধু 'দীনে হক' তথা সত্য সুন্দর ও কল্যাণধর্মী জীবন ব্যবস্থার মর্যাদা রক্ষা ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন :

নীতি ২ : উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের যমীনকে সর্ব-প্রকার ফিতনা-ফাসাদ থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখা;

নীতি ৩ : বিশেষ করে ইসলামের এবং সাধারণভাবে দুনিয়ার তাবৎ ধর্মের স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে এ যুদ্ধ পরিচালিত হবে।

قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال الشيخ ابن الهمام والمقصود منه اخلاء العالم عن الفساد واعزاز الدين ودفع الشر الكفار عن المؤمنين لقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله اى لا تكون منهم فتنة للمسلمين عن دينهم بالاكره وبالضرب والقتل وكان اهل مكة يفتنون من اسلم بالتعذيب حتى يرجع عن الاسلام على ما عرف فى السير فامره الله سبحانه تعالى بالقتال لكثر شوكتهم فلا يقدرون على تفتين المسلم عن دينه -

আল্লাহ্ পাক বলেন : "আল্লাহ্‌র যমীন হইতে ফেত্‌না-ফাসাদ উৎখাত এবং তদস্থলে 'দীনে হক' পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর।" শেখ ইবনুল হুমাম বলেন : উল্লিখিত আয়াতের অর্থ দুনিয়াকে ফেত্‌না-ফাসাদের তথা অশান্তি ও বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্ত করা, দীনে হকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, কাফির ও অনৈসলামিক শক্তির দুষ্টামী ও শয়তানী অপচেষ্টায় বিরুদ্ধে মু'মিনদের প্রতিরোধ সৃষ্টি করা। তিনি আরও বলেন, "দুনিয়া থেকে অশান্তি ও বিপর্যয়-বিশৃংখলা দূর করে তদস্থলে আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ কর"—আল্লাহ পাকের এ বাণীর অর্থ মুসলমানদের জন্য তাদের ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা, কাফিরদের তরফ থেকে ফিত্‌নাস্বরূপ জোর-জবরদস্তি, মারপিট, হত্যা ইত্যাদি যেন না থাকে। কেননা মক্কাবাসীরা যারাই ইসলাম গ্রহণ করতো তাদেরই বিভিন্ন প্রকার শাস্তি ও নির্যাতনের মাধ্যমে ইসলাম থেকে ফেরাবার চেষ্টা করতো--সীরত বিষয়ক গ্রন্থে এ বিষয়ে যেটুকু জানা যায়। পরিণতিতে আল্লাহ পাক কাফিরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুন্ন ও প্রতিহত করবার জন্য যেন তারা আর মুসলমানদের নির্যাতন করতে সক্ষম ও সাহসী না হয়—মুসলমানদের প্রতি যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন।

সংক্ষেপে, ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অশান্তি ও বিপর্যয়ের হাত থেকে দুনিয়াকে মুক্ত করা, দীনে হকের মর্যাদা রক্ষা, কাফিরসহ সকল ইসলামবিরোধী শক্তির দুষ্টামী, শয়তানী অপচেষ্টার প্রতিশোধ, ধর্ম, ধর্মীয় স্থান, ধর্মীয় প্রথা ও অনুষ্ঠানাদির হিফাজত, মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক হামলার হাত থেকে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা এবং পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করা।

নীতি ৪ : ইসলামী সৈন্যবাহিনীর পদস্থ অফিসার থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমিক-মজদুর পর্যন্ত প্রতিটি ব্যক্তিই হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শগত ও প্রকৃতিগতভাবে জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হবে। তাঁর কথাবার্তা, চালচলন, ধ্যান-ধারণা ইসলামী নীতি ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য শিক্ষকরূপে সমুজ্জ্বল হবে। তাকওয়াই হবে তার একমাত্র বসন ও ভূষণ।

নীতি ৫ঃ রব্বানী হুকুমতের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধরত অমুসলিমদের স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ, যুদ্ধ বিরত ব্যক্তিকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকবে। যুদ্ধে নিহত কোন ব্যক্তির লাশ বিকৃত করবে না, কোনরূপে বিশ্বাস ভঙ্গ ও অসদাচরণমূলক কাজও করবে না। মুসলিম শরীফসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে,—রসূল (সা) বলেছেন ঃ

عن سليمان بن بريدة قال كان رسول الله صلعم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه فى خاصته بتقوى الله تعالى ولمن معه من المسلمين خيرا ثم قال غزوا باسم الله فى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا وتمثلوا ولا تقتلوا وليدا الحديث اخرجه مسلم وعن ابن عمر رض ان امراة وجدت فى بعض مغازى رسول الله صلعم مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان اخرجه ستة الا النسائى وعن انس رض ان رسول الله صلعم قال انطلقوا بسم الله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امراة الحديث اخرجه ابوداؤد-

অর্থাৎ “হযরত সুলায়মান ইবনে বুরায়দা (রা) বলেন, মহানবী (সা) যুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠাবার প্রাক্কালে সেনাপতিকে আল্লাহভীতি এবং অধীনস্থ সৈন্যদের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য বিশেষভাবে ওসিয়ত করতেন. তারপর তিনি বলতেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নামে তাঁরই উদ্দেশ্যে কাফিরদের সাথে জিহাদ শুরু করবে। বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না; ওয়াদা পালন করে চলবে। লাশ বিকৃত করবে না, শিশু সন্তান হত্যা করবে না।

“ইবনে ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, কোন যুদ্ধে জনৈক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়ার প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রীলোক ও শিশু-হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আবু দাউদ শরীফের অপর এক হাদীছে বলা হয়েছে,—

'তোমরা আল্লাহ্‌র নামে এবং রসূল করীম (সা) প্রতিষ্ঠিত মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধে যোগদান করো। কিন্তু যুদ্ধে বৃদ্ধ, অল্পবয়স্ক শিশু-সন্তান এবং স্ত্রীলোক হত্যা করবে না।"

নীচে হযরত আবুবকর (রা) প্রদত্ত একটি ওসিয়ত যা তিনি সিরিয়া অভিযানের উদ্দেশ্যে গমনরত সৈন্য ও তাদের সেনাপতিকে লক্ষ্য করে দান করেছিলেন উদ্ধৃত করে বর্তমান আলোচনা শেষ করছি।

انك تجد قوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله فذرهم
وانى موصيك بعشر لا تقتلوا امراة ولا صبيا ولا كبيرا هرما
ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا وتعقرن شاة
ولا بعيدا الا لاكله ولا تحرقن نخلا ولا تغللن ولا تجبنن
كذا فى تاريخ الخلفاء -

অর্থাৎ "তোমরা সেখানে এমন একটি জাতির সাক্ষাত পাবে নিজেদের ধারণা মুতাবিক যারা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত-বন্দেগীতে নিজেদের ওয়াকফ করে দিয়েছে—তাদের ছেড়ে দেবে। আমি তোমাদের দশটি বিষয়ে ওসিয়ত করছি : কোন শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক হত্যা করবে না; ফলবান বৃক্ষ কাটবে না; আবাদী ও বসতি স্থান বিরান করবে না; ছাগল কিংবা উট প্রয়োজন ব্যতিরেকে জবাই করবে না; খেজুর বাগান জ্বালাবে না; যুদ্ধলব্ধ সম্পদ চুরি করবে না এবং কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না।"

নীতি ৬ : ইসলামী রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী পাঞ্জেগানা সালাতের পাবন্দ হবে—এমন কি ঠিক যুদ্ধের মুহূর্তেও জামাতকে বাধ্যতামূলক মনে করা হবে। দেখুন—ফিকাহ্ ও হাদীছ গ্রন্থের সালাতুল খওফ নামক অধ্যায়।

তৃতীয় প্রকার : স্বীয় প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ (জিহাদ মা'আন্নাফসে) অর্থাৎ প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনাকে ধ্বংস করে দেয়া এবং নফসের হক বা অধিকারটুকুই শুধু বাকী রাখা। সহীহ্ হাদীছে বলা হয়েছে :

والمجاهد من جاهد نفسه اخرجه الترمذى -

অর্থাৎ মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে স্বীয় নফসের সাথে জিহাদ করে। সূফী সম্প্রদায় একে 'জিহাদে আকবার' বা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলেন। যেহেতু

বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে এ বিষয়ের কোনরূপ সম্পর্কে নেই—সেহেতু বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা থেকে বিরত রইলাম।

ইসলামী হুকুমতের প্রকৃতি

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বার পর ইসলামী হুকুমতের প্রকৃতি সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর আপনা-আপনিই মানসপটে ভেসে উঠবে। তথাপিও যেহেতু উল্লিখিত সমস্যা বর্তমান যুগে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে সেজন্য আরও কিছু এতদ্‌সম্পর্কে পেশ করা হলো।

যে কোন রাষ্ট্রের ধরন ও প্রকৃতি প্রধানত দু'রকমের হয়ে থাকে। এর এক-একটির অধীনে আরও বহু প্রকারভেদ আছে। প্রথমত, ব্যক্তিতান্ত্রিক রাষ্ট্র যার সাথে ইসলামের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যাকে কোন কোন বিশেষজ্ঞ ইসলামী হুকুমতের সাথে সমপর্যায়ে তুলনা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। অন্যদিকে কোন কোন বিশেষজ্ঞ আবার এর বিরোধিতাও করেছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, ইসলামী হুকুমত পুরোপুরি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাথে এর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। আর ইসলামী হুকুমতকেই কুর-আনুল করীম ইশারা ও ইংগিতে রব্বানী হুকুমতরূপে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ পাকের বাণী, "স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তাদের বলিলেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতেছি,'' এর দিকে গভীর-ভাবে মনোনিবেশ করলে এটা সুস্পষ্ট হয়েই ধরা পড়ে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং রব্বানী হুকুমতের ভেতর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রথমত. আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল আইন-কানুন রচনা ও বাতিল করা, কোন আইনকে বহাল রাখা কিংবা না রাখার সার্বিক ও একচ্ছত্র অধিকার গণপ্রতিনিধি বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্যই সংরক্ষিত। পক্ষান্তরে রব্বানী হুকুমতে এরূপ অধিকার গণতন্ত্র তো দূরের কথা সমগ্র দুনিয়াও অনুরূপ অধিকার রাখে না। এখানে সকল কিছুর সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র মালিক আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীন। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

অর্থাৎ 'বিধানদাতা কেবল আল্লাহ্ই।'—

فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ-

"অতঃপর মহান শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্ পাকের জন্যই যাবতীয় বিধান।"

اَلَا لَهُ الْحُكْمُ-

"মনে রাখিও তাঁহারই জন্য সকল ফয়সালা।"

وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-

'তাঁহারই জন্য সকল বিধান এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।'

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ- وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ- مائده

"তবে কি তাহারা প্রাগ-ইসলামী যুগের বিচার ব্যবস্থা কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?" সূরা মায়িদা—৫০, আয়াত।

وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ- اِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ- فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ- بَلْ اُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ- سوره نور

অর্থাৎ উহাদিগকে উহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য আল্লাহ্

এবং তাঁহার রসূলের দিকে আহ্বান করিলে উহাদিগের একদল মু-
ফিরাইয়া লয়। সিদ্ধান্ত উহাদিগগের সপক্ষে হইবে মনে করিলে উহা
বিনীতভাবে রসূলের নিকট ছুটিয়া আসে। উহাদিগের অন্তরে কি ব্য
আছে, না উহারা সংশয় পোষণ করে? না উহারা ভয় করে যে, আ
ও তাঁহার রসূল উহাদিগের প্রতি জুলুম করিবেন? বরং উহারাই
সীমালংঘনকারী। সূরা নূর ৪৮-৫০ আয়াত। এর উপর মুস
বিদ্বানমন্ডলীর ইজমা' হয়েছে এবং ইবনুল হুমামের লিখিত পুস্তক ও শর
মুসাল্লামুসছবুত গ্রন্থে এরূপই পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, রব্বানী হুকুমতের কাঠামো তাকওয়া দ্বারা নির্মিত। প্রতি
নির্বাচনে প্রার্থী ও ভোটার উভয়কেই তাকওয়া ও পরহেজগারীর বসন-ভূষণে
ভূষিত হতে হবে এবং এটা অপরিহার্যও বটে। যারা এরূপ হবেন না
তাদের নির্বাচন প্রার্থী হওয়া কিংবা ভোট দানের কোনই অধিকার নেই
কিন্তু আধুনিক ও প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে এর কোন নাম-নিশানা
খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে গণতন্ত্রের নামে মুড়ি-মিসরী একদরে
বিক্রী হয়—যেখানে দীনদারী কিংবা নীতি-চরিত্র কোনরূপ ধর্তব্যের মধ্যে
গণ্য নয়। আল্লাহ্ই একমাত্র হেদায়েত দানকারী।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের তরফ হ'তে একে কবুল করো। তুমিই
একমাত্র শ্রোতা ও জ্ঞাতা এবং আমাদের তওবা কবুল করো; কেননা তুমিই
তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু। এ অংশটি ১৩৬৬ হিজরীর ১০ই
যিলহজ্জ তারিখের পবিত্র জুম'আর রাত্রিতে সমাপ্ত হয় এবং এ অংশের
নাম 'ফতহুল করীম ফি সিয়াসাতিন নাবিয়্যল আমীন' নামে নামকরণ করি।
সিলেটের বাইয়েমপুর নিবাসী ইবনুল 'আলীম মুশাহিদ 'আলী—তাঁর পিতা-
মাতা, সাহায্যকারী ও বন্ধুবান্ধব সবাইকে আল্লাহ ক্ষমা করুন।

وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہوکر
اور تم خوار ہوئے تارک قرآں ہوکر

অর্থাৎ প্রাথমিক যুগে তাঁরা মুসলমান হওয়ার কারণেই সম্মান ও
মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন; আর এখন কুরআনুল করীম পরিত্যাগ
করার কারণেই তোমরা অবমানিত ও লাঞ্ছিত।

IFB—84/85/P/1470/3250/1/9/1984

গ্রন্থকার পরিচিতি :

র্তমান গ্রন্থের মূল লেখক মরহুম মওলানা মুশাহিদ আলী ১৯১১ সনে সিলেট জেলার কানাইঘাট থানার বাইয়েমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ পিতা কারী মুহাম্মদ আলীম পরহেজগার ও দীনদার ব্যক্তি অত্যন্ত প্রতিভাবান ও প্রখর ধীশক্তির অধিকারী মওলানা মুশাহিদ জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপন করার পর উচ্চ শিক্ষা লাভের শ্যে ভারতের মুরাদাবাদ যান। পরে বিখ্যাত দীনি প্রতিষ্ঠান দারুল-উলূম ন্দ গমন করেন এবং উপমহাদেশেরই শুধু নন বরং মুসলিম-জাহানের— তম খ্যাতনামা আলিম, মুহাদ্দিছ ও রাজনীতিবিদ মওলানা হুসায়ন মদ মাদানী (র)-এর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে লেখা-পড়া চালিয়ে যান এবং শয পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও মওলানা নী (র)-এর প্রশংসনীয় স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হন। বাংলাদেশী লমানদের মধ্যে অনুরূপ দুর্লভ সৌভাগ্য ও কৃতিত্বের অধিকারী উপূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মশহুর আলিম ও তার্কিক মওলানা তাজুল ইসলাম র্সি আর কেউ হ'তে পারেন নি। আমাদের পরম সৌভাগ্য মওলানা দীনুদ্দীন মাসউদ নামে একজন বাঙালী মুসলিম অতঃপর অনুরূপ দুর্লভ ভাগ্যের অধিকারী হয়েছেন।

র্মজীবনে তিনি সিলেট আলিয়া মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মত আঞ্জাম দেন। পরে কানাইঘাটে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মৃত্যু এর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক হিসাবে এর সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করেন।

হাদীছ, তফসীর, ইতিহাস, ফিকাহ্, তাসাওউফ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ র্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী আলিম মরহুম মওলানা রাজনীতিবিদ হসাবেও অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন এবং ১৯৬৫ সালে তিনি তদানীন্তন াকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি মওলানা মাদানী (র)-এর একজন যোগ্য অনুসারী ছিলেন।

১৯৭০ সালের ১২ই ডিসেম্বর পবিত্র ঈদুল আযহার রাত্রিতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না-লিল্লাহে..............রাজেউন। ওয়ার্ল্ড পুস্তকের মধ্যে 'ফতহুল করীম' 'আল-ফারকো বায়নাল হাক্কে ... ইজহারে হক' (বাংলা) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক মুহিব্বুর রহমান